উনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি
ও
বাংলা সাহিত্য

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ. ডি.
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলকাতা

পরিবেশক
জে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
চৈত্র ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
প্রতিমা প্রিন্টিং
১/এইচ/পি-২৬ মুরারীপুকুর রোড
কলকাতা-৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

উনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি ও বাংলা সাহিত্য

ভূমিকা ঃ প্রাক্‌কথন

সমমানসিকতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তি পারম্পরিক ভাব-ভাবনা, চিন্তাচেতনার বিনিময় এবং কোন বিষয় বা সমস্যার পর্যালোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উনিশ শতকে অসংখ্য সভাসমিতি গড়ে তোলেন। আবার সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতায় যেখানে শ্রেণী ও মতামত নির্বিশেষে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই বিচলিত বোধ করেছেন সেখানে পরস্পর-বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হয়েও সমস্যাভিত্তিক সহমত পোষণ করে বিরোধ ও বিতর্ক ভুলে গিয়ে সাময়িক শর্তে সভাসমিতি গঠন করেন। সভায় সমবেত বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সমস্যার উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করেছেন। অবশ্য গোষ্ঠীচিন্তা যে সেই উদ্দেশ্যের কখনও কখনও পরিপন্থী হয়নি তা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সংকীর্ণতার দ্বারা গ্রস্ত হয়ে অনেক সভাসমিতি গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কোন সভাসমিতি আবার গোষ্ঠী-চিন্তার রূপায়ণের জন্যই গঠিত হয়েছে এবং সেই সব সভাসমিতির সংগঠক ও সভ্য তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বিবেচনা করে তা কার্যকর করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদী সভাসমিতি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সভাসমিতি গঠনের উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের দিকটি অনেক উদার ও ব্যাপক—সভাসমিতি থেকে উত্থিত চিন্তাতরঙ্গ সমাজদেহের গভীর স্থানে প্রবেশ করে অসুস্থ ও পঙ্গু অঙ্গে নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চার করেছে।

মধ্যযুগে ইউরোপে সভাসমিতি গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সমমানসিকতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তির একোদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা ও অনুশীলনের জন্য সমবেত হওয়া :

> "Societies, learned and literary—associations of individuals with a common professional interest, intend to promote learning"[১]

ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে সভাসমিতি গঠনের মৌল অভিপ্রায় ছিল জ্ঞানালোচনা। তাই অথর্ব বেদের অষ্টম কাণ্ড, দশম সূক্ত, নবম অনুবাক্-এ বলা হয়েছে—'যন্ত্যস্ত সভাং সভ্যো ভবতি য এবং বেদ' অর্থাৎ সকলেই সভায় যান, কিন্তু যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনিই সভ্য হন। বৌদ্ধযুগে দেশময় ধর্মালোচনার জন্য একাধিক 'ভিক্ষুসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।

মধ্যযুগে বাংলাদেশে সভাসমিতির পরিবর্তে ছিল 'রাজসভা'। রাজা বা ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সভা পরিচালিত হত। তাই সেখানে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার অনুবর্তী

হওয়ার পরিবর্তে পৃষ্ঠপোষকের আনুকূল্য অর্জনে আত্মসমর্পণই. প্রধান উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

আধুনিক সমাজে সভাসমিতির বৈচিত্র্য ব্যাপকতা ও সংখ্যাধিক্য 'উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় আধুনিক সমাজ-জীবনের জটিলতাবৃদ্ধিই প্রাচীন ও আধুনিক সভাসমিতির মধ্যে এত সুদূর ব্যবধান রচনা করেছে। সমাজ-জীবনের এই জটিলতার কারণ আধুনিক মানবজীবনে সামাজিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। এ-প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ যথার্থ ই বলেছেন :

"এই ধরণের সভাসমিতি প্রাচীন বা মধ্যযুগে ছিল না, আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ ; সামাজিক অধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে তখন বিশেষ কিছু ছিল না।"[২]

বাংলাদেশে উনিশ শতকে সৃষ্ট সভাসমিতির ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করতে হলে তাই পাশ্চাত্য সভাসমিতির সমীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ, উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সূত্রে বাঙালী যে সামাজিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে সভাসমিতি গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল তার মূলে ইউরোপের সামাজিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ স্বরূপ সভাসমিতিগুলির দৃষ্টান্ত বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

॥ ১ ॥

ইউরোপে সভাসমিতির উদ্‌ভবের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে চলে যেতে হয়। সে সময়ে 'সভাসমিতি' এই শিরোনামাঙ্কিত না হয়েও বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সভাসমিতির ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম টলেমির যুগে আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম সমকালীন পণ্ডিতদের পারস্পরিক জ্ঞানবিদ্যা বিষয়ক শাস্ত্র-সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অনুরূপ উদ্দেশ্যে বিদ্বজ্জনের একত্র সমাবেশের সংবাদ মুসলমান খলিফাদের যুগে ও শার্লেমান এবং আলফ্রেড দি গ্রেটের সময়েও পাওয়া যায়। যদিও এই মিলনবাসরগুলি সভা বা সমিতি এই বিশিষ্ট নামে অভিহিত হয় নি, তবে এই উদ্দেশ্যের ভিতরেই সভাসমিতির আত্মপ্রকাশের গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপে সভাসমিতির গঠন ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠা মিলনবাসরের প্রাথমিক পরিচয় হল অ্যাকাডেমি :

> 'The term 'academy' is derived from the Greek Academia, originally an olive grave of local hero, situated two miles from Athens. There Plato started his school, which became known by the same name........From the Renaissance the term was associated with learned societies

which were not schools in the ordinary sense, and in this use 'academy' may be defined as a society or institutions for the cultivation and promotion of literature, of arts and sciences or of some particular art or sciences."[৩]

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে রেনেসাঁসের পীঠস্থান ইতালিতে একাধিক বিদ্বজ্জনের সমবেত প্রয়াসে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল এই অ্যাকাডেমিগুলি। প্রাচীন অ্যাকাডেমিগুলির মধ্যে ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে অ্যান্টনিও বেকাদেল্লি প্রতিষ্ঠিত Accademia Pontaniana, ১৪৪২ খ্রীস্টাব্দে প্লেটোর দর্শন ও গ্রীক-সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য ফ্লোরেন্সে প্রতিষ্ঠিত Accademia Platoncia, আরগনের পঞ্চম অ্যালফানজোর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪৪২ খ্রীস্টাব্দে নেপল্‌সে প্রতিষ্ঠিত Accademia Pontaniana-আরেকটি প্রাচীন বিদ্বৎসভা, ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে রোমে আগত প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত জোহানেস্ বেসারিয়ন্ প্রতিষ্ঠিত Accademia Roman e di Archeologia, ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে ফ্লোরেন্‌সে প্রতিষ্ঠিত Accademia della crusea বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান বিষয়ক সর্বপ্রাচীন অ্যাকাডেমি Accademia de ciencias Mathematices ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে রোমে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি Accademia dei Lincei-এ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও সভ্য ছিলেন, ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে স্থাপিত Accademia del cimento-র অন্যতম সদস্য ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী টরিসেলি। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্য ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে জার্মানে প্রতিষ্ঠিত Die Fruchtbringende Gesellsehaft একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সৌধ, প্রস্তরস্বাক্ষর, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি প্রত্নবস্তুর পরিচয় উদ্ধারের জন্য ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে Accademia Francaise স্থাপিত হয়। ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে ঐ অ্যাকাডেমিটি আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করে Accademia Royale des Inscription et Belles-Letters নামে পরিচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে অ্যাকাডেমিগুলিতে আলোচনার পরিসর ক্রমাগতই প্রসারিত হতে থাকে এবং বিষয়বৈচিত্র্য অনুযায়ী সভাসমিতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে অ্যাকাডেমিগুলির কার্যকলাপ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে নবগঠিত Institute National-এর শাখা হিসাবে অ্যাকাডেমিগুলি পুনরায় কাজ শুরু করে।[৪]

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে এক শ্রেণীর অসংখ্য 'ক্লাব' গড়ে উঠতে থাকে। এগুলিতে বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সারস্বত আলোচনার জন্য সমবেত হতেন। অ্যাকাডেমির মতোই

এগুলি সভা সমিতির প্রাক্‌রূপ। কফি পানের কেন্দ্রগুলিকে আশ্রয় করেই এই শ্রেণীর অধিকাংশ ক্লাবের উদ্ভব। কফিখানার মালিকরা নিত্য-আগত কফিপানার্থী বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আলাপ-আলোচনার সুবিধার্থে পানশালার ভিতর নির্দিষ্ট কক্ষ বরাদ্দ করে দিত, অবশ্য এই উদারতা ছিল তাদের ব্যবসায়িক কৌশল বা খরিদ্দার ধরার ফাঁদ :

> The landlord of a coffee house usually alloted a special room to the club's use. For this he made no charge, relying for his profit on the food and drink consumed by the members and the distinction conferred upon his house, by the presence of notable men.[৫]

১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে Devil tavern-এ বেন জনসন প্রতিষ্ঠিত Apollo Club সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ক্লাবে লুইস ক্যারি, স্যার হন স্যাকলিং, রবার্ট হ্যারিক এবং লর্ড হারবার্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করতেন। স্যামুয়েল পেপস্‌ ও তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা সম্মিলিত হওয়ার জন্য ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে Wood's tavern-নির্দিষ্ট করেন। এই সময়ে কফিখানাগুলিকে কেন্দ্র করে একাধিক রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়ে উঠতে দেখা যায়। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে রিপাবলিকানপন্থী জেমস্‌ হ্যারিংটনের Rota প্রতিষ্ঠার সময়েই শীল্ড নট ও লর্ড সাফট্‌বেরীর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী সঙ্ঘ Ribbon Club গড়ে ওঠে। ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিস হোয়াইটের Chocolate House টোরি গোষ্ঠীর মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অসংখ্য ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে, তবে অধিকাংশ ছিল স্বল্পায়ুসম্পন্ন। প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডের পর Calve's Head Club বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঐ দণ্ডাজ্ঞা উদ্‌যাপন করে। এই জাতীয় ক্লাবের মধ্যে Mug House Club, Hell Fire Club উল্লেখযোগ্য। ১৭১০-১১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত October Club ও হেনরি সেন্ট জনের Saturday Club (জোনাথন সুইফট্‌ উভয় সঙ্ঘেরই অন্যতম সদস্য ছিলেন) অন্যতম রাজনৈতিক সঙ্ঘ। অন্যান্য রাজনৈতিক সঙ্ঘের মধ্যে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত টোরি দলের White's ও ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত উইগ দলের Brooks's উল্লেখযোগ্য। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে ডাক্তার জনসন The Club নামে সাহিত্যবাসর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাহিত্যবাসরে এডমণ্ড বার্ক, অলিভার গোলড্‌স্মিথ, জোসেফ, এডওয়ার্ড গীবন, জেম্‌স বসওয়েলের মতো বিদ্বজ্জনের সমাগম ঘটত। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে স্যার ওয়াল্টার স্কট ও টমাস মুর মিলিতভাবে Athenian Club প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন পারস্যে পানাহারের আড্ডায় কবি-শিল্পী-গুণী-জ্ঞানী সমবেত হতেন। তাই পারস্যের কবিতায় পানশালার সাকীর কথা খুব বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে সংঘটিত পর পর কয়েকটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেশ ও কালের সীমা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করল। এই প্রতিক্রিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পষ্টভাবে অনুভূত হল। ঘটনাগুলি রাজনৈতিক হলেও সমাজের অন্যান্য স্তরে সেই আলোড়ন অনুভূত হল। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত, ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবে রাজার ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার পার্লামেন্টের দ্বারা খর্ব হওয়ায় প্রকারান্তরে ব্যক্তিক প্রাধান্য সমাজের কাছে নতি স্বীকার করল। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ মানবিক অধিকার ও সার্বিক স্বাধীনতার এক নব অধ্যায়ের সূচনা করল। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবে মুক্ত স্বাধীন মানুষের ইচ্ছার প্রথম ইতিহাস রচিত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ডে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আওয়াজ ধ্বনিত হল। সামগ্রিকভাবে তাই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মানুষ তার অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে অনুধাবন করেছে সঙ্ঘ-শক্তিই যুগের একমাত্র বাণী। সমস্যা যে স্তরের এবং যে পরিমাণেই হোক না কেন সঙ্ঘবদ্ধতা, উদ্দেশ্যের ঐক্য, ও স্থিরনিষ্ঠতা থাকলে তা থেকে উত্তরণ অনিবার্য। তাই সমস্যাকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় দূরীভূত করার মানসিকতা থেকেই সভাসমিতি গঠনের আবহাওয়া সৃষ্টি হল অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। সমাজ-জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধানের পথও অনুসন্ধান করা হয়েছে এই সব সভাসমিতিতে আলোচনার ভিতর দিয়ে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে ভল্টেয়ার রুশো লক হিউম টম পেন প্রমুখ এযুগের মনীষিবৃন্দের চিন্তাধারা এক বিস্ময়কর আবেদন সৃষ্টি করল। ফ্রান্সের সেই সময়ের একাধিক সভাসমিতি ও কাফে রেস্তোরাঁর বৈঠক এই সব নতুন চিন্তাধারার পরিপাক-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে এই চিন্তার ঢেউ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীতে তারই প্রতিক্রিয়ায় একাধিক সভাসমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ইংলণ্ডে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে Royal Society of Kingdom গঠিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে গঠিত Camdon Society প্রাচীন গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ করে পুরাতনকে নতুন যুগের আলোক ও উদ্যমে জানবার সুযোগ এনে দেয়। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে Shakespeare Society এবং ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে New Shakespeare Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গঠিত Percy Society (১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ)-র কার্যক্রমের ভিতর কয়েকটি নতুন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। স্টিফেন হোস, জন লিডগেট, চসার প্রমুখের রচনা; প্রাচীন ব্যালাড ধর্মবিষয়ক প্রাচীন রচনা ও নাটক প্রভৃতি পুনরুদ্ধার ও তার পুনর্মুদ্রণে এই সমিতি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশ ও জাতিকে তার প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। একই উদ্দেশ্যে মধ্যযুগীয় ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপক প্রকাশের জন্য

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে Early English Text Society গঠিত হয়। আমেরিকায় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে American Philological Society এবং ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে Modern Language Association গঠিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Dunlop Society আমেরিকায় পুরাতন নাটকের সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হয়।

॥ ২ ॥

উনবিংশ শতকে ইংরেজের পণ্যতরিবাহিত হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের বিপুল সম্ভার কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছাল :

> By the beginning of the nineteenth century the works of Voltaire, Hume, Lock, Tom Paine, etc. began to be imported to Calcutta. Advertisement of these books appeared in the Calcutta Gazette, Morning Post, Calcutta Chronicle and other magazines. Of these, the most popular were Tom Paine's Age of Reason and Rights of man.[৬]

এই সময় রামমোহন রায় প্রচলিত সংস্কারের নির্মোক থেকে বৈদান্তিক ধর্মের মানবহিতৈষী আবেদনের মুক্তি ঘোষণায় উদ্যোগী হন। তিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সংকীর্ণতার উন্মোচন ঘটিয়ে যুগপ্রবাহের সঙ্গে বৃহত্তর হিন্দুধর্মকে যুক্ত করতে চাইলেন :

> In 1815, in an important meeting at his house, Raja Rammohan Roy proposed the establishment of a Brahma Sabha for the purpose of teaching the doctrines of religion according to the Vedanta System, so that the superstitious nations and idolatrous practices of the Hindus may be removed.[৭]

রামমোহনের এই আহূত সভাই প্রকারান্তরে হিন্দুকলেজ স্থাপনের বীজ রোপণ করে। রামমোহন হিন্দুর পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির অবসান ঘটান এবং কুসংস্কার থেকে হিন্দু সমাজকে মুক্ত করার জন্য সভা স্থাপনের স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখান তাতে সভায় উপস্থিত হেয়ার সাহেব বিরুদ্ধতা করেন। তাঁর অভিমত হল আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটলেই জনমানসের এই অন্ধকার দূরীভূত হবে। হেয়ারের এই অভিমতের কার্যকর রূপায়ণের জন্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় জনসাধারণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ এবং সার্বিক সমর্থন ও সহানুভূতি অর্জনে উদ্যোগী হন। কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান

বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ১৪মে তাঁর নিজের বাড়িতে এই উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি হিন্দুকলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে অচিরেই এই উদ্যোগ সফল হয়। হিন্দুকলেজ আধুনিক শিক্ষার স্রোতে যে তরণী ভাসাল, নবযুগের হাওয়া প্রবল গতিতে তার পালে এসে লাগল। প্রথাগত বিদ্যাচর্চার যবনিকা পতন ঘটিয়ে হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের প্রখর দীপ্তির মুখোমুখী দাঁড় করালেন—নবযুগের তরুণ আলোকার্থীর দল তরুণ গরুড়ের মতো ক্ষুধার ব্যগ্রতা নিয়ে পাশ্চাত্যের সব কিছুকেই গ্রাস করতে উদ্যত হলেন :

> About this time the lamanted Henry Derozio by his talents and enthusiasm by his unwearied exertions in an out of the Hindu College, by his course of lectures at Mr. Hare's School, by his regular attendance and exertations at the weekly meetings of the Academic Institutions (a debating club over which Derozio presided for several years), and above all by his animating, enlightening and cheerful conversation, had wrought a change in the mind of the native youth, which is felt to this day, and which will ever be remembered by those who have benifited by it.[৮]

এই নতুন যুগ ও যৌবনের দূতেরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে চিহ্নিত হলেন। এঁরা প্রাচীন ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার কূল ছাড়লেন সত্যি কিন্তু কোথায় যে তাঁদের গম্যস্থান সে সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না। ভাঙনের নেশা যেন এঁদের পাশ্চাত্য বিদ্যায় ধাক্কা খাওয়া মগজে ভর করল—নির্বিচারে তাই প্রাচীন সব কিছুকেই নস্যাৎ করার জন্য এঁরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। "ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিওর সংস্কারমুক্ত মনের শিক্ষাদান ও আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রভৃতি নিষ্ঠাবান খ্রীস্টীয় পাদরীদের অক্লান্ত প্রচারকার্যের ফলে যুব-বঙ্গের মনে যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়, তাহার দাহে প্রাচীন শাস্ত্র, প্রাচীন সংস্কার যেন সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা হিন্দুর সকল প্রকার সংস্কার—তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক—নির্বিচারে,—কেবল ভাঙ্গিবার নেশায় ভাঙ্গিয়া চলিলেন।"[৯]

রামমোহন যেন এই আসন্ন বিপর্যয়ের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন। নবযুগের প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে দেশ এবং জাতি যাতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য তিনি তার মানস-

ভূমিটিকে সেই প্রবল আলিঙ্গন সহ্য করার মতো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজ ইতিপূর্বেই শুরু করেছিলেন। এই মানসভূমির প্রতিষ্ঠা চিরায়ত হিন্দুধর্ম। কিন্তু হিন্দুধর্ম তখন তার উদারনৈতিক আবেদন ও সর্বমানবিক কল্যাণকর্মের মহান্ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে কুসংস্কারের জীর্ণভূষণ অঙ্গে ধারণ করে সংকীর্ণতার আবর্তে নিমজ্জমান। রামমোহন হিন্দুধর্মকে সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করাকে প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করলেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোকে অভিস্নাত দেশ ও জাতি যাতে আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মৌল তাৎপর্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয় তারই আয়োজনে রামমোহন উদ্যোগী হন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আত্মীয় সভা'। বৈদান্তিক একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের অসারত্ব প্রতিপন্ন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়। পরবর্তী ব্রাহ্মসভাগুলির ধর্মান্দোলন রামমোহনের চিন্তাধারারই পূর্ণতা সম্পাদনে ব্রতী হয়। রামমোহনের এই প্রচেষ্টা যে তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তারই বাস্তব রূপায়ণ তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং পাশ্চাত্যবিদ্যায় প্রভাবিত নব্য যুবসম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মবিরোধী মনোভাবকে স্বধর্মমুখী করার জন্য যুগের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে হিন্দুধর্মের নবমূল্যায়ন ঘটানর প্রচেষ্টা রামমোহনের সেই প্রাগ্রসর চিন্তারই পরিচায়ক।

নতুনের ইশারায় মত্ত ইয়ং বেঙ্গলদল প্রথাগত জীবনের অভ্যস্ত নীতি-নিয়ম ও বিশ্বাসকে পর্যুদস্ত করতে যুক্তির শাণিত অস্ত্র প্রস্তুতের জন্য নতুন নতুন সভা-সমিতি গঠন করে সমবেত হতে লাগলেন। এই সভাসমিতিগুলি হল এঁদের স্বাধীন আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র। এঁদের উদ্যোগে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম গঠিত সভার নাম 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। জনৈক 'হিন্দুকলেজছাত্রস্য পিতুঃ' পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের আচার-আচরণ ও সভাসমিতি গঠনে উদ্বিগ্ন হয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এক পত্র প্রকাশ করেন :

> ঈঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয়কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুপ্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী....স্বদেশীয় বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ্য অধৈর্য্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহারা স্থানে ২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজ নিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজ যাওয়া রহিত করণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্দ করিলাম।"[১০]

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রসমাজের প্রাচীন ধ্যান-

ধারণা ও সংস্কারের প্রতি বিরূপতা এবং বিদেশী রীতি-নীতির প্রতি গভীর অনুরাগ সমাজের কাছে এক বিশেষ সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এই সব ছাত্রদের উদ্যোগে গঠিত সভাসমিতিগুলি নীতি-নিয়ম শাসিত সমাজের দৃষ্টিতে উন্মার্গগামী আচার-আচরণ শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

একদিকে রামমোহনের নেতৃত্বে একেশ্বরবাদী বেদান্তধর্মের প্রচার, পৌত্তলিকতাবিরোধী আন্দোলন ও পরিশেষে সতীধর্ম-বিলুপ্তি আন্দোলন অপরদিকে ইয়ং বেঙ্গলের দেশীয় সব কিছুর প্রতি বিপক্ষতা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত করল। তাই রক্ষণশীল সমাজ আত্মরক্ষার উপায় অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন সভাসমিতি গঠন করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। এঁদের উদ্যোগে সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার আবেদন জানিয়ে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। এই সভা সতীধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও হিন্দু যুবকদের ক্রিশ্চান প্রভাব মুক্ত করে সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষায়ও উদ্যোগী হয়। ব্রাহ্মধর্মের সাফল্যজনক অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার জন্য 'ঢাকা হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা', 'বোয়ালিয়া ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে স্থাপিত 'ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা' হিন্দুধর্ম রক্ষায় বাংলার বাইরেও যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করেছিল। রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রচেষ্টায় এই সময় একাধিক সভাসমিতি গঠিত হয়। যুগের দাবীকে স্বীকৃতি জানান এবং নব্য যুবকদের পাশ্চাত্যের প্রতি ব্যাকুল ব্যগ্রতাকে প্রশমিত করে আত্মস্থ করার জন্য উভয়বিধ দায়িত্ব নিয়ে রামমোহনের আরব্ধ কাজকে সমাধা করার জন্য এগিয়ে এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ। এঁদের প্রচেষ্টায় গঠিত হতে লাগল একাধিক ব্রাহ্মসভা। দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা', দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধের সূত্রে কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তাঁর অনুগামীরা ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। এছাড়া ১২৭১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত বেহালায় 'ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিণী সভা'র মতো বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্ষণশীল হিন্দুরা নতুন নতুন আঘাত থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য কৌশল পরিবর্তন করে নতুন সভাসমিতি গঠনে উদ্যোগী হন এবং এই শ্রেণীর সভাসমিতি-গুলিতে পূর্বের অনমনীয় মনোভাবের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এ প্রসঙ্গে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে স্থাপিত 'পতিতোদ্ধার নিবারণী সভা' উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাদেশে ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে প্রবল

আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে অপর দিকে তেমনি নব্যশিক্ষিতদের জীবনাচরণে প্রথাগত জীবন-প্রবাহের প্রতি অস্বীকৃতিবোধ এত উৎকটভাব আত্মপ্রকাশ করল যে বাঙালী-সংস্কৃতির গৌরবস্বরূপ শিষ্ট আচরণ ও প্রবৃত্তির সংযম এ সময়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে। নব্য সম্প্রদায়ের উদ্ধত আচরণ, অসংযত রসনা ও নীতিবিগর্হিত অসামাজিক ভ্রষ্টাচারের প্রতি প্রবণতা সমাজের বুকে ক্লেদপঙ্কিল প্রবাহ বহন করে আনল। প্রকাশ্য সুরাপান, নিষিদ্ধ ভক্ষণ ও লাম্পট্য প্রভৃতি দোষ যুবসমাজের মধ্যে উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করল। এই সব অসামাজিক অনাচার রোধ কবার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা', ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা', রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সুরাপান নিবারণী সভা', ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ', ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' প্রভৃতি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্য বিদ্যার সুফলকে সমাজের সর্বাত্মক জাগরণে কার্যকর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও এই সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার চর্চা ও বাংলা ভাষায় দেশ-বিদেশের গ্রন্থ অনুবাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদ-কর্মের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং ক্রমশ সেই উদ্যোগ ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হতে থাকে। দেশ-বিদেশের উন্নত সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করানই ছিল এই অনুবাদকর্মের মহত্তর ও বৃহত্তর দিক্। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই অনুবাদের ক্ষেত্রে পদচারণা করে যাতে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তার জন্য একাধিক সভাসমিতি অনুবাদকর্মে ব্রতী হয়। দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল বুক সোসাইটি' এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামমোহন রায়ের 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা', ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' ও 'জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা' এবং ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' প্রভৃতি একাধিক সভাসমিতি উল্লিখিত উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রকে ক্রমশ সম্প্রসারিত করতে এই যুগের বিদ্বৎসভাগুলি আরও একটি বিশিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের বিষয় বাঙালীর কাছে দীর্ঘ দিন ধরে উপেক্ষিত ছিল। অথচ আধুনিক যুগের স্বর্ণদ্বার উন্মোচনে বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। বিজ্ঞানচর্চাকে উপেক্ষা করে সংস্কারবদ্ধ বাঙালী সমাজের জড়ত্ব মোচন সম্ভব নয়—এই সত্যটি এ যুগে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তাই যুগের অগ্রগতির সঙ্গে দেশ ও জাতিকে সমন্বিত করার জন্য সভাসমিতিগুলি বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল বুক সোসাইটি' জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক সুলভ

মূল্যের গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। বিজ্ঞান-ভিত্তিক কৃষি উন্নয়নে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে 'এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' বাংলা দেশে বিজ্ঞান-চর্চার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রচনা করে। এছাড়া অন্যান্য সভাসমিতিগুলিও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে প্রভূত উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সর্বাত্মক জাগরণের দিনে শাস্ত্র-শাসনের নিষ্পেষণে বাংলার নারীসমাজের মৌন-মলিন মুখের দিকে সমাজের সহানুভূতির দৃষ্টিক্ষেপ ঘটল সভাসমিতির প্রাঙ্গণ থেকে। গৃহবদ্ধ নারীসমাজ যাতে আপন ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারে তার জন্য তাদের শিক্ষাদানের প্রস্তাব এইসব সভাসমিতি থেকে গৃহীত হয়। সংস্কারের যূপকাষ্ঠ থেকে এই নারীসমাজের পূর্ণ মুক্তি তখনই সম্ভব হবে, যখন মুক্তিলাভের উদ্যোগ তারা নিজেরাই গ্রহণ করবে, শিক্ষাই হবে সেই পথে অগ্রগমনের প্রধান অবলম্বন। সভাসমিতিগুলি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারের মতো বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি সামাজিক অভিশাপের অবসান-কল্পে এই ভাবে ব্রতী হয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল সোসাইটি', 'ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি', ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা', ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভা', ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি', ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী সভা' ও 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' প্রভৃতি একাধিক সভাসমিতি নারী জাগরণের বৈপ্লবিক উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের স্ফুরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। স্বদেশ ও স্বজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের মূল মন্ত্র জাতীয়তাবোধের মধ্যেই নিহিত—এ সত্যের উপলব্ধি কিছু বিলম্বে ঘটলেও তা এই যুগেই বিদ্বজ্জনের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। দেশবাসীর মঙ্গল চিন্তা, দেশীয় সকল কিছুর প্রতি আগ্রহ সঞ্চার, বিদেশী শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা ও আপন অধিকার সম্পর্কে দেশবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সভাসমিতিগুলির তৎপরতা প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তা-বোধ ও দেশাত্মবোধকে লালিত করেছে। স্বাধিকারবোধ থেকে স্বাধীনতার স্পৃহা এবং তার জন্য রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ খুব ক্ষীণভাবে হলেও এযুগের সভাসমিতিতে তা গৃহীত হয়েছে। এই সভাসমিতিগুলির মধ্যে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা', ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ভূম্যধিকারী সমাজ' ও 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি', ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েশন', ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা', ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মহাসভা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন আলোচনা, মতামত বিনিময় ও গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সভাসমিতি গঠনে বাংলার বিদ্বৎসমাজ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও বহু উদারচেতা ও মহৎপ্রাণ ইউরোপীয় বিদ্বজ্জন সেই সব সভাসমিতি গঠনে ও কর্মসূচী রূপায়ণে এগিয়ে আসেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা মুখ্য ভূমিকা পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আহূত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে' উপস্থিত ভারতহিতৈষী ইউরোপীয়দের মধ্যে ডেভিড হেয়ারের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। সেইসঙ্গে তৎকালীন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিল, বাংলার ডেপুটি গবর্নর ডবলিউ. ডবলিউ. বার্ড, বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্নেল বিটসন ঐ সভায় মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের বিতর্কে উৎসাহ দিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে ইংলণ্ড থেকে আগত ক্রীতদাসপ্রথা-বিরোধী ও ভারতহিতৈষী বাগ্মী জর্জ টমসন কলকাতায় 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতের সামগ্রিক উন্নতির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁরই পরামর্শে এই সভার সদস্যেরা 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করে। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে'র কর্মসমিতির অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন। এই সভার উদ্যোগে ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদকর্মে পাদ্রী রবিনসন ও ড. রোয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেথুনের মৃত্যুর পর ঐ সভায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন জে. আর. কলভিন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন অন্যতম প্রধান অধ্যাপক ও শিক্ষা-সমাজের সম্পাদক এস. জে. মৌএট 'বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি ছিলেন। এই সমিতিতে দেশীয় কৃতবিদ্য সদস্যদের সঙ্গে এস. জে. মৌএট, পাদ্রী জেমস্ লঙ্, মেজর জি টি. মার্শাল, ড. স্প্রেঙ্গার ও এ. এল. ক্লিট প্রমুখ পাঁচজন ইংরেজ সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে রেভারেণ্ড ডাফ এই সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র স্থায়ী সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এইচ. হেলিউর এবং সোসাইটির অধিবেশনে প্রায়ই পাদরী লঙ্ ও ইউনিট্যারিয়ান পাদরী সি. এইচ. এ. ড্যাল উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। 'বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে' পাদ্রী কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কয়েক বৎসর সভাপতির দায়িত্বভার প্রাপ্ত হন। বাঙালীদের উদ্যোগে গঠিত এই সভায় প্রথম দিকে ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান চলত। পাদ্রী লঙ্ বিদেশী হয়েও বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে ছিলেন, তাই ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি উক্ত ক্লাবে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও প্রবন্ধ পাঠ ও

বক্তৃতাদানের নিয়ম প্রবর্তন করেন। ভারতহিতৈষিণী মিস্ মেরী কার্পেন্টার 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'র নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। এরূপ অনেক প্রগতিশীল ইংরেজ বাংলা দেশের সভাসমিতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এযুগের সভাসমিতিগুলির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। একটি সভা যে কেবল একটি বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকর রূপায়ণে ব্যাপৃত থাকত তা নয়, এক সঙ্গে একাধিক বিষয়কার্যের মধ্যে সভার উদ্যোগ ব্যয়িত হত। কোন সভাসমিতিতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ থাকত এবং সমিতিভুক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে একক বা যৌথ ভাবে এক একটি বিভাগের দায়িত্বভার অর্পণ করা হত। অবশ্য অন্যান্য সদস্যও সহযোগিতাদানে কুণ্ঠিত হতেন না। এইভাবে দায়িত্ব বণ্টনের মূল লক্ষ্য হল, সকলের দায়িত্ব অথচ কারুর দায়িত্ব নয়—এই বিভ্রান্তির পাকে পড়ে আসল উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা। একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত সভা বা সমিতির সংখ্যাও এযুগে খুব নগণ্য ছিল না। আবার এক স্থানে গঠিত সভা বা সমিতির উদ্দেশ্য দেশের অন্যত্র সম্প্রসারিত করার জন্য একাধিক শাখ-সংগঠনও স্থাপিত হত। এই শাখা-সমিতিগুলি কোথাও মূল সমিতির সকল প্রকার লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগী হয়েছে, আবার কোথাও উদ্দেশ্য বিশেষের রূপায়ণে ব্রতী হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শ বা উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখেই সভাসমিতির নামকরণ করা হত। হিন্দুধর্ম এবং বিশেষভাবে সতীধর্ম রক্ষার জন্য ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সভার নামকরণ করা হয় 'ধর্মসভা', ঐ একই বৎসরে জ্ঞান-বিদ্যা আলোচনার জন্য স্থাপিত সভার নাম দেওয়া হয় 'জ্ঞানসন্দীপন সভা', স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা', ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল লেডিস সোসাইটি' এবং ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী সভা'। ভ্রষ্টাচারিতার বিরুদ্ধে এবং সদাচার অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সভা' ও 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'। দেশীয় ভাষা ও শিক্ষা সম্প্রসারিত করার আবেদন গড়ে তোলার জন্য ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গভাষা-নুবাদক সমাজ'। সমস্যা-বিশেষের জটিলতা ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই সমস্যাভিত্তিক সভা বা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য মিশ্র উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত সভাসমিতির সংখ্যাই সে যুগে বেশি ছিল। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সভা হলেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সামাজিক ভ্রষ্টাচার নিবারণ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্যের চর্চার জন্য ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বিধবাবিবাহেও উৎসাহ দানে

তৎপরতা গ্রহণ করে। এ যুগের সভাসমিতিগুলি এইভাবে বিচিত্র বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থেকে দেশ ও দেশের কল্যাণে ব্রতী হয়েছিল। বাংলা দেশে এই সময় সভাসমিতি গঠনের যেন এক জোয়ার এসেছিল। এই জোয়ারের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার সকল কৃতবিদ্য মানুষই অল্প-বিস্তর যুক্ত হয়েছিলেন। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, এ যুগে সমাজের মঙ্গল-চিন্তায় যিনিই শরিক হয়েছেন তিনিই সভাসমিতিগুলির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন :

> It is clear that somehow or other, the more advanced portion of the Bengalies of Calcutta of old days felt the necessity of having some means placed at their disposal by the aid of which they might discover mutual ground where all can meet on equal terms, casting off caste prejudices and private feelings, and taking to purely intellectual, literary, and scientific discussions This necessity was assuredly felt, and fell in the proper quarters too, for there was a agitation, the result of which was the establishment of several institutions all more or less with the some end in view.[১১]

বাংলাদেশে এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগে সমস্যার অন্ত ছিল না এবং সেই সব সমস্যার সমাধান-পন্থা উদ্ভাবনে বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনের ব্যাকুল ব্যগ্রতা থেকেই অসংখ্য সভা-সমিতির সৃষ্টি হয়। সমাজের সমস্যাগুলি ছিল যেমন বহুবিষয়ক, সেগুলির সমাধানকল্পে গঠিত সভাসমিতির সংখ্যাও ছিল অসংখ্য এবং এই সভাসমিতিগুলির নামের বিভিন্নতা সমস্যাকেন্দ্রিক হওয়ায় ব্যাপারটা বেশ কৌতুকপ্রদ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব-প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশে কবির জনসংযোগের দিক্ বর্ণনা করতে গিয়ে এযুগের সভাসমিতিগুলির সংখ্যাধিক্য ও তাদের কার্যক্রম এবং নামের বৈচিত্র্য-প্রসঙ্গে একটি পরিহাসরসিক মন্তব্য করেছেন :

> "তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই. তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জল তরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী,

ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচায় অলাবুসম্পহারিণী সভাসকল সভ্য সংগ্রহের জন্ম আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।”[১২]

বাংলার বিদ্বৎসমাজে সভাসমিতি গঠনের আগ্রহ পরিশেষে অনেকটা হুজুকে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য এই সভাসমিতির গঠনের মূলে মঙ্গলচিন্তা ও সমাজহিতৈষণা ছিল, কিন্তু সকল কিছুর বাড়াবাড়ি যেমন বিষয়ের গুরুত্বকে কিছু লাঘব করে দিয়ে পরিহাসের সুযোগ এনে দেয়, এক্ষেত্রে সভাসমিতির গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা খর্ব না হলেও সংখ্যাধিক্যই হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সভাসমিতির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সম্পর্কে সরস মন্তব্য করতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস-রসিকতার মাত্রাকে অতিক্রম করে উচ্চকণ্ঠ হাস্যরোলে পরিণত করেছেন :

> "....it seems necessary that a society should be established, with the declared object of putting down societies. Its name should be Sabha-Nibarani Sabha or a Society for preventing the foundation of societies, and its members should bind themselves to rush with arms and sticks into all places where members of any society meet and dispurse them by force."[১৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সব সভাসমিতি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেও এদের প্রাণ-ভোমরাটি কলকাতাকেন্দ্রিক সভাসমিতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কারণ, সে সময়ে কলকাতা ছিল নবোত্থিত ভাববন্যার কেন্দ্রস্থল। শহর কলকাতা থেকে উত্থিত ধ্বনিই বাংলার দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য সভাসমিতি গড়ে উঠেছে। এই সব সভাসমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাংলাদেশের সার্বিক সমস্যা ও তার সমাধান চিন্তা করা এবং দেশবাসীর গরিষ্ঠতম অংশের কল্যাণকর্মে সমবেত প্রয়াসকে কাজে লাগান। যে স্বল্প সংখ্যক সভা-সমিতি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠেছিল তার পশ্চাতেও ছিল কলকাতার ভাববন্যার প্রতিফলন অথবা তৎকালীন কলকাতার শিক্ষাসংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত মনীষিগণের উদ্যোগ। গ্রামবাংলার মানুষ স্বাধীন ভাবে সভাসমিতি গঠনের উদ্যোগ খুব কমই গ্রহণ করেছে। অথচ দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যার যেখানে বাস সেখানে সভাসমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হলে সার্বিক জাগরণ সম্ভব নয়। এই অসম্পূর্ণতার কথা হয়তো অনেকেই চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষকে প্রত্যক্ষ

ভাবে উদ্যোগী হবার জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকাই প্রথম আহ্বান জানায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে :

"গ্রাম্যসভা

"... মফঃসলের প্রতি পল্লীতে এক একটা সভা সংস্থাপন করা আবশ্যক। গ্রামের অধিকাংশ উত্তম মধ্যম ব্যক্তি ঐ সভাতে সময়ে সময়ে সমবেত হইবেন। তথায় সুশিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, নব্য ও প্রাচীন সকল সাম্প্রদায়িক লোকেরই সমাগম হইবে। পান তামাক ইত্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবহারের এবং গান বাদ্য প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ করিবার সুবিধা থাকিবে। সভার দিবস সভ্যেরা কিয়ৎকাল উপবেশন, শিষ্টালাপ, ক্রীড়া ও গান বাদ্যাদি নির্দোষ আমোদ প্রমোদ করিয়া সভা ভঙ্গ করিবেন। এইরূপ সভার নিমিত্ত গ্রামের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সাধারণ স্থান নিরূপিত ও সভাগৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত সভ্যেরা এককালীন বা প্রতি মাসে কিছু কিছু চাঁদা দিবেন। চাঁদার অর্থ সকলেরই তুল্য দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা যে ব্যক্তি অধিক দিবেক সে অবশ্য অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিবেন, তাহাতে সভ্যদিগের স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইবে এবং সভার যে মুখ্য উদ্দিষ্ট সকলে সমতুল্য হইয়া মিলিত হইবেন তাহার ব্যাঘাত হইবে। সভার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে এক এক ব্যক্তিকে তার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, ইহা একটা আস্ত নূতন বিষয়ক কথার উত্থাপন হইতেছে। সচরাচর পল্লীগ্রামের এই সভার অনুরূপ প্রায়ই এক একটা সভার স্থান নিরূপিত আছে ও তাহার আংশিক রূপে উল্লিখিত রূপ সভার কার্য্যও নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই প্রস্তাবে কেবল সেই প্রণালী উৎকৃষ্ট নিয়মানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে। সচরাচর পল্লীগ্রাম মধ্যে অপেক্ষাকৃত কোন সম্পন্ন লোকের বাটীতে প্রায়ই গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্র ও অভদ্র জাতীয় প্রাচীন ও নব্য সাম্প্রদায়িক লোকেরা সায়ংকালে বা সময়ান্তরে উপস্থিত হবেন। তাঁহারা তথায় কিয়ৎক্ষণ খেলা গান বাদ্যাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করেন। এইরূপ সভাতে পান তামাক ইত্যাদি বিষয়ে যাহা কিছু ব্যয় হয় তাহা ঐ বাটীর অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ সভার দোষ এই যে বড় মানুষ বা সম্পন্ন লোকের বাটীতে যে সকল গ্রামস্থ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই কতক পরিমাণে ঐ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সঙ্কুচিত ও বাধ্য থাকিতে হয়, প্রায়ই তোষামোদ দ্বারা উহাদিগের নিকট চাটুকারিতা প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় কদাচই প্রকৃত সুখানুভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ মজলিসে প্রায়ই কোন প্রকার উন্নতির উপায় বিধান করা হয় নাই। কিন্তু পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ

অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের প্রস্তাবিতরূপ সভা করিলে পূর্বোক্ত মজলিসের অভিপ্রেত কার্য্যের লভ্য অবিরোধে কাকতালীয় ন্যায় লক্ষিত হয় কি না ?

প্রথমতঃ। প্রস্তাবিতরূপ ভাবী সভাতে শতাবধি লোকের সমাগম হইবে, সুতরাং সকলের পরামর্শে গ্রামস্থ ব্যক্তিসাধারণের উন্নতির উপায় বিধান করা হইতে পারে। কিসে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের জনশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য কুটুম্বিতা, বাটী, ঘর নির্ম্মাণ ইত্যাদির সুবিধা, উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা হইবে, তাহার পরামর্শ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ। সাধারণের উপরি কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ হইতে পারে। মনে কর গ্রামস্থ ব্যক্তিগণেব প্রতি রাজার বা জমীদারের বা অন্য কোন বিদেশীয় ব্যক্তির কোনরূপ অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে এমন স্থলে অবশ্যই ভদ্রাভদ্র সকলের পরামর্শে যত দূর সুবিধাদানের উপায় হইতে পারে তাহার নিবারণ হওয়ার অসম্ভাবনা কি ? প্রায়ই গ্রামস্থ ব্যক্তিগণকে এমন সকল স্থলে মধ্যে মধ্যে পঞ্চায়িত করিতে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ সভায় নিয়ম থাকিলে আর বিশেষ চেষ্টা পাইয়া পাঁচ জনকে আহ্বান করিতে হইবেক না, অথচ সামান্য ব্যক্তিগণ বিশেষ আহ্বান কবিলেও যাঁহাদিগের উপস্থিতি লাভ করিতে পারিত না তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপস্থিত থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ। পবস্পরের বিরোধ-ভঞ্জন ও ঐক্যসম্পাদন হইতে পারে। ভ্রাতৃবিরোধ, জ্ঞাতিবিরোধ, দলাদলী, গ্রামস্থ এক ব্যক্তির সহিত ব্যক্ত্যন্তরের কোন বিষয়ঘটিত বিরোধ প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে। সে সকল বিষয় অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা মীমাংসিত হইলে বিলক্ষণ ইষ্টলাভ হইতে পারিবে, আশ্চর্য কি ?

চতুর্থতঃ। পরস্পরের বা অন্য কোন ব্যক্তির উপকারার্থে ধন সঞ্চয় কবা যাইতে পারে। মনুষ্যের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; এক সময় যাঁহার গৃহ ধন, জন ও আমোদপ্রমোদ পরিপূর্ণ দেখা যায়, কিছুকাল পরে আবার তাহাকে ধনহীন, জনহীন, মহাদুঃখে পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। মারীভয়, ডাকাইতি, গৃহদাহ ইত্যাদি দুর্ঘটনা ঐরূপ বিপৎপাতের কারণ। কিন্তু প্রস্তাবিত রূপ সভাতে সভ্যেরা সমবেত হইলে দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত চাঁদা অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারে, সৌভাগ্যবশতঃ গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের ঐরূপ কোন ক্ষতি উপস্থিত না হইলে অপেক্ষাকৃত বিদেশীয় দীন, দরিদ্র, অনাথা, বন্ধু, অন্ধ, কুষ্ঠী প্রভৃতির উপকারের নিমিত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। পাঠকবর্গ মনে করুন যদি আমাদিগের অভীপ্সিত সভা হইতে এক দিনের জন্য এতাদৃশ মহার্থ লাভ হয় তাহা হইলে ঐ সভা কি পরম মনোহারিণী মূর্ত্তিই ধারণ করিবে ?

পঞ্চমতঃ। ঐরূপ সভাতে বিদ্যা ও ধর্ম্মের আলোচনা হইলে আবার কি অনির্ব্বচনীয় সুখের উৎপত্তি হইবে ? মনে করুন গ্রামস্থ প্রাচীন সাম্প্রদায়িক কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্ম-বিষয়ক

বক্তৃতা করিতে থাকুন, অন্যান্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত প্রাচীন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিতে থাকুন। এদিকে অন্যতর স্থানে সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়, বাঙ্গালা ইংরেজী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাতে সুকুমার সাহিত্যাদি শাস্ত্রের বক্তৃতা করিতে অভ্যাস করুন। যিনি যে বিষয় উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন তিনি তদ্বিষয় অন্যকে উপদেশ প্রদান করুন; উপস্থিত সকলের মনোহরণ করিতে থাকুন। তখন কি শ্রোতৃমণ্ডলী কি বক্তৃগণ কি অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ ও সুধামৃত-হ্রদে নিমগ্ন হইবেন।

ষষ্ঠতঃ। শারীরিক ব্যায়াম ও হাস্য পরিহাস এবং গান বাদ্য ক্রীড়াদি নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করত পরম সুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করা যাইবে অথচ তদ্বিষয়ে কাহাকেও কাহার অধীন বা কাহার নিকট সঙ্কুচিত বা ভীত বা অধিক ব্যয়ের ভাগী হইতে হইবে না।"[১৪]

প্রবন্ধটিতে গ্রাম্য সভাসমিতি গঠনের কাঠামো সম্পর্কে যে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে তা কেবল গ্রাম্য সভা সম্পর্কেই যে প্রযোজ্য তা নয়; শহরের সভাসমিতি গঠন সম্পর্কেও কয়েকটি নির্দেশ অবশ্যগ্রাহ্য। গ্রাম্য সাধারণের প্রতি সভাসমিতি গঠনের যে আবেদন করা হয়েছে তার মূল লক্ষ্য হল গ্রামীণ মানুষকে শহরবাসীর অর্জিত নবজীবনধারার সঙ্গে সমন্বিত করা। তাছাড়া রেনেসাঁসসঞ্জাত জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ শহরবাসী বাঙালী তার দীর্ঘ দিনের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সামন্ততান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গণতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে ব্যক্তিজীবনে যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তাকেও গ্রামবাংলার সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। তাই প্রবন্ধে সভ্যদের প্রতি এই বলে সতর্কীকরণ করা হয়েছে যে, 'চাঁদার অর্থ সকলেরই তুল্য দেওয়া কর্তব্য, নতুবা যে ব্যক্তি অধিক দিবেক সে অবশ্য অধিক ক্ষমতা প্রকাশাকাঙ্ক্ষা করিবেক, তাহাতে সভ্যদিগের স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইবে এবং সভার যে মুখ্য উদ্দিষ্ট সকলে সমতুল্য হইয়া মিলিত হইবেন তাহার ব্যাঘাত হইবে।"

॥ ৩ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর নবজীবনছন্দের সর্বাধিক স্পন্দন অনুভূত হয়েছে এ যুগের সভাসমিতিগুলিতে। ব্যক্তির মানস-চর্চার সেখানে সর্বাধিক সুযোগও ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে সম্মিলিত আলোচনায় যুগ ও জীবনের অধিকাংশ প্রয়োজন ও সমস্যা স্থান পেয়েছে। একদিকে দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তার জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সেই গ্রন্থকে উপযুক্ত মানে উন্নীত করার জন্য দেশী-বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ প্রয়াসে এই সভাসমিতি যেমন উদ্যোগী হয়েছিল তেমন দেশের ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক সমস্যার সমাধানেও ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সমস্যার আলোচনা ও তার সমাধান-

পন্থা অনুসন্ধানেই সভাসমিতির উদ্যোগ ও উপস্থিত বিদ্বজ্জনের দায়িত্ব নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তাঁরা রচিত সাহিত্যে তাঁদের সেই মনোভাবকে রূপদান করেছেন। আবার সকল মতের সঙ্গত বা অসঙ্গতভাবে যেমন বিরুদ্ধতা করা যায় তেমনি বিরুদ্ধবাদী লেখক তাঁর রচনায় এই সব সভাসমিতির মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এ যুগের বাংলা সাহিত্যের বিষয় বিন্যাস করলে দেখা যাবে একাধিক বিষয় সভাসমিতির প্রাঙ্গণ থেকে উপচিত হয়েছে। কোথাও দেখা যায় কোন রচয়িতা একেবারে সরাসরি সভাসমিতিতে ঘোষিত আদর্শের প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন, আবার কেউ সেই আদর্শের স্পষ্ট বিরুদ্ধতাকে তাঁর রচনায় পরিস্ফুট করেছেন। অবশ্য তা বলে যে এই শ্রেণীর রচনাগুলি প্রচারধর্মিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এমন কথা বলা সর্বক্ষেত্রে সঙ্গত হবে না। সমকালীন বাংলা সাহিত্য সভাসমিতি থেকে উত্থিত ভাবমন্দাকিনীর প্রবাহে এই ভাবে অধিকতর পুষ্ট হয়েছে। কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক বা নাট্যকার তাঁদের রচনায় স্ব স্ব মানস-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সভাসমিতি-গুলির অভিমতের স্বপক্ষতা বা বিপক্ষতাকে সমন্বিত করে প্রতিফলিত করেছেন। বিভিন্ন রচনায় সভাসমিতি থেকে আহৃত উপাদানের ব্যবহারে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোথাও সৃষ্ট সাহিত্যের কায়া গঠন ও কান্তি সম্পাদনে তা ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও সেই উপাদান ঘটনা বা চরিত্রচিত্রণে ছায়া সম্পাত করেছে, আবার কোথাও প্রত্যক্ষতঃ সভাসমিতির অভিপ্রায় অনুযায়ী অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করে সাহিত্য রচিত হয়েছে।

দেশ ও কালের প্রয়োজনেই এই সভাসমিতিগুলির সৃষ্টি ; কারণ সেই সময়ে সভা-সমিতিগুলি সমাজের বহুতর সমস্যার সমাধানসূত্র সন্ধানেই ব্যাপৃত ছিল। আর এই সব সভাসমিতিগুলি সমকালীন বাংলার কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের উদ্যোগ ও সহযোগিতাতেই গড়ে উঠেছিল। যুগপ্রবাহের দিক্‌নির্দেশক-স্বরূপ সেই সভাসমিতিগুলির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে এ যুগের কোন বড় সাহিত্যিক নিঃসঙ্গ নির্বাসনে নিশ্চিন্ত-নিভৃতে সাহিত্যচর্চা করতে পারেন নি। তাই বাংলা সাহিত্যের করকোষ্ঠি বিচার করতে গিয়ে ড. সুশীলকুমার দে যথার্থই বলেছেন :

> "Literary movement in Bengal had perforce been closely bound up with political, social, religious and other movements.......Every great writer of this period of transition was of necessity a politician, a social reformer, or a religious enthusiast."[১৫]

সভাসমিতির শুষ্ক যুক্তিতর্কের বুদ্ধিগ্রাহ্য আবেদন সামাজিক সাধারণের কাছে পৌঁছতে যে আয়াসের প্রয়োজন হয়, সাহিত্য সেই দায়িত্ব স্বল্প আয়াসে এবং অধিকতর দ্রুততার

সঙ্গে উপযুক্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যমানতা দান করে বহন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যিকের মানসগঠনে এবং সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে সভাসমিতির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

সভাসমিতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠা এযুগের সাহিত্যে দ্বিবিধ চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এক শ্রেণীর রচনা প্রত্যক্ষভাবে সভাসমিতির বক্তব্যকে আপন বক্ষে বহন করে প্রচারধর্মী রচনায় পরিণত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সভাসমিতির মুখপত্রের ভূমিকা নিয়েছে। অপর শ্রেণীর রচনা সভাসমিতির বক্তব্যের স্বপক্ষতা বা বিপক্ষতা করেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে বা সাহিত্য হয়ে উঠতে প্রয়াসী হয়েছে। তাই প্রচারসর্বস্ব রচনাগুলির বিশ্লেষণ বাহুল্যবোধেই সভাসমিতির প্রভাবে সৃষ্ট সাহিত্যের আলোচনায় যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। এযুগের সাহিত্য-গঠনে সভাসমিতির ভূমিকা আলোচনা করলে আমরা সাহিত্যিকের মানস-প্রক্রিয়ার আর একটি অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হব।

প্রথম অধ্যায়

॥ ধর্মান্দোলন ও সমাজসংস্কারে সভাসমিতি ॥

দীর্ঘকাল ধরে বাংলার হিন্দুসমাজ শাস্ত্র-সাহিত্য ও জীবনচর্চার ক্ষেত্রে প্রথাবদ্ধ পথে পদচারণা করে এসেছে এবং তারই ফলে গভীর আত্মসন্তুষ্টিবোধ সমগ্র হিন্দু জাতির মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রেও ঐ একই কারণে বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ-বর্জনের উদার মানসিকতা তিরোহিত হয়েছিল। ফলে হিন্দুধর্মের প্রাচীন প্রবাহ আচারের আবর্জনায় ক্রমশ রুদ্ধগতি হয়ে পড়তে থাকে। যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারের যুগ উনিশ শতকে এই সংকট স্পষ্ট ভাবে সামাজিক সাধারণের সচেতন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। অবশ্য এই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে খ্রীস্টধর্মপ্রচারক ও ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষভাবে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার প্রসার ঐ দুয়ের মধ্যে আবার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও ধ্যানধারণাকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে অনুসরণে উদ্যোগী হলেন এবং অপরাংশ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন। ইংরেজী শিক্ষার ক্রমপ্রসার খ্রীস্টধর্ম প্রচারেও পরোক্ষভাবে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। লর্ড মেকলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা সম্প্রসারের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে এ বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর ভারতবর্ষ থেকে তাঁর পিতার উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিতে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন :

"It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idoleter among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without any efforts to proselyties, without the smallest interference with religious liberty ; merely by the natural operation of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the prospect."[১]

মেকলের এই বিশ্বাসবোধের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে, কারণ ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে নব্য যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের প্রতি আসক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে; বিশেষভাবে অহিন্দু মনোভাব ও আচার-আচরণ উৎকটভাবে প্রকাশ পায়। প্রচলিত জীবনাচরণের প্রতি বিরুদ্ধতা এবং হিন্দুধর্ম ও

সংস্কারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনকে নব্য যুবসম্প্রদায় প্রগতিশীলতা বলে বিবেচনা করেন। নব্য যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিকৃতি লক্ষ্য করে হিন্দু সমাজপতিরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা এই অবস্থায় ধর্মরক্ষার প্রথম ও প্রধান উপায় হিসাবে রক্ষণশীলতার বর্মকে সর্বাধিক নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল এই ব্যবস্থা সামগ্রিক বিপন্মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং নব্য যুবসম্প্রদায় ছাড়াও শিক্ষা-সচেতন হিন্দুদের একটি গরিষ্ঠতম অংশ রক্ষণশীলতার বর্মকে স্থায়ী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে পারলেন না। তাঁদের অভিমত হল, যুক্তিহীন কঠোর বিধিনিষেধ বিচার-বিশ্লেষণের যুগে বেশি দিন এই উপপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। ধর্মরক্ষাব নামে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সতীদাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অভিশাপগুলিকে কঠোর নিয়মবন্ধনে রাখা অবশ্য-কর্তব্য বলে বিবেচনা করলেন। তাঁদের বিবেচনায় এগুলি মেনে চলায় ধর্মরক্ষা এবং এগুলি অবমাননায় ধর্ম-নাশ হবে। শিক্ষা-সচেতন প্রগতিশীল যুক্তিবাদী হিন্দুসম্প্রদায় ধর্মের মানবহিতৈষী দিকগুলিকে সমাজের সামনে তুলে ধরাকে যথার্থ ধর্মরক্ষার উপায় বলে স্থির করলেন। তাই সর্বপ্রথম তাঁরা এতাবৎকাল ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত অধার্মিক অত্যাচার থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হলেন। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজপতিরা একে ধর্মের উপর আক্রমণ বিবেচনা করে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। হিন্দুধর্মকে কলুষতা মুক্ত করা যাঁরা প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেন তাঁরা সেই দিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য দুটি পথ বেছে নিলেন,—এক শ্রেণীর সংস্কারকগোষ্ঠী হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই এই আন্দোলন চালাতে লাগলেন এবং অপর গোষ্ঠীর সংস্কারকগণ হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে উন্মুক্ত উদার ক্ষেত্রে ধর্মের আবেদনকে পৌঁছে দেবার জন্য 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে পৌত্তলিকতাবিরোধী একেশ্বরবাদী বৈদান্তিক ধর্মমত অনুসরণে উদ্যোগী হলেন। উভয় শ্রেণীভুক্ত সংস্কারকগণই প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে যুক্তির আলোকে হিন্দুধর্মের মূল তাৎপর্য বিশ্লেষণের দ্বারা জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সভাসমিতি গঠন ও হিন্দুধর্মের প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যের নির্মোহ ব্যাখ্যার দ্বারা সংস্কারমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী হন। এই উভয়বিধ সংস্কারপ্রচেষ্টা সর্বপ্রকার গোঁড়ামিমুক্ত নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হতে থাকে। তাই যুক্তি তাঁদের হাতিয়ার, দৃষ্টি সর্ব সংস্কারমুক্ত উদার এবং লক্ষ্য মানবকল্যাণ।

নব্য যুবসম্প্রদায় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হওয়ার মতো মানসিকতার অধিকারী ছিলেন না। তাঁরা দেশের জলহাওয়ায় লালিত হয়েও ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলে পাশ্চাত্যের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকেন। হিন্দুর

জীবনাচরণ ও ধর্মের সকল কিছুকে ভ্রান্তবোধে পরিহার করে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শকে শ্রেয়বোধে নির্বিচার-অনুসরণে মত্ত হয়ে পড়েন। হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষা ও সাহচর্যে এঁর হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকতাসর্বস্ব এক অন্তঃসারশূন্য ধর্ম হিসাবে চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকেন। কেউ কেউ হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"The junior students caught from the senior students the infaction of ridiculing the Hindu religion and where they were required to utter mantras or prayers, they repeated lines from the Iliad. There were some who flung the Brahmanical thread instead of putting it on."[২]

হিন্দুধর্মের উপর এই বহুমুখী আন্দোলনেব চাপে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিপন্ন বোধ করল। নেতৃস্থানীয় সমাজপতিরা এই পরিস্থিতিকে স্ববশে রাখার জন্য একদিকে যেমন কঠোরতর আচরণবিধি ও সংস্কারের প্রতি আনুগত্যের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সভাসমিতি গঠন করে জনমত গঠনে উদ্যোগী হলেন, তেমনি কৌশলী প্রচেষ্টা হিসাবে আচরণবিধি ও সংস্কারের কঠোরতাকে কিছু কিছু শিথিল করতে প্রয়াসী হলেন।

এই ভাবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে পক্ষে ও বিপক্ষে সভাসমিতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠল তার সামগ্রিক চরিত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারেব বিরুদ্ধে দ্বিমুখী অভিযান হয়েছে—একদিকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন, অপর দিকে উগ্রসংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল সংস্কারবাদী হিন্দু ধর্মান্দোলন। অবশ্য দেখা যায়, এই আন্দোলনকল্পে গঠিত সভাসমিতিগুলিতে এক গোষ্ঠী পরিচালিত সভাসমিতিব কোন সদস্য কখনও অন্য গোষ্ঠী পরিচালিত সভাসমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, এমন কি দেখা যায়, রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কোন সদস্য প্রগতিশীল সংস্কারবাদী কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এই ধর্মান্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হল ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজকে পঙ্কিলতামুক্ত কবা। তাই ধর্মান্দোলনের সমসূত্রে সামাজিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করেই এই সব সভাসমিতির উদ্ভব।

॥ খ্রীস্টধর্মান্দোলন ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ নতুন নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও ধর্মপ্রচারকের ধর্মমত প্রচারের তৎপরতায় প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এই প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজশক্তির আধিপত্য বিস্তারের পর অসংখ্য খ্রীস্টান মিশনারীর এ দেশে আগমন এবং ব্যক্তিগত অথবা সংগঠনগত

ভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালান। খ্রীস্টান মিশনারীদের তৎপরতায় বাংলাদেশ ধর্মযুদ্ধের মল্লভূমিতে পরিণত হয়। ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারী সোসাইটির পক্ষে উইলিয়াম কেরি ও ড. জন টমাস ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে সোসাইটি প্রদত্ত সামান্য আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। কিছু দিনের মধ্যেই কেরি ব্যাণ্ডেল ও টমাস কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। এই সময় কেরি নিতান্ত আর্থিক সঙ্কটে পড়েন, কারণ ইংলণ্ডস্থ তাঁর মিশন আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন। অবশেষে কেরি নীলু দত্ত নামে জনৈক বাঙালীর সহায়তায় পুনরায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁর মানিকতলার বাগান বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এই সময় আকস্মিকভাবে কেরি ও টমাসের জীবনে এক সুযোগ এসে গেল এবং তার ফলে তাঁরা যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি পেলেন। মালদহের কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট উডনির আনুকূল্যে প্রথম কেরি ও পরে টমাস ঐ অঞ্চলের মদনবাটী ও মহিপালদীঘি নামক দুটি নীল উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করে নিশ্চিন্ত বসবাসের সুযোগ পেলেন। কেরি ও টমাস ঐ প্রতিষ্ঠানের দেশীয় শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম ধর্মপ্রচার বিষয়ে তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে উডনি মদনবাটীর প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে কলকাতায় চলে আসায় কেরি ব্যক্তিগত উদ্যোগে মদনবাটীর কাছে খিদিরপুর অঞ্চলে একটি নীল চাষের জমি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডস্থ ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারী সোসাইটি ডি. ব্রুনস্‌ডন ডবলিউ. গ্রাণ্ট, জে. ওয়ার্ড, ডবলিউ. মার্শম্যান প্রমুখ চারজন মিশনারীকে বাংলাদেশে পাঠান। এই চারজন মিশনারী ডেনমার্ক অধিকৃত শ্রীরামপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং ওয়ার্ড খিদিরপুরে গিয়ে কেরির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কেরি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে খিদিরপুর পরিত্যাগ করে শ্রীরামপুরে চলে আসেন এবং নবাগত মিশনারীদের সঙ্গে একযোগে ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কেরি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঁচ শত টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন, মার্শম্যান আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ওয়ার্ড ছাপাখানা পরিচালনা করে যথেষ্ট অর্থোপার্জনে লিপ্ত হন। এঁরা সমবেত অর্থে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। খ্রীস্টধর্ম প্রচারকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলবাসীর মধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য এঁরা ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারী সোসাইটির পক্ষে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে কাটোয়া ও দিনাজপুরে; যশোরে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে, মালদহে ১৮০৮, খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে এবং ঢাকায় ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে শাখা স্থাপন করেন। কলকাতার প্রতি এঁদের আগ্রহ বহুদিন ধরেই ছিল কিন্তু দেশীয় জনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিরূপতা সৃষ্টির সম্ভাবনায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় মিশনারীদের খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। তাই কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে

ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারী সোসাইটি যথেষ্ট তৎপর হয়ে ওঠে। শ্রীরামপুরকে প্রধান কর্মকেন্দ্র করে এই সোসাইটির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হত। এই সোসাইটির প্রচারকগণ ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের তত্ত্বসম্বলিত পুস্তিকা ও খ্রীস্টধর্মগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার আরম্ভ করেন।

'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি' ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী অধিকৃত চুঁচুড়াতে খ্রীস্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে ঐ সোসাইটি আর. মে নামক এক প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ধর্মযাজককে চুঁচুড়ায় প্রেরণ করেন এবং তিনি প্রথম কলকাতায় প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এছাড়া বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেও এই সোসাইটি তাঁদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেন।

১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' বাংলাদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে, অবশ্য কলকাতায় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে এই সোসাইটি প্রথম প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নামে একজন উচ্চ সামরিক কর্মচারী বর্ধমানে দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তিনি ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ঐ বিদ্যালয় দুটির পরিচালন ভার সোসাইটির হাতে ন্যস্ত করেন। সেই সময় থেকে বর্ধমান অঞ্চল চার্চ মিশনারী সোসাইটির অন্যতম কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্রমান্বয়ে বর্ধমান থেকে এই সোসাইটির কর্মকেন্দ্র কালনা, কৃষ্ণনগর ও নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

'স্কটিশ মিশন'-এর পক্ষে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ থেকে আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় খ্রীস্টধর্ম প্রচারে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেন। ডাফ শিক্ষাবিস্তারের অন্তরালে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। খ্রীস্টধর্ম প্রচার বিষয়ে অন্যান্য মিশনারীদের সঙ্গে ডাফের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের স্বাতন্ত্র্য ছিল। অন্যান্য খ্রীস্টান মিশনারীরা খ্রীস্টধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা দান ও খ্রীস্টনীতি আদর্শমূলক পুস্তিকা এবং খ্রীস্টধর্মগ্রন্থ অনুবাদ প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। কিন্তু ডাফ চেয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা শিক্ষার্থী বাঙালীর মধ্যে চিন্তা-বিকৃতি ঘটাতে এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা ও ঘৃণা প্রচারের মাধ্যমে স্বধর্মদ্বেষী এক শ্রেণীর বাঙালীর জন্ম দিতে, যারা খ্রীস্টধর্ম প্রচারে দেশীয় এজেন্টের ভূমিকা গ্রহণ করবে:

"He believed that to qualify 'Indian agents' should be the primary object of the Missionaries in Bengal. This could be achieved only by educating the Indians."[৩]

ডাফ এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'জেনারেল অ্যাসেম্বলি' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা

সম্প্রসারণে ডাফ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ডাফের অভিষ্ট সিদ্ধির পক্ষে ডিরোজিও পরোক্ষভাবে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক পদে যোগদান করে মুক্তবুদ্ধি ছাত্রসমাজ গড়ে তোলার জন্য কলেজে ও কলেজের বাইরে পাঠ্যবহির্ভূত বহুবিষয়ের আলোচনা করতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। তাঁর শিক্ষা ও সংস্পর্শে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকতাবোধ ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধার মনোভাব জেগে ওঠে। ডাফ এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে তৎপব হয়ে ওঠেন। ডিরোজিওর একান্ত ভক্ত ও ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডাফের প্রভাবে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ১৭ অক্টোবর খ্রীস্ট ধর্মান্তরিত হন এবং ক্রমশ খ্রীস্টধর্মের একজন বিশিষ্ট দেশীয় প্রবক্তায় পরিণত হয়ে ডাফের অভিপ্রায় পূরণ করেন। কৃষ্ণমোহন প্রথমে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহনকে এবং পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র ও তাঁর জামাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে খ্রীস্টধর্মান্তরিত করেন। কৃষ্ণমোহন চার্চ মিশনারী সোসাইটির সেক্রেটারি আর্কডিকন ড্রিয়ালটির দ্বারা ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে বহুশত হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করান এবং তাঁর সহায়তায় বাংলার বিশিষ্ট সন্তান মধুসূদন দত্ত খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। ডাফ বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতাকে হিন্দুধর্মের বধ্যভূমি নির্বাচন করেন এবং গৃহশত্রু সৃষ্টি করে এই ভাবে সাফল্য অর্জনের পথ প্রস্তুত করেন।

ইংলণ্ডস্থ 'সোসাইটি ফর প্রমোটিং খ্রীস্টান নলেজ'-এর সাহায্য ও সহযোগিতায় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে টমাস ফ্যান্স মিডিল্টনের উদ্যোগে 'ক্যালকাটা ডায়াসেশন কমিটি' স্থাপিত হয়। মিডিল্টনের উদ্যোগেই ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বিশপস্ কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। ডায়াসেশন কমিটি খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাইবেল, খ্রীস্টধর্মমূলক পুস্তিকা, প্রার্থনা পুস্তক এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ শুরু করে। এই কমিটির উদ্যোগে কয়েকটি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। মিডিল্টনের পর বিশপ হিবার এই কমিটির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে বিশপস্ কলেজের সঙ্গে একযোগে 'দি সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব্ দি গস্পেল' কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাজ শুরু করে। এছাড়া স্বল্পায়ু খ্রীস্টধর্ম প্রচার সমিতির মধ্যে 'নেদারল্যাণ্ডস্ মিশনারী সোসাইটি' ও 'ওয়েলেসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি' উল্লেখযোগ্য। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডস্ মিশনারী সোসাইটি চুঁচুড়াতে এ.এফ. ল্যাকরোইক্স নামে এক সুইজারল্যাণ্ডবাসী ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। চুঁচুড়ায় ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির

পক্ষে প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ওয়েলেসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি ১৮৩০ থেকে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতায় কাজ করে।

ইংরেজসহ ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর শাসনতান্ত্রিক অধিকার বিস্তার করলেও দেশবাসীর মনের উপর তখনও বিশেষ প্রভাব স্থাপন করতে পারেনি, তাই মানসিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় খ্রীস্টান সোসাইটি উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে ভীষণভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খ্রীস্টধর্ম প্রচারের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও দেশবাসীর মনে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হতে পারে এই আশংকায় মিশনারীদের কলকাতায় বসবাস ও ধর্মপ্রচারে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন :

> 'সে সময়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এমন ভয়ে ভয়ে বাস করিতেন যে, নিজ রাজ্য মধ্যে খ্রীস্টধর্ম-প্রচারকদিগকে স্বীয় ধর্মপ্রচার কবিবার অধিকার দিলে পাছে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, এই ভয়ে... কলিকাতাতে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিবার অনুমতি দেন নাই।"[৪]

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিলাতের পার্লামেণ্টের কাছে ভারতে শাসনাধিকার সংক্রান্ত আবেদন পুনর্বিকবণেব প্রস্তাব করলে মুখ্যত ক্রীতদাসপ্রথা-নিবাবণকাবী উইলবারফোর্স ও লর্ড ওয়েলেসলির যুক্তিপূর্ণ ওজস্বী বক্তৃতায় বাংলাদেশে মিশনারী কার্যকলাপেব অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তারপর থেকেই শ্রীরামপুরের মিশনারীসহ ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সদ্য-আগত মিশনারীরা বাংলাদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন।

খ্রীস্টান মিশনারীবা বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারেব বিভিন্ন কৌশল ও নীতিহীন পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি তাদের ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম প্রচারপত্রে ঘোষণা কবে :

> "The object of the Society is the evangelize the poor, dark, idolaterous heathen, by sending missionaries."[৫]

যদিও এই প্রচারপত্রে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য নির্দেশিত হয়েছে তথাপি একথা বলা যায় যে, সকল মিশনারী সোসাইটিরই ধর্মপ্রচার ছিল প্রধান লক্ষ্য। আবার এই লক্ষ্য পুরণের জন্য প্রলোভন-প্রতিশ্রুতি-মিথ্যাচার ও বিদ্বেষপ্রচার প্রভৃতি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনেও মিশনারীরা দ্বিধা করেননি। তবে তাঁরা খ্রীস্টধর্ম প্রচারের স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে খ্রীস্টধর্মগ্রন্থ ও নীতি উপদেশ সম্বলিত পুস্তিকা দেশীয় ভাষায় রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই সব প্রচারব্যবস্থা অবলম্বন

করা ছাড়াও হিন্দুধর্ম ও দেবদেবী সম্পর্কে কুৎসা রটনার মতো ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। আলেকজাণ্ডার ডাফের মতো শিক্ষানুরাগী ও সংস্কারক ব্যক্তি সেই ঘৃণ্য পন্থাকে অধিকতর কার্যকর উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন :

"of all the systems of false religion ever fabricated by the perverse ingemity of fallen man, Hinduism is surely the most stupendous. of all systems of false religion it is that which seems to embody the largest amount and variety of semblances and counterfeits of divinely reveled facts and doctrines."[৬]

এইসব প্রচারণা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুর মধ্যে খ্রীস্টধর্ম স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার না পেলেও এদের উপর খ্রীস্টধর্মের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ সময়ে খ্রীস্টান মিশনারীদের দ্বারা ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের এক বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং এই শিক্ষার সূত্রেই নব্য যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের এতাবৎ প্রচলিত বিশ্বাস ও আচারের দুর্গে ফাটল ধরে। বিশ্বাসের অচলায়তনবাসী ব্যক্তিমনে যুক্তিতর্কের দ্বারা সকল কিছুই যাচাই করার মতো অবস্থা সৃষ্টিতে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাছাড়া খ্রীস্টধর্ম প্রচারকগণও হিন্দুর নানাবিধ সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা সম্পর্কে সুপরিকল্পিত ভাবে সমালোচনা ও কটাক্ষপূর্ণ তীব্র মত প্রকাশের দ্বারা শিক্ষিত জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।[৭] ফলে হিন্দুসমাজপতিরা বিচলিত হয়ে আত্মরক্ষার উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। সেই প্রচেষ্টা কোথাও ধর্ম সমাজ ও জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত হল, কোথাও রক্ষণশীলতার দুর্বল দুর্গে আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বনে উৎসাহিত করল। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাঙালীর ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে স্থিতিশীলতা ও নিশ্চিন্ত নীরবতার অবসান ঘোষণা করেছে খ্রীস্টধর্মের সদর্প অভিযান।

॥ ব্রাহ্ম সভাসমিতি ॥

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে মানব-কল্যাণমুখী উদারনৈতিক মনোভাব ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক—যথা, ধর্ম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ক্রমশ বাংলাদেশের নবজীবনবাণীর এক বিশিষ্ট প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ধর্মীয় অনুশাসনে বদ্ধ হিন্দু সমাজকে নতুন যুগালোকের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথম হিন্দুধর্মের অচলায়তনের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হলেন—সে আঘাত ধ্বংসের নয়, সংস্কারের আবর্জনায় রুদ্ধগতি ধর্মচক্রকে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে চলবার পথ সৃষ্টি করে দেবার জন্য।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই সংখ্যার 'খ্রীস্টান অবজারভার' পত্রিকা রামমোহনের প্রচেষ্টার পরিচয় জ্ঞাপন করেছে :

> "He (Rammohun) was animated with a fervent desire to correct them. For this end in view he proposed the establishment of the Brahmo Sabha, for the purpose teaching the doctrine of religion according to the Vedant system—a system strongly deprecating everything of idolatours nature and professing to include the worship of supreme undivided and eaternal God.'[৮]

রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা। তিনি ঘোষণা করলেন, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ও তাদের প্রতিমা পূজা করা প্রকৃত হিন্দুধর্মের বিরোধী। হিন্দুধর্মকে বিশ্বাসের কুহেলিকা ও সংস্কারের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত ক'রে যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে সর্বমানবিক উপলব্ধির উদার বাতায়নে সংস্থাপিত করতে উদ্যোগী হন। তিনি তাঁর ঈশোপনিষদের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় তাই লিখেছেন :

> "I (although born a Brahmin and instructed in my youth in all the principles of the sect), being throughly convinced of the lamentable errors of my countrymen, have been stimulated to employ every means in my power to improve their minds and to lead them to the knowledge of a purer system of morality."

রামমোহন এই উদ্দেশ্যে সর্বধর্মের মানুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে স্বগৃহে 'আত্মীয় সভা' নামে এক বন্ধুসম্মেলন আহ্বান করেন। জনজীবনের নৈতিক মানসিকও আধ্যাত্মিক মানোন্নয়ন ঘটানই ছিল তাঁর এই সভা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য। সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে হিন্দুধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি করা হত। সভার সদস্যদের পৌত্তলিক আচার থেকে দূরে রাখার জন্য কৌশল হিসাবে হিন্দুদের পূজা-পার্বণের দিনে বিশেষভাবে উক্ত সভার বৈঠক আহ্বান করা হত। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের আনীত অভিযোগে সুপ্রীম কোর্টে মামলা চলায় সভার অধিবেশনগুলি ঐ সময় থেকে তাঁর অনুরাগিবৃন্দের গৃহে অনুষ্ঠিত হত। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ৯ই মে তারিখে এই সভার একটি অধিবেশন তাঁর প্রিয়

পর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী পরাজয় স্বীকার করিলেন, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।"[১১]

আত্মীয় সভায় একদিকে যখন শাস্ত্রবিচার ও সতীদাহের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রথা ও অন্যান্য সমাজ-সংস্কারের আলোচনা চলছিল অপরদিকে তখন রামমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তির সমর্থনেই সতীদাহ প্রথার অসারত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। এই গ্রন্থগুলি যথাক্রমে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' এবং ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়ে দ্বিতীয় সম্বাদ'। সভা স্থাপন ও প্রণয়নেই তাঁর উদ্যোগ থেমে থাকে নি, তিনি দেশবাসীকে কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেও উদ্যোগী হন। সেই সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার একাধিক সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হত এবং সেই সংবাদগুলি জনমনে আতঙ্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে পরোক্ষ ভাবে রামমোহনের উদ্যোগকেই সাহায্য করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি সংবাদ উদ্ধৃত হল :

১. "সহমরণ।—সমাচার শুনা গেল যে মোং কাশীতে সহমরণোদ্যতা এক স্ত্রী চিতারোহণ করিয়া আপন পুত্রাদির স্নেহ প্রযুক্ত কিম্বা অগ্নিজ্বালা অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত চিতা হইতে গঙ্গাতে পড়িল তাহাতে তাহার জ্ঞাতি ও কুটুম্ব লোকেরা তাহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার চিতার নিকটে আনিল কিন্তু সে স্ত্রী তখন সহমরণে নিতান্ত অসম্মতা হইল। ইহা দেখিয়া চৌকিদারেরা তাহাকে ঘরে পঁহুছাইল।"

[সমাচার দর্পণ, ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ ৩০ জানুয়ারি]

২. "সহমরণ।—কতকদিন হইল মোং চন্দন নগরে এক বরকন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া পত্রাদি হইয়াছিল বিবাহ মাসেক দুই মাস পরে হইবে এমত কল্প হইয়া আয়োজন হইতেছিল দৈবাৎ ঐ বরের পীড়া হইয়া মৃত্যু হইলে পরে ঐ কন্যা বরের সহিত সহগমন করিল তাহারদের বিবাহার্থে যে যে সামগ্রী প্রস্তুতা হইয়াছিল সে সামগ্রী কতক তাহারদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে ও কতক শ্রাদ্ধতে ব্যয় হইল।"

[সমাচার দর্পণ, ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ ৬ ফেব্রুয়ারি]

হিন্দু সমাজের বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ও পৌত্তলিক আচারের বিরুদ্ধে রামমোহন আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদী পৌত্তলিকতা-বিরোধী যে ধর্মোপাসনায় একটি গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন এবং যার প্রেরণায় তিনি নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার

বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই প্রচেষ্টাকে আরও নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার জন্য ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট ফিরিঙ্গী রামকমল বসুর গৃহে 'ব্রাহ্মসমাজ' বা 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম ব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা তা নিয়ে মতভেদ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত নতুন উপাসনা-গৃহ পরিচালনার জন্য যে ট্রাস্ট ডীডের দ্বারা ন্যাসরক্ষক সমিতির উপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় তাতে কোথাও ব্রাহ্মসমাজ নাম উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু ঐ ডীডের 'কোবালা'তে ব্রাহ্মসমাজ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাম-বিভ্রাটের কারণ ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা দুটির প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে নির্দেশ করা যায় :

ক. এক্ষণে কলিকাতা মধ্যে খ্রীস্টীয়ান সভা ও ধর্ম্ম ব্রহ্মসভা এই তিন সভার তিন মত প্রচলিত দেখিতেছি....। ॥ জ্ঞানান্বেষণ ॥

খ. কলিকাতা মহানগরীতেও কতকগুলি ভদ্রলোক ধর্ম্ম সভা ও ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া দলাদলিতে নিযুক্ত আছেন। ॥ সমাচার দর্পণ ॥

ধর্মসভার নাম-সাদৃশ্যেই 'ব্রহ্মসভা' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে মনে করা অসঙ্গত হবে না, এই সভার নাম 'ব্রাহ্ম সমাজ' হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। সপ্তাহে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সমাজের উপাসনা অনুষ্ঠিত হত। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপাসনার দিন উপনিষৎ পাঠ ও তার ব্যাখ্যা করতেন এবং বেদ পাঠ করতেন দু'জন তেলুগু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশ প্রদান এবং ব্রহ্ম-উপাসনা ও পৌত্তলিক আচারের অসারত্ব প্রতিপাদক সঙ্গীত পরিবেশনের পর সমাজের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এই সমাজের মনোনীত সম্পাদক হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

সমাজ স্থাপন সম্পর্কে দুটি অভিমত প্রচলিত আছে। একটি অভিমত হল 'কলিকাতা ইউনিট্যারিয়ান কমিটি'র আবেদন জনমানসে হ্রাস পেতে থাকলে কমিটির সম্পাদক ও রামমোহনের সুহৃদ্ অ্যাডামের অনুরোধে উক্ত সমাজ স্থাপিত হয় এবং অপর অভিমত হল রামমোহন একদিন কলিকাতা ইউনিট্যারিয়ান কমিটির অধিবেশন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁর দুই তরুণ সঙ্গী তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ স্থাপন বিষয়ে তিনি কাশীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রমুখের সঙ্গে প্রথম আলোচনা করেছিলেন।

রামমোহনের এই সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারমুক্ত ধর্মের উদার বাতায়নে সম্মিলিত করা।

ব্রহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডীডই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল :

> "And that no graven image, statue or sculpture, carving, painting, picture. portrait or the likeness of anything shall be admitted within........, and that no sacrifice, offering, or oblation of any kind or thing, shall ever be permitted therein ; and that no animal or living creature shall ... be deprived of life, either for religious purposes or for food ;
>
> And that no sermon, preaching, discourse, prayer or hymn be believed, made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the author and preserver of the universe, to the promotion charity, piety, benevolence, virtue, and the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds."

এই ট্রাস্ট ডীডের দর্পণেই রামমোহনের ধর্মমত সর্বাধিক স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর আপন মত ও বিশ্বাসের উদার বাতায়নে যাতে সকল শ্রেণী ও ধর্মের মানুষ মিলিত হয়ে তাকে অনির্বাণ দীপশিখার মতো প্রজ্জলিত রাখতে পারে তার জন্য তিনি এই স্থায়ী সমাজ-ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থায়ী সমাজ-ভবন নির্মাণের পিছনে যে ঘটনাটি তাঁকে সর্বাধিক উৎসাহিত করেছিল তা' তাঁর অক্লান্ত ও জীবনপণ সংগ্রামের সাফল্য—সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ। জ্ঞানালোকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারান্ধতা দূরীভূত করার জন্য যে বিশ্বাস নিয়ে তিনি ইতিপূর্বে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে নিজ ব্যয়ে হেদুয়া অঞ্চলে 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' স্থাপন করেছিলেন সেই বিশ্বাসবোধে উজ্জীবিত হয়েই ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর বিলাত যাত্রার পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ১৩ জুলাই পাদ্রী ডফ সাহেবকে ইংরেজী স্কুল স্থাপনের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।

রামমোহনের বিলাত যাত্রার পর ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার অর্পিত হয় দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর। দ্বারকানাথ অধিকাংশ সময়েই নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই মুখ্যতঃ প্রথম আচার্য হিসাবে সমাজের কার্য পরিচালনা করতেন। ১৭৬৫ শকের পৌষ মাসে (১৮৪৩ খ্রী) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুড়িজন সঙ্গীসহ প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মসমাজের

পরিচালনভার গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যেন দেবেন্দ্রনাথের উপর সমাজের দায়িত্বভার অর্পণ করার জন্যই বেঁচে ছিলেন, কারণ ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজভুক্তির একটি পূর্ব সূত্র আছে। ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন রবিবার (১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ অক্টোবর) বাইশ বৎসরের যুবক দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে স্বগৃহ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে মাত্র দশ জন সদস্য নিয়ে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানোন্নতিসাধন, তথ্যানুসন্ধান, শাস্ত্রালোচনা, রামমোহন রায়ের গবেষণার উপর নির্ভর করে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান, বিদ্যালয় সংস্থাপন ইত্যাদি।[১২] ১৭৬১ শকের ৩ কার্তিকে অনুষ্ঠিত সভায় তত্ত্বরঞ্জিনী সভার নাম পরিবর্তিত হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' হয়। এই সভা প্রথম স্থাপিত হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে, তারপর ক্রমান্বয়ে শিমুলিয়াস্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, হেদুয়ার দক্ষিণস্থ রামপ্রসাদ রায়ের বাড়িতে এবং সর্বশেষ ব্রাহ্ম সমাজ-গৃহে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে রমানাথ ঠাকুরের গৃহে সভার অধিবেশন হত। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে মরণোন্মুখ ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবন দান করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> "যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার (ব্রাহ্ম সমাজের) পরিণয় হইল তখন তাহার প্রাণসঞ্চার হইল।"[১৩]

নীতি ও আদর্শগত ভাবে উভয় সভার মধ্যে একটি দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য থাকায় উভয়ের মিলনে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় নি, কারণ দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজেরই সম্প্রসারিত রূপ। তত্ত্ববোধিনী সভার লক্ষ্য সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের অভিমত এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।"[১৪]

এই অভিমত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্ববোধিনী সভা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ; কিন্তু এর কর্মক্ষেত্র সামাজিক মঙ্গলকর্মে এতদূর সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং সমকালীন বাংলার বিদ্বৎসমাজকে এমন গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে এই সভাকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার একটি সর্বার্থসাধক সভার মর্যাদা দেওয়া যায়। এই সভার ব্যয় নির্বাহ হত প্রত্যেক সদস্যের নিজ নিজ আয়ের চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ টাকা প্রতি এক পয়সা অনুদানের সাহায্যে।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুন এই সভার উদ্যোগে শিমলায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে ১৭৬১ শকের ১৮ অগ্রহায়ণ তারিখে কবি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন এবং তাঁর প্রস্তাবনায় ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ১৭৬১ শকের ১১ পৌষ (১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর) অক্ষয়কুমার দত্ত এই সভার সভ্যপদ লাভ করেন। অক্ষয়কুমার দত্তকে মাসিক আট টাকা বেতনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ১৭৬১ শকের ৪ শ্রাবণ থেকে অক্ষয়কুমারের বেতন হয় দশ টাকা এবং পরে তিনি পাঠশালার তৃতীয় শিক্ষক পদে উন্নীত হলে তাঁর বেতন হয় চৌদ্দ টাকা। অক্ষয়কুমার এই পাঠশালায় বর্ণমালা, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলকাতা থেকে বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হয় এবং অক্ষয়কুমারকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার ঐ পদ গ্রহণে অসম্মতি জানালে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশকে তিরিশ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৭৬৭ শকে প্রকাশিত এই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে সাম্বৎসরিক বিবরণ থেকে জানা যায়:

> "এই পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্রসকল প্রচারিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক,.... ।"[১৫]

তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মসূচীর অন্যতম হল বেদের চর্চা, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ও পর্যালোচনা করা। তাই বিদ্যালয় সংগঠিত করার সঙ্গে এই লক্ষ্যের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সভার ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণে এই উদ্দেশ্য রূপায়ণের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, "এতদ্দেশে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনের চালনার নিমিত্তে ঐ ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া চারিজন ছাত্রকে উপনিষৎ অধ্যাপন করিতে লাগিলেন....।" এই কর্মসূচীর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য (পরে বিদ্যাবাগীশ) নামে একটি ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে এবং ১৭৬৭ শকে আরও তিনজন মনোনীত ছাত্রকে কাশীধামে পাঠান হয়। ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণে এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়; "ইহাতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা আর তিন জন ছাত্র ১৭৬৭ শকে (১৮৪৫ খ্রী) কাশীধামে গমন করিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। তদবধি চারি জন ছাত্রের চারি প্রকার বেদ ও তাহার ভাষ্য অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতেছে।" দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যেই এই পাঠশালার অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ হত। কার-ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অনটন ঘটায় ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়।

তত্ত্ববোধিনী সভার আর একটি গৌরবময় কীর্তি হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ।

১৭৬৫ শকের সভার সাম্বৎসরিক বিবরণ থেকে জানা যায় ; "কোন দেশহিতৈষী মহাত্মা ১৭৬৫ শকে সমুদয় অক্ষরের সহিত এক মুদ্রাযন্ত্র এ সভায় দান করিলেন তদবধি এই সভার উন্নতির সূত্র হইল। নিয়মিত রূপে প্রতিমাসে এক পত্রিকা প্রকাশ করায় তত্ত্বোধিনী সভা সপ্রতিজ্ঞ হইলেন।" রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র ও তৎকালীন তত্ত্বোধিনী সভার সভাপতি রমাপ্রসাদ রায় এই মুদ্রাযন্ত্র দান করেন। পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচনের যোগ্যতা পরিমাপক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। প্রবন্ধের বিষয় নির্দ্ধারিত হয় 'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ'। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং অক্ষয় দত্তের প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে তিরিশ টাকা বেতনে সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। পদটিকে পত্রিকা-সম্পাদক না বলে 'গ্রন্থ সম্পাদকতা' বলে অভিহিত করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সম্পাদনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক সোসাইটি অনুসৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী 'পেপার কমিটি' নামে পাঁচ জন সভ্যের (গ্রন্থাধ্যক্ষ) দ্বারা একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করেন। কোন সভ্য বা গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করলে আর একজন মনোনীত হতেন। গ্রন্থাধ্যক্ষগণের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুর সূত্রে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয় এবং ১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর গ্রন্থাধ্যক্ষমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশ কালে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট, ক্রমশ এই পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭০ শকে চব্বিশ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়। ১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণে পত্রিকার প্রকাশিতব্য বিষয় নির্দেশিত হয়েছে ; "শ্রুতিসিদ্ধ পরব্রহ্মের লক্ষণ এবং সংস্কৃতি বৃত্তি ও বঙ্গভাষার অনুবাদ সহিত উপনিষৎ ও যথাসাধ্য যুক্তিদ্বারা তাহা সংস্থাপন এবং পরমেশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা ও প্রচার, মুক্তির ক্রম ও লক্ষণ, নীতি ও ধর্মের অনুষ্ঠান, কার্য্য দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞাপন এবং ঈশ্বরের কার্য্য দর্শাইয়া তাঁহার শক্তির আলোচনার নিয়ম জন্য শারীরিক ও মানসিক বিষয়ক বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত প্রকাশিতব্য স্থির করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।" কিন্তু এই নির্দিষ্ট বিষয়সীমা অতিক্রম করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ক্রমে বহু বিষয়সঞ্চারী হয়ে বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনসমাদৃত একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় পরিণত হয়। তত্ত্বোধিনী পত্রিকার কলেবরে স্থান পেতে থাকে স্ত্রীশিক্ষা ও

স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ সমর্থন ও বহুবিবাহের বিরোধিতা, খ্রীস্টধর্ম প্রচারের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধতা, শিক্ষা সম্প্রসারণ, বাংলা ভাষার উন্নতি, ব্যভিচার ও মদ্যপান নিবারণ, জমিদারী ব্যবস্থার কুফল, নীলকরদের অত্যাচার, দেশবাসীর অধিকার প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চমানের প্রবন্ধ।

তত্ত্ববোধিনী সভা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে কেবল মুখ্য ভূমিকাই নেয়নি, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমীকরণ ঘটিয়ে একদিকে সংকীর্ণ জীবন-চেতনার মুক্তি ঘোষণা করেছে, অপর দিকে উগ্র পাশ্চাত্য-প্রীতির যুক্তিহীন প্রাবল্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সংকীর্ণতা মুক্তির অর্থ যে স্বেচ্ছাচারিতা নয়, তা যে সংযমের দ্বারা শাসিত এবং কুসংস্কার যে প্রকৃত শাস্ত্রাচরণ নয়, তত্ত্ববোধিনী সভা সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে। তত্ত্ববোধিনী সভা খ্রীস্টধর্ম প্রচারের অব্যাহত গতিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কুসংস্কারের নির্মোকে আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করেনি, পক্ষান্তরে সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মমতের বাতায়নে অবাধ মুক্তির সুযোগ করে দেয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভাকে সর্বার্থসাধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্ম পরিচালনা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। তাই এই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচরণ বা শৈথিল্যকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ১৭৭৫ শকে রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্মমূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশে গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা আপত্তি করায় তিনি অত্যন্ত কঠোর অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৭৭৫ শকের ২৬ ফাল্গুন রাজনারায়ণ বসুর প্রতি একটি পত্রে তাঁর সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে :

"আশ্চর্য এই যে, তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষরা ইহা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলি নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা হইবে না।"[১৬]

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কেও এই সময়ে নানা কারণে ক্রমশ হতাশ বোধ করতে থাকেন। ১৭৭৫ শকে তিনি নিজের বাড়িতে অক্ষয় দত্তকে সম্পাদক মনোনীত করে নিজের সভাপতিত্বে 'আত্মীয় সভা' (রামমোহন প্রতিষ্ঠিত নয়) নামে ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনার জন্য এক সভা স্থাপন করেন। এই সভায় প্রথমে সংস্কৃতে উপাসনা-কার্যের পর বাংলায় তার ব্যাখ্যার রীতি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু অক্ষয় দত্ত ও তাঁর অনুচরবর্গ বাংলায় উপাসনা-বিধি প্রবর্তনের জন্য দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের যুক্তির জোরে সেই বিরোধিতা কার্যকরী হয় নি। কিন্তু বিরোধের এই সূত্রপাত ক্রমশ আরও জটিল আকার ধারণ করে। এই সভার একটি

অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান' বলে অভিহিত করায় অক্ষয়কুমার তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে 'ঈশ্বর বিচিত্র শক্তিমান' বলে অভিহিত করার দাবী জানান। এই সব বিক্ষিপ্ত ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ গভীর ভাবে বিচলিত হয়ে ওঠেন। এছাড়াও অন্যান্য কারণে তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষগণের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের ক্ষেত্র ক্রমশই সম্প্রসারিত হতে লাগল। অবশেষে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে (১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্পাদকতা কালে তত্ত্ববোধিনী সভার সর্বশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার অবর্তমানে ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর 'অধ্যক্ষ-সভা' গঠন করেন। এই সভার সভাপতি হন রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় উত্তম অধীতি কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময় বাগ্মিতা ব্রাহ্মধর্মান্দোলনকে অভূতপূর্ব শক্তি দান করে। ইতিপূর্বে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ মে তারিখে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় ও কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে নিয়মিত বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় তৎকালীন যুব সম্প্রদায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই যুবকদের মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত, আনন্দমোহন বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, গিরিশচন্দ্র সেন উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে এক নতুন প্রাণবন্যা দেখা দিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিষয়কর্ম থেকে অবসর নিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বৎসরই কেশবচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট অনুরাগীদের নিয়ে নিজ গৃহে সর্বপ্রকার ধর্মালোচনা ও সামাজিক বিষয়ে কথাবার্তার জন্য 'সঙ্গত সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। এইভাবে নিজের অজ্ঞাতেই কেশবচন্দ্র নিজস্ব একটি গোষ্ঠীর জন্ম দিলেন। সঙ্গত সভার মুখপত্র হিসাবে 'ধর্ম্মসাধন' নামে ধর্মালোচনামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। সভার যুবক সভ্যগণ ব্রাহ্ম ধর্মের নীতি ও আদর্শকে সর্বতোভাবে আচরণ করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য মিলিত হতেন। এই সভা ব্রাহ্মসমাজের মূল লক্ষ্যের পরিপূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম আলোচনা ও ব্রাহ্মধর্মান্দোলনকে সফল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সভার সভ্যরা কোন কোন সাপ্তাহিক অধিবেশনে রাত্রি ৯টা থেকে রাত্রি ২টা পর্যন্ত আলোচনা করতেন। সভার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মদের কাজ ও কথার সমন্বয় সাধন, জাতিভেদ উচ্ছেদ ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলন করা।

কেশবচন্দ্রের উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই সময় সমাজ নূতন নূতন কর্মসূচী প্রণয়নে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে; ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সমাজ-সেবা যুক্ত হয়ে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ-সাধনে সমাজের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। ১৮৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কেশবচন্দ্র ও তাঁর যুবকর্মিদল ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে অর্থ বস্ত্র সংগ্রহ করে যথাস্থানে পাঠান। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৪ মার্চ দেবেন্দ্রনাথ সমাজের উপাসনা অন্তে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যার্থে দেশবাসীর কাছে এক মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন জানান। ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগ মহামারী আকার ধারণ করলে কেশবচন্দ্র সদলবলে উপস্থিত হয়ে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ৩ অক্টোবর 'ব্যবস্থাদর্পণ'-প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্মা সরকারের সভাপতিত্বে কেশবচন্দ্রের আহ্বানে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শিক্ষার প্রসারকল্পে একটি সভা আহূত হয়। এই সভায় কেশবচন্দ্র শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন এবং এই আদর্শের অনুকূলে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় 'ক্যালকাটা কলেজ' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় নবীন ব্রাহ্মদলের এক মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাঁরা সর্ববিধ আলোচনার জন্য ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মবন্ধু সভার সভ্যেরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও নারীজাতির উন্নতিবিধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা নিজ নিজ গৃহে পত্নী বা ভগিনীকে শিক্ষাদানের মধ্যে প্রথমে এই কর্মসূচীর সূচনা করেন, ক্রমশঃ বৃহত্তরভাবে রূপদানের জন্য 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শিক্ষার্থিনীরা বিদ্যালয়ে না গিয়ে গৃহ-শিক্ষক দ্বারাই সুশিক্ষিত হতে পারতেন। তবে তাঁদের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে বছরে চারবার এই সভায় বিবরণ পেশ করা একটি অন্যতম শর্ত হিসাবে গৃহীত হয় এবং সভা বছরে দু'বার ছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করে সেই মতো পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য 'বামাবোধিনী সভা'র উপর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। উমেশচন্দ্র দত্ত সিমুলিয়াস্থ ১৬ রঘুনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটস্থ বামাবোধিনী কার্যালয় থেকে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে (১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস) মহিলাদের পাঠোপযোগী বিষয়সম্বলিত একখানি মাসিক পত্রিকা ('বামাবোধিনী পত্রিকা') প্রকাশ শুরু করেন। কিন্তু কার্যোপলক্ষে উমেশচন্দ্র মফঃস্বলে চলে যেতে বাধ্য হলে ক্ষেত্রমোহন দত্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বসন্তকুমার ঘোষ প্রমুখ ব্রাহ্ম যুবকগণের দ্বারা ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী সভা' ঐ পত্রিকার প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ইতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে 'কলিকাতা' শব্দটি যুক্ত হয়। কেশবচন্দ্রের প্রশংসনীয় উদ্যোগের ফলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কর্মক্ষেত্র নানা দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে সমাজের আচার্যপদে অভিষিক্ত করেন। কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারোদ্দেশে মাদ্রাজ, পুণা, বোম্বাই, কালিকট প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। এই বছরেই তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা ও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আদর্শে ১৭৮৬ শকের কার্তিক মাসে (১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে) 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের যেমন সাফল্য সূচিত হয়েছিল তেমনি এই সাফল্যের গৌরব তাঁকে ক্রমশই সমাজের প্রচলিত নীতি-নিয়ম সংস্কারের নেশায় মাতিয়ে তুলেছিল। রামমোহন-প্রদর্শিত পথকে দেবেন্দ্রনাথ যেমন নতুন তাৎপর্য দান করে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেন, কেশবচন্দ্র তেমনি দেবেন্দ্রনাথ অনুসৃত পথকে আরও প্রগতিশীল করে তোলার জন্য বিতর্ক-বিরোধ ও পরিশেষে বিচ্ছেদের পথ গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্বের দাবী অস্বীকার করে, পৌত্তলিকতা বর্জন করে উপনয়ন , বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি হিন্দু অনুষ্ঠানগুলির প্রচলন করেন। তিনি জাতিভেদ অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র ব্যতীত অব্রাহ্মণকে সমাজের বেদী থেকে উপাসনার অধিকার দেননি। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামিবৃন্দ প্রথম দাবী করলেন যে, উপবীতধারী কোন ব্রাহ্মণ আচার্য উপাসনা বেদীতে বসলে তাঁরা সেই উপসনায় যোগদান করবেন না। দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রস্তাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা সমাধানের জন্য উপবীতত্যাগী উপাচার্য নিয়োগে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু নবীন ব্রাহ্মের দল যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনে অগ্রসর হলেন তখন তিনি এই মনোভাবের ক্রমপরিণতি চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তথাপি তিনি আপস-রফার জন্য উপবীতধারী ব্রাহ্মণ উপাসনাকারীর পাশে জাতিভেদ-বিরোধী প্রগতিশীল ব্যক্তিদেরও জাতি-নির্বিশেষে স্থান করে দিলেন। কিন্তু নবীন ব্রাহ্মের দল এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হলেন না এবং প্রাচীন-পন্থীরাও এই নমনীয় মনোভাবে অসন্তুষ্ট হলেন। নবীন দল এর পর দাবী করলেন সাধারণ উপসনার দিন ব্যতিরেকে তাঁদের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটি স্বতন্ত্র দিন নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামিবৃন্দ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্রের আহ্বানে উমানাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে ৩০০ নং লোয়ার চিৎপুর রোডের একটি গৃহে এই নবীন ব্রাহ্মদের একটি সভা হয় এবং এই

সভায় কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত হয়। 'ভারতবর্ষীয়' শব্দটি সমাজের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যে কেশবচন্দ্রের উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা ও মহত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত ঐক্য এবং সামগ্রিক চেতনা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সর্বধর্মের মিলন-মন্দির হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সভ্যদের আর্থিক সাহায্যে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ২৪ জানুয়ারি মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে স্থায়ী সমাজ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ২১ আগস্ট এই নতুন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। এই সমাজ অধ্যক্ষসভা রহিত করে এবং সমাজের পরিচালনভার কয়েক জন সভ্যের উপর ন্যস্ত করে। সমাজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক হন যথাক্রমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ চক্রবর্তী এবং কেশবচন্দ্র সেন তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই সময় ১৭৯০ শকের মাঘ সংখ্যা (১৮৬৯ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 'কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হয় এবং ঐ বৎসর চৈত্র সংখ্যায় 'কলিকাতা' শব্দটি বর্জিত হয়ে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামটি ব্যবহৃত হয়। সমাজের আদর্শ প্রচারের জন্য নতুন সভাপতি রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৩ শকে মাঘ মাসে (১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ) 'ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ঘোষণা করেন। এই সমাজের নতুন সম্পাদক হন নবগোপাল মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রথম দিকে দেবেন্দ্রপন্থীদের সঙ্গে কিছুকাল একযোগে কাজ করেছিল। নবগঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে দেবেন্দ্রনাথকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন কল্পে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কুমারী মেরী কার্পেন্টারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় উভয় দলই যোগদান করে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তার লক্ষ্য ও আদর্শের অনুকূলে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত শ্লোক-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, আবেস্তা, মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী প্রভৃতি ধর্মের সার সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ধর্মের ভিত্তিতে জনশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও সংবাদপত্র প্রচারেও এই সমাজ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের বহু পূর্ব থেকেই কেশবচন্দ্র বিভিন্ন স্থানের একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন এবং ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ধর্মীয় উদারতা দেখান। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণধন ঘোষ প্রমুখ পাঁচজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্র লণ্ডনে উপস্থিত হন। সেখানে সাত মাস

অবস্থান কালে তিনি ম্যাক্সমুলার, জন স্টুয়ার্ট মিল, গ্লাডস্টোন, রানী ভিক্টোরিয়া প্রমুখের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। বিদেশে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি তাঁর উদার ধর্মমত ব্যাখ্যা করেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২০ অক্টোবর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি সমাজকল্যাণকর কাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর ২ নভেম্বর তাঁর উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছাড়াও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশ-বিদেশের মানুষকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করেন। ধর্মান্দোলনের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের কোন যোগ ছিল না, তবে সভার পরিচালন-ভার কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের উপর ন্যস্ত ছিল। কেশবচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল শ্রেণী-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে দেশী-বিদেশীদের মিলনকেন্দ্ররূপে কলেজ স্ট্রীটে 'অ্যালবার্ট হল' বা 'অ্যালাবার্ট ইনস্টিটিউশন' স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'ব্রাহ্ম বিবাহ বিল' নামে সর্বপ্রকার ধর্মীয় নির্দেশমুক্ত এক উদার বিবাহনীতি আইনগত সমর্থন লাভ করে। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিতায় এই আইন 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে পরিচিত হয়।

এই সময় কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা গেল এবং তার পরিণতিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর ধর্ম-চেতনায় খ্রীস্টধর্মের অনুতাপ ও হৃদয় পরিবর্তনে বিশ্বাস এবং একই সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভক্তি-ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি স্থান পাওয়ায় অনুগামীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে পৌত্তলিক মতে কুচবিহারের অব্রাহ্ম যুবক-মহারাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কন্যার নতুন আইন-বিরুদ্ধ বিবাহ তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মতবিরোধকে বিচ্ছেদে পরিণত করল। ফলে তাঁর বিশিষ্ট অনুগামী আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ একটি স্বতন্ত্র সমাজগঠনে উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মে আনন্দমোহন বসুর পৌরোহিত্যে টাউন হলে একটি সভা আহূত হয়। সভায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মরা ছাড়াও আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন এবং এই সভায় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই নব প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সভাপতি হন আনন্দমোহন বসু এবং সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদক হন যথাক্রমে শিবচন্দ্র দেব ও উমেশচন্দ্র দত্ত। দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ও লোকসেবার আদর্শ প্রচারের জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রমুখ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে শুরু করেন। এই সময়ে সমাজের স্থায়ী প্রার্থনা-মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং ১৮৭৯

খ্রীস্টাব্দের মাঘোৎসবের সময় শিবচন্দ্র দেব বর্তমান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১৬ জ্যৈষ্ঠ সমাজের মুখপত্র হিসাবে 'তত্ত্বকৌমুদী নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে এবং কিছুকাল পূর্ব থেকে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২১ মার্চ থেকে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ। সমাজের উদ্যোগে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি 'সিটি স্কুল' এবং ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি 'সিটি কলেজ' স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার জন্য আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উদ্যোগী হয়ে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। অবশ্য ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ১ আগস্ট বিদ্যালয়টি বেথুন স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষা ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১ আগস্ট 'বঙ্গ মহিলাসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহিলা সমাজের সভাপতি ও সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রাধারানী লাহিড়ী ও আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসু। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মে সমাজের উদ্যোগে 'ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজমন্দির-প্রাঙ্গণে কেশবচন্দ্রের ভারতাশ্রমের অনুরূপ 'সাধনাশ্রম' স্থাপিত হয়। এই আশ্রমের ত্যাগপূত জীবনাচরণে অঙ্গীকারবদ্ধ আচার্য ও কর্মীরা ধর্মালোচনার সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা ও ধর্মমূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও তাদের নৈতিক মানোন্নয়নে সমাজকর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বরাহনগর অঞ্চলে সমাজের প্রবীণ নেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় শ্রমজীবী মানুষের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানে উদ্যোগ গ্রহণ, আসামের পার্বত্য অঞ্চলে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে 'ব্রাহ্ম মিশন' প্রতিষ্ঠা, বাঁকিপুরে গুরুদাস চক্রবর্তীর মাদক-বর্জন আন্দোলন প্রভৃতি এই সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানের দৃষ্টান্ত।

কেশবচন্দ্রের অনুগামিবৃন্দ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগের পর কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্ম সম্পর্কে পরিবর্তিত চিন্তা রূপায়ণে উদ্যোগী হন। তিনি ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি 'নববিধান' নামকরণের দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের রূপান্তর ঘটান। নববিধান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্মমতের এক উদার ক্ষেত্র রচনা করেন,—সেখানে পৌত্তলিক আচার-আচরণ, শাক্ত-বৈষ্ণব ও রহস্যবাদী-সাধনার সঙ্গে খ্রীস্ট ও ইসলাম ধর্মের উচ্চ আদর্শ ও নীতিগুলিকে সমন্বিত করে সংকীর্ণ ধর্ম চেতনার অবসান ঘটাতে উদ্যোগী হলেন। রাজনারায়ণ বসুর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের একটি পত্রে কেশবচন্দ্রের ধর্মাচরণের বিচিত্র

রূপটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে :

"তিনি কথনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কথনো কথনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কথনো আবার হোম করিতেছেন, কথনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডন নদীতে জান-দি-বেপ্টাইস্টের দ্বারা বেপটাইস্ট হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে মুশা, যীশা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে ?"[১৭]

বিশিষ্ট ধর্মগুলির শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচারের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের উপর বেদ-বেদান্ত-গীতাদির ব্যাখ্যা, গিরিশচন্দ্র সেনের উপর কোরানের অনুবাদ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপর খ্রীস্ট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ভার অর্পণ করেন। কেশবচন্দ্রের এই ধর্মাদর্শ বিশেষ আবেদন সৃষ্টি না করতে পারলেও তাঁর বিরুদ্ধবাদী শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক ত্রিশ বৎসব পরে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে তা প্রশংসিত হয়, ইতিমধ্যে অবশ্য ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল এবং নববিধানের আবেদনও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়।

কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে যখন ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন ব্যাপক ভাবে চলছিল তখন পূর্ববঙ্গও এবিষয়ে বিশেষ পশ্চাৎপদ ছিল না। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত ঘটান ব্রজসুন্দর মিত্র এবং কৌলীন্য প্রথা-বিরোধী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্রজসুন্দর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে নিজের গৃহে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এই আন্দোলন ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখের তৎপরতায় বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনকল্পে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ এক মাস কাল সেখানে অবস্থান করে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে যে একাধিক বক্তৃতা দেন তাতে সমগ্র পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই সময়ে যুবকগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে আগ্রহসৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃত্রয়—নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'বাল্য-বিবাহ নিবারণী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ সভার সভাপতি হন। সভার উদ্যোগে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক হন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্মান্দোলন কেবল নিছক. ধর্মসাধনার একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয় সামাজিক জীবনও এই ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হয়েছিল। তাই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে যেমন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন করেন, তেমনি সমগ্র সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সুফল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে সকলকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও সাবলম্বী হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সে যুগে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তিও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে লাভ করেছে উদার ধর্মনীতির শিক্ষা; ধর্মীয়, সামাজিক সর্বপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পেয়েছে বিশ্বস্ত সঙ্গী ; আবার স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে সচেতন মানুষ দেশভক্তি ও জাত্যভিমানের দীক্ষা পেয়েছে এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে। বহু যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ঘূর্ণাবর্তে উদ্‌ভ্রান্ত-যৌবনের উন্মাদনাকে প্রশমিত করেছে ব্রাহ্মদের মার্জিত রুচি ও চরিত্রের সংস্পর্শে এসে।

॥ হিন্দুধর্মান্দোলন ॥

বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ইতিহাস ব্যাপক ও সুপ্রাচীন। বাঙালী ধ্যানে-জ্ঞানে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এমনকি প্রাত্যহিক অশনে-বসনে ধর্মের অনুশাসনকেই অনুসরণ করে এসেছে। আবার তুর্কী আক্রমণের পর থেকে দেখা যায়, এক প্রকার ধর্মের অভিভাবকত্বেই বাঙালীর আত্মবিশ্বাসহীন জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাই বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উপর অপর ধর্মের আঘাত করার সম্ভাবনা যখনই দেখা গেছে তখনই আচারের নির্মোকে সমাজের আত্মগোপন একটা কৌশল হিসাবে অবলম্বিত হয়েছে। বৌদ্ধযুগে বিপন্ন হিন্দুসমাজ চাতুর্বর্ণকে রক্ষা করার জন্য যেমন স্মৃতি ও পুরাণের অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরেছিল তেমনি মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলমান প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য স্মার্ত রঘুনন্দন নব্য-স্মৃতির প্রাচীর গঠন করেছেন। দেখা গেল, পরধর্মের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য আচারসর্বস্ব স্বধর্মের নিধনকে শ্রেয়বোধে আলিঙ্গন করে বাঙালী পরিণামে চরম মূঢ়তারই কবলিত হয়েছে। এই মূঢ়তাকে জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে বাঙালী হিন্দুসমাজ নানা ভাবে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রঘুনন্দন—প্রবর্তিত আচার ও অনুশাসন ধীরে ধীরে বাংলাদেশে হিন্দুজাতির অগ্রগতির পথে জগদ্দল পাথরের মতো দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে। ধর্মের বেনামীতে সেগুলি সামাজিক অন্যায়-অনাচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। যার প্রয়োজন ছিল সমাজকে রক্ষা করার জন্য, তা ব্যবহৃত হতে লাগল সামাজিক নিষ্পেষণ-যন্ত্র হিসাবে। প্রভুত্বকামী হিন্দু-দলপতিরা সমাজ-শাসনের নামে ব্যক্তি-স্বার্থ রক্ষায় ধর্মের অপব্যবহারে তৎপর হয়ে উঠলেন। ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্যপরায়ণতা কোথাও কোথাও ধর্মের ছদ্মাবরণে

আত্মপ্রকাশ করল। এই ভাবে স্বার্থান্ধ মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হল কঠোর ধর্মীয় নীতি-নিয়ম। সমগ্র সমাজ সেই নীতি-নিয়মের অত্যাচার সহ্য করেও কলুষিত ধর্ম সম্পর্কে অহেতুক দুর্বলতা পোষণ করেছে। সোনার কৌটায় রক্ষিত রূপকথার রাক্ষসের প্রাণ-ভ্রমরার মতো ধর্মকে তারা সদাসতর্ক ভাবে রক্ষা করেছে এবং সেখানে কোন আঘাত লাগলেই সমগ্র সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতক এল এই অন্ধ তামসিকতা থেকে জাগরণের বাণী নিয়ে। বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তির প্রবল জোয়ারে প্রভুত্বকামী সমাজপতিদের নির্মিত সংস্কারের বাঁধন যেমন এক দিকে শিথিল হতে লাগল অপর দিকে তেমনি আঘাত হানল খ্রীস্টধর্ম-প্রচারকরা স্বধর্ম প্রচার ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ বর্ষণ করে। স্পষ্টত হিন্দুসমাজ এই সময় তিনটি গোষ্ঠীতে ক্রমশ বিভক্ত হয়ে পড়ে—রক্ষণশীল, উগ্র-সংস্কারবাদী এবং সংস্কারবাদী প্রগতিশীল গোষ্ঠী। আচরণগত দিক্ থেকে রক্ষণশীলগোষ্ঠী ধর্মীয় নীতি-নিয়ম এবং কুসংস্কারগুলির যথাযথ অনুসরণে একদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন, অপর দিকে যেকোনও প্রকার বিরুদ্ধাচরণকে প্রতিহত করা অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। এঁদের এই প্রভুত্বকামী মনোভাব ও ধর্মাচরণের নামে কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য-প্রদর্শন সামাজমানসে মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি করে চলেছিল। খ্রীস্টধর্ম প্রচারকরা সেই রন্ধ্রপথেই প্রবেশাধিকার লাভের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ফলে শিক্ষিত হিন্দুর একাংশের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় ধর্মীয় নীতি-নির্দেশের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের অবসানলগ্ন সূচিত হল। সর্বোপরি সদ্য পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুব সম্প্রদায়ের আচরণে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পরিস্থিতি ক্রমশই প্রতিকূল হওয়ায় অধর্ম-আচরণকারী ও ধর্মত্যাগী হিন্দুদের সধর্মে প্রত্যাবর্তনের পথ এই প্রথম তাঁরা নিয়ম-নীতির তদারকির মাধ্যমে উন্মুক্ত করলেন ; প্রবেশ পথটি যথেষ্ট সংকীর্ণ হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এই গুরুত্ব আরোপ সচেতনতার পরিচায়ক।

উগ্র-সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। অবশ্য এঁদের মানসগঠনে ও সধর্মদ্বেষী করে তোলার মূলে খ্রীস্ট-ধর্মপ্রচারকদেরও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। এঁরা হিন্দু ধর্ম সংস্কার ও জীবনাচরণের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও অবমাননা প্রদর্শন শুরু করেন। তাঁদের আচার-আচরণ সর্বপ্রকার শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করে চরম উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। হিন্দু আচারের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে তাঁরা নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই উগ্রসংস্কারবাদীগোষ্ঠী হলেন প্রধানতঃ সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবসম্প্রদায় ; এঁদের উদ্ভব স্থল হল মূলতঃ হিন্দু

কলেজ, পরিচয় এঁদের ইয়ং বেঙ্গল নামে, এঁদের বন্ধু, আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

সংস্কারবাদীগোষ্ঠী রক্ষণশীল হিন্দুর সংকীর্ণ ধর্মচেতনা, সংস্কারান্ধতা প্রভৃতি সামাজিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের উদার মানবিক নীতিপ্রতিষ্ঠায় যেমন উদ্যোগী হলেন তেমনি হিন্দুধর্মদ্রোহী উগ্র-সংস্কারবাদীগোষ্ঠীর উন্মার্গগামী আচরণকে প্রশমিত করার জন্য হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী মূল্যায়ন ঘটাতে সচেষ্ট হলেন। খ্রীস্টধর্ম প্রসারের পথও রুদ্ধ করা তাঁদের এই দ্বিবিধ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কর্মসূচী রূপায়ণে তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে সর্বকলুষতা-মুক্ত করতে অগ্রণী হলেন। সংস্কারবাদীদের মধ্যে কেউ-কেউ হিন্দুধর্মের প্রতি সকলপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করে উদার মানবিক নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর মনোভাব নিয়ে কুসংস্কার ও সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানালেন। সে ক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীকে এই আন্দোলনে সামিল করতে তাঁরা দ্বিধা করেননি এবং যে-কোন কল্যাণকর নীতি-নিয়মকে প্রবর্তন করতে সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিতেও ভীত হননি।

উনিশ শতকে বাংলা দেশের ধর্ম ও সমাজ-সচেতন মানুষ এই ভাবে তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের স্বতন্ত্র চিন্তাধারাকে ধর্ম ও সমাজ-জীবনে প্রয়োগ করার জন্য একাধিক সভাসমিতি গঠন করেন। অবশ্য এমনও দেখা যায় যে, কর্মসূচী বিশেষের প্রতি সমর্থন থাকায় এক গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি অপর গোষ্ঠী পরিচালিত সভা বা সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাই চরম রক্ষণশীল কোন ব্যক্তিকে দেখা গেছে সংস্কারবাদীদের কোন কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন করতে এবং সংস্কারবাদী কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ বিরুদ্ধবাদীদের কখনও সপক্ষতা করতে।

১ ॥ উগ্র-সংস্কারবাদী আন্দোলনে সভাসমিতি ॥

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী সমাজের ইতিবৃত্তের বৃহত্তর অধ্যায় যুক্ত হয়ে আছে। সমাজের স্থবিরতাকে চূর্ণ করে এক সর্বব্যাপী চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে এই কলেজের শিক্ষার্থীর দল। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ২ মে এই পরিবর্তনের সূচনাকাল। ঐ তারিখে গোল-দীঘির উত্তরাঞ্চলে নব-নির্মিত গৃহে হিন্দু কলেজ স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ একই দিনে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে চতুর্থ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষত্ব হল, প্রচলিত পাঠাভ্যাসের পিঞ্জর থেকে তিনি ছাত্রদের উদার জ্ঞান-বিজ্ঞার মুক্ত আকাশে অবাধ বিচরণের সুযোগ এনে দিলেন, তাঁদের বিচার-বিবেচনা বোধকে

জাগিয়ে দিলেন যুক্তির কষ্টিপাথরের সন্ধান দিয়ে। ডিরোজিওর সহায়তায় পাশ্চাত্য চিন্তা-নায়কদের মতাদর্শের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটায় তাঁরা ইতিহাসের প্রশ্নে রবার্টসন্ ও গীবন, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে এডাম স্মিথ ও জেরিমি বেন্থাম, বিজ্ঞান বিষয়ে নিউটন ও ডেভি, ধর্ম বিষয়ে হিউম ও টম পেইন এবং দর্শন বিষয়ে লক, রীড ও ব্রাউনের মতামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। এই শিক্ষার ফলেই জন্ম নিল তাজা তরুণ রক্তের উন্মাদনা নিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে ছাত্রের দল। প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রথাগত জীবনের বিরুদ্ধে যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচারের শাণিত অস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ডিরোজিও এঁদের নিয়ে কলেজের ছুটির পর মিলিত হতেন বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক বৈঠকে। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে এই ছাত্রদের পারস্পরিক আলোচনা ও বিতর্কের নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্যই তিনি 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। প্রথমে ডিরোজিওর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাসভবনে এই সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। পরে হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগান বাড়িতে এই সভা অনুষ্ঠানের স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। সভার সভাপতি ও সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডিরোজিও ও উমাচরণ বসু। সভার অধিবেশন হত পক্ষান্তে একবার এবং সেই সভায় উপস্থিত থাকতেন হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ইয়ং বেঙ্গল দলের ভাবী নেতৃবৃন্দ। এঁদের মধ্যে ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শিবচরণ দেব প্রমুখ যেমন ছিলেন তেমনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ-এর মতো তাঁর ছাত্র-সদৃশ হিন্দু কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররাও ছিলেন। এই বিতর্ক সভার মান এত উঁচু ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল যে ডেভিড হেয়ার এতে নিয়মিত যোগদান করতেন এবং মাঝে মাঝে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিল, পরবর্তী কালের বাংলার ডেপুটি গভর্নর ডবলিউ. ডবলিউ. বার্ড, লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্নেল বেনসন, পরবর্তী কালের এডজুটেন্ট জেনারেল কর্নেল বীটসন উপস্থিত হয়ে উৎসাহ দিতেন। সভার সদস্যদের স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত আলোচনায় স্বদেশও সমাজের সর্বপ্রকার বিষয় গৃহীত হতো। এই সভায় বহুবিধ আলোচনার মধ্যে ঈশ্বর, পূজা ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা সমকালীন যুগ ও জীবনের পক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল :

> "...the attributes of God, and the arguments for and against the existance of deity as these have been set forth by Hume on the one side, and Reid, Dugald

Stewart and Brown on the other, the hollowness of idolatry and the shams of the priest-hood were subjects which stirred to their very depths the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindoo youths of Calcutta."[১৮]

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিস্তার প্রভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যুবমানসে সন্দেহ, সংশয় ও পরিণামে শ্রদ্ধাহীনতা কি উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা সমকালের কতকগুলি নির্ভরযোগ্য দলিল সাক্ষ্য দেয় :

"হিন্দু কলেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগের সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে লাগিল। ডেভিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,—'ছেলেরা উপনয়ন কালে উপবীত লইতে চাহিত না ; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত ; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল ; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।' আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত ; তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চিৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি।' এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।"[১৯]

ডিরোজিওর শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উন্মার্গগামী আচরণ সম্পর্কে পরবর্তীকালে লিখেছেন :

"The junior students caught from the senior students the infection of ridiculing the Hindu religion and where they were required to utter mantras or prayers, they repeated lines from the Iliad. There were some who

flung the Brahmanical thred instead of putting it on."[২০]

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৪ মে ১৮৩১ (২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) তারিখে উদ্ধৃত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত জনৈক 'কস্যচিত কালীকিঙ্করস্য পত্র' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞার আর এক দিক্ তুলে ধরেছে :

"কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতায় একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনান্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মার্ণিং ম্যডম্...তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি করে তোরে হিন্দু কলেজে দিয়'ছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদয় গেল....।"[২১]

রাজনারায়ণ বসু ডিরোজিওর শিষ্যদের সংস্কারমুক্তি-প্রচেষ্টার আর এক দিকের পরিচয় দিয়েছেন :

"তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।"[২২]

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বাস জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'পার্থিনন' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর হিন্দু সমাজপতিদের ক্রমবর্ধিত অসন্তোষ এবং কলেজের অধ্যক্ষ-সভার কোপদৃষ্টির চাপে দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হলেও প্রচারিত হয়নি। পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামে দ্বিভাষিক পত্রিকা অভিমত ব্যক্ত করে :

"...আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ম সংখ্যা স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার

স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল। কিন্তু যদিও হিন্দুধর্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শনমাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই . ....।"

ডিরোজিওর প্রভাবে সেই সময় কলকাতার অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররাও ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলে প্রতি সপ্তাহে সন্ধ্যাবেলায় মেটাফিজিক্স-এর উপর বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতা সভায় কলকাতার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড়শ ছাত্র উপস্থিত হতেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত রামমোহন রায়ের অ্যাংলো হিন্দু স্কুল ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইংরেজী স্কুলের ছাত্ররা সাতটিরও কিছু বেশি সভা স্থাপন করেন।[২৩] হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ নূতন ভাবধারার এরূপ দ্রুত প্রসারে দিশাহারা হয়ে কলকাতার বৃহত্তর ছাত্রসমাজের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়ে একটি সতর্কবার্তা প্রচার করেন :

"The managers of the Anglo Indian College having heard that several of the students are in the habit of attending societies at which political and religious discussions are held, think it necessary to announce their strong disapprobation on the practice and to prohibit its continuance. Any students being present at such a society after the promulgation of this order, will incur their strong displeasure"[২৪]

ডিরোজিওর শিক্ষা ও সাহচর্যে যুবমানসের দ্রুত পরিবর্তনে বিচলিত হিন্দুসমাজপতিরা এই প্রবাহকে প্রতিহত করার জন্য পার্থিনন প্রকাশ রহিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁদের উদ্যোগে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে অপসারিত হন। হিন্দু কলেজের ম্যানেজার-সভার অন্যতম সদস্য চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকমল সেন প্রমুখ ডিরোজিওর বিরুদ্ধে ছাত্রদের হিন্দুধর্মদ্বেষী করে তোলা ও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের যে অভিযোগ এনেছিলেন তা অবশ্য প্রমাণ করতে পারেননি। তিনি ছাত্রদের মধ্যে কোন প্রকার বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুরক্তি বা বিদ্বেষসৃষ্টির চেষ্টা আদৌ করেননি, বরং বলা যেতে পারে তাঁর শিক্ষা ছাত্রদের সর্বপ্রকার ধর্মের সম্পর্কেই সংশয়ী করে তুলেছিল। তাঁর শিক্ষাদানের লক্ষ্যই ছিল

ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি ও স্বচ্ছ দৃষ্টির উদ্বোধন ঘটান। অবশ্য এই শিক্ষার প্রভাবেই ছাত্রদের ধর্ম-সম্পর্কিত অন্তরস্থ স্থির বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমিটি বিচলিত হওয়ায় সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের আবেদনের শিথিল বৃন্তটি তাঁদের সামনে স্খলিত হয়ে পড়ে এবং তারই ফলে ধর্মাচ্ছন্ন সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে অশ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে। যুবমানসের এই বিশ্বাসহীনতা ডাফ প্রমুখ খ্রীস্টধর্ম প্রচারকের কাছে ধর্মপ্রচারের বাড়তি সুযোগ এনে দিয়েছে। তারই প্রত্যক্ষ নজির সমকালীন ছাত্রদের স্বধর্মবিদ্বেষিতা এবং মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রীস্টধর্মান্তরিত হওয়া।

হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর অপসারণ ঘটিয়ে এবং পার্থিনন পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করেও যুবমানসের খোলা-মনের দরজা বন্ধ করা গেল না। কর্মচ্যুত ডিরোজিও ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' নামে একটি দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ মে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে 'দি এন্‌কোয়ারার' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা এবং ডিরোজিওর ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ডিরোজিওর ভাবশিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮ জুন ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামমোহনের সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলিত হয়ে রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ নব্যবঙ্গের যুবকবৃন্দ 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর ডিরোজিওর মৃত্যু হল বটে, কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেখে গেলেন যে, তাঁর আদর্শ ও চিন্তা বাংলা দেশে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সর্বপ্রকার অবিবেচনার বিরুদ্ধে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যের দল সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্য এবং অনুরাগিবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন কত দিন জীবিত ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত সন-তারিখ নির্দেশ করা যায় না, তবে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এই অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভা হয়েছিল বলে জানা যায়:

> **"We do not know for how many years this society lived, but we find from a letter from Babu Ram Gopal ghose to his friend Babu Gobind Chunder Bysack that a meeting of the Association was held in March 1839."[২৫]**

শিবনাথ শাস্ত্রী এই সভার জীবৎকাল সম্পর্কে বলেছেন : . .

> "ডিরোজিওর মৃত্যুর পর 'একাডেমিক 'এসোসিয়েশন' হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতি রূপে বরণ করিয়া সভার কার্য্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৪৩ সালের মধ্যে ঐ সভা উঠিয়া যায়।" [২৬]

অন্যত্র শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন :

> "একাডেমিক এসোসিয়েশন ত ছিলই। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাহা হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। কিন্তু তাহার পূর্ব প্রভাব আর রহিল না। তথাপি রামগোপাল প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ তাহাকে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। ক্রমে তাহা কালগর্ভে বিলীন হইয়া যায়।" [২৭]

দু' রকম অভিমত থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে সভাটির আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হয়ে আসতে থাকে।

ডিরোজিওর অনুগামিবৃন্দ তারপর পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা ও মত বিনিময়ের জন্য এই সময় 'এপিস্টোলারী অ্যাসোসিয়েশন' বা 'লিপি-লিখন সভা' স্থাপন করেন। সভার প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। এই সভা স্থাপনের মাধ্যমে সদস্যরা পরস্পর চিঠিপত্র বিনিময়ের দ্বারা মত বিনিময় ও নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। সভার কার্য পরিচালনা করতেন রামগোপাল ঘোষ ও রামতনু লাহিড়ী।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামিবৃন্দের উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুকাল বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তারপর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়তে থাকে। হিন্দু সমাজপতিদের ক্রমাগত তীব্র বিরোধিতা এর যেমন একটি কারণ তেমনি বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে এঁদের যৌবনের উন্মাদনা ও চাপল্যের অবসান আর একটি বিশেষ কারণ। তাছাড়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তখন ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে স্বাধীন-চিন্তার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হয়ে যান নি। তাই দেখা যায় হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের পূর্বতন সদস্যবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান এবং সমকালীন অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠার জন্য ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে মিলিত ভাবে স্বাক্ষর করে একটি সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করেন। এই বিজ্ঞপ্তিপত্র থেকে জানা যায় যে, সভার প্রথম অধিবেশন সংস্কৃত কলেজে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের

১২ মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আহূত হয়। নতুন সভার নামকরণ হয় 'Society for the Acquisition of General knowledge' এবং বাংলা নাম 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। সভার যথাবিহিত কার্যকলাপ শুরু হয় ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মে থেকে। এই নতুন সভা আর পূর্ববর্তী সভার জের টেনে চলতে চায়নি। হিন্দুধর্মদ্রোহিতা বা প্রচলিত সংস্কারের বিরোধিতা করার জন্য এই সভা গঠিত হয়নি সত্য, কিন্তু নতুন যুগ ও জীবনের দাবীকে অনুসরণ করেই মুক্তমনের স্বচ্ছন্দ বিচরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বিশ্বাস বা আনুগত্য সেখানে বিচারের স্রোতপথ যাতে গ্রাস করে ফেলতে না পারে সেজন্য উদার আলোচনার সুযোগ এনে দিয়েছিল এই সভা। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় পঠিত তাঁর প্রথম অভিভাষণে গভীর আত্মবিশ্বাসের সুরে দাবী জানিয়েছেন যে, এই সভার কার্যক্রমে সামাজিক-সাধারণ যুব সম্প্রদায় সম্পর্কে পূর্ব ধারণ পরিত্যাগ করলেন :

> "The formation of a society like this, ought by no means to be passed over as a common occurrence in India. The young men of our country had long been known to pursue only vicious and unworthy objects when they meet in a body The social feelings of our nature had thus been turned to serve only base ends – and this had given to our friends much occasion for regret and to our enemies many opportunities of slander I hope the existence of the Society for the Acquisition of General knowledge will produce different effect and refresh the former with joy and fill the latter with confusion.' [২৮]

হিন্দুধর্মান্দোলনের আলোচনায় জ্ঞানোপার্জিকা সভার আলোচনা অপরিহার্য না হলেও প্রাসঙ্গিক নিঃসন্দেহে, কারণ বাংলাদেশের উগ্র সংস্কারবাদী যুব সম্প্রদায়ের মানসিক রূপান্তরের পরিণয়টি এই সূত্রে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২ ॥ রক্ষণশীল আন্দোলনে সভাসমিতি ॥

হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত সকল প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শনে যাতে কোন শৈথিল্য না ঘটে বা তার কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাই ছিল উনিশ শতকের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপতিদের অবশ্য কর্তব্য। এই

সময়ে হিন্দুধর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণ এবং অনুষ্ঠানের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে রক্ষণশীল হিন্দুরা সেগুলিকে প্রতিহত করতে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। বাংলার ভূস্বামীগণের একটি বিরাট সংখ্যা এই উদ্দেশ্যে অগ্রণী হওয়ায় এঁদের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করে। সমাজের বৃহত্তর অংশ উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অভাবে রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারের শিকারে পরিণত হয়েও কোন প্রকার বিরুদ্ধতা করতে সাহস করে নি। তার কারণ, জ্ঞানের অভাবের জন্য তাঁরা হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-সাহিত্য পর্যালোচনা করে ধর্ম ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে অক্ষম ছিলেন। তাই প্রভুত্বকামী সমাজপতিদের প্রবর্তিত নিয়ম-নির্দেশ কার্যতঃ অত্যাচার হলেও ধর্ম বলেই তাকে এই অজ্ঞ জনসাধারণ মেনে নিয়েছে। আর মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক যাঁরা জ্ঞান-বিদ্যার সংস্পর্শে ছিলেন, তাঁরা চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে সমাজপতিদের রক্তচক্ষু-শাসনের কাছে নতিস্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই ভাবে ধর্ম ও সংস্কার এক প্রকার প্রতিকারহীন অত্যাচারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই অত্যাচার ও অবিচারে সর্বাধিক পীড়িত হয়েছে নারীসমাজ। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী ছিল গৃহবন্দী বলিবদ্ধ অসহায় প্রাণীর মতো। মৃত পতির সঙ্গে অনিচ্ছুক নারীকে সহমৃত্যু বরণে বাধ্য করা, বিবাহ-সংস্কার অজ্ঞ বালিকাকে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কৌলীন্য প্রথার মর্যাদা রক্ষা করা এবং পতিবিয়োগান্তে সেই বালিকাকে আজীবন কঠোর বৈধব্য-যন্ত্রণার মধ্যে জীবন্মৃতা করে রাখা প্রভৃতি নিষ্ঠুর কুসংস্কার পালন হয়ে উঠেছিল ধর্মাচরণের পন্থা। এই সব প্রতিকারহীন সামাজিক ও ধর্মীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীসমাজের নিয়ত অশ্রুবিসর্জন রক্ষণশীল সমাজপতিদের পাষাণ-প্রাণে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারে নি। যেখানে ক্ষীণ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে সেখানে নিষ্পেষণের মাত্রা গেছে বেড়ে। এই সময়ে সমগ্র সমাজের বুকে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজপতিরা বহু যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সব বোঝার ভারে সমাজ-তরণী যখন ক্রমশই অচল হয়ে পড়ছিল ঠিক সেই সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই অনাবশ্যক বোঝাকে মুক্ত করার জন্য যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার ও মুক্তির প্রবল হাওয়া সমাজ-তরণীর পালে এসে লাগল তাকে সচল করে তোলার জন্য। এই নতুন হাওয়া বইয়ে দেবার জন্য সেই সময়ে কিছু চিন্তাশীল ও সংস্কারমুক্ত সমাজ-সচেতন মনীষী এবং যুবক এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী পুরুষ হলেন রামমোহন রায়। বেদান্ত-বিদ্যায় কৃতবিদ্য আধুনিক মনন-মানসে দীক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত দৃঢ়চেতা রামমোহন মানবকল্যাণমুখী ধর্মান্দোলনের আবেদন নিয়ে ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁর সহযোগীদের নিয়ে 'আত্মীয় সভা' গঠন করে একেশ্বরবাদী

বেদান্তধর্মের প্রচার ও পৌত্তলিকতাসর্বস্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপতিদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন এবং পরিশেষে সতীধর্ম-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের দ্বারা যে প্রবল আঘাত হানলেন তাতে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত হল।

✓ একদিকে রামমোহনের দ্বারা সৃষ্ট এই আঘাত অপর দিকে ডিরোজিওর শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গল-এর সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা যেমন গৃহের মধ্যে বিপদ সৃষ্টি করল, অপর দিকে তেমনি বাইরে থেকে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণ সেই বিপদকে আরও ঘনীভূত করে তুলল।

হিন্দুধর্ম ও সমাজের বুকে এই অবস্থায় ভাঙনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠলে তাকে প্রতিহত করার জন্য রক্ষণশীল সমাজপতিরা কৌশল ও পন্থা উদ্ভাবনের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় সমাজ' "এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে"[২৯] বিদ্বজ্জনের মিলন-ক্ষেত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সমাজকে কেন্দ্র করে কিছু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপতি প্রথম একটি সভার মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই সমাজের অধিকাংশ সংগঠক ও সভ্য শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে রক্ষণশীল ছিলেন না। তবে সমকালীন যুগ ও জীবনকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি বলেই ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে এই সমাজের একটি অনভিপ্রেত ক্ষীণ সংযোগ স্থাপন করে ফেলেছিলেন। এই সমাজ স্থাপন উপলক্ষে ৬ ফাল্গুন ১২২৯ বঙ্গাব্দে হিন্দু কলেজে আহূত সভায় রক্ষণশীল দলের রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, উমানন্দ ঠাকুর, প্রগতিশীল দলের দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন বিষয়ে আলোচনার্থে এই সভা স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হলেও ৬ ফাল্গুনের প্রথম সভাতেই রক্ষণশীল দলের ধর্ম বিষয়ে পূর্বশর্ত আরোপের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল :

> " শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর কহিলেন যে আমারদিগের ধর্মশাস্ত্র নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা করিলেন।"[৩০]

১৪ আষাঢ় ১২৩১ বঙ্গাব্দের সভায় স্থির হয় যে, কিছু দিনের মধ্যেই সভায় বেদ পাঠের ব্যবস্থা করা হবে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সভামঞ্চ থেকে জনমত গঠনের এই প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হল।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগী কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ প্রবর্তিত সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের দ্বারা আইনগত সমর্থন ও স্বীকৃতি পাওয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২ মাঘ (১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি) রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, গোপীমোহন দেব, রামগোপাল মল্লিক, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, গোকুলনাথ মল্লিক, ভগবতীচরণ মিত্র প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতি বেন্টিঙ্কের নিকট সতীদাহ আইন রদ করার জন্য এক আবেদন করেন। আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রেরিত সহমরণ মীমাংসা-পত্র রচনা করেন হরনাথ তর্কভূষণ। কিন্তু এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। রক্ষণশীল হিন্দুরা কঠোরতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে বিবেচনা করে ১২৩৬ বঙ্গাব্দ ৫ মাঘ রবিবার কলকাতা সংস্কৃত কলেজে সমবেত হয়ে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। বেন্টিঙ্ক-ঘোষিত সতী-বিরোধী আইন যাতে প্রত্যাহৃত হয় তার জন্য বিলাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদিও এই সভা আহূত হয় তথাপি সভার সংগঠকগণ বর্তমান অবস্থায় হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এই সভার মাধ্যমে উপায় অনুসন্ধানও প্রয়োজন মনে করেন। তাই এই সভায় গোকুলনাথ মল্লিকের প্রস্তাবক্রমে হিন্দুধর্মচ্যুত বিধর্মীদের সঙ্গ আহার ও সম্পর্ক পরিহার করে চলার সপক্ষে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায়। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ২৫ মাঘ ১২৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সভার পরিচয়জ্ঞাপক একটি বিজ্ঞাপনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে :

> "আমারদিগের দেশে ধর্ম্মশাসনকর্তৃত্বাভাবে ধর্মহানি হইতেছে অতএব সধর্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদিরক্ষার্থে বিশিষ্ট শিষ্ট সমূহের ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা সদুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয়..... অস্মাদাদির ঐক্য বাক্য থাকাতে ও একত্র হওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়া বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিরা আমারদিগের ধর্ম্মহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একারণ বর্তমান শকের গত ৫ মাঘে এতন্নগরস্থ বহুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন ঐ ধর্ম্মসভার নিমিত্ত এই মহানগর মধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।
>
> এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে বিলাতে শ্রীল শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করিতে হইবেক।"[৩১]

এই সভায় বারজন সভাধ্যক্ষ, একজন সম্পাদক ও একজন ধনরক্ষক মনোনীত হন। সভাধ্যক্ষ হন রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আশুতোষ দেব, গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, নীলমণি দে। সভাসম্পাদক ও ধনরক্ষকের পদ লাভ করেন যথাক্রমে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈষ্ণবদাস মল্লিক। ৫ মাঘ ১২৩৬ বঙ্গাব্দে সতী আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপিল করার জন্য সংস্কৃত কলেজে আহূত সভায় পূর্বোক্ত ঐ বারজন সভাধ্যক্ষ 'বিবেচক' মনোনীত হন এবং সম্পাদক ও ধনরক্ষক যথাক্রমে কর্মনির্বাহক ও ধনরক্ষক নামে অভিহিত হন। ২৬ মাঘ ১২৩৬ বঙ্গাব্দে কাশীপুরে প্রাণনাথ চৌধুরীর গৃহে অনুষ্ঠিত উক্ত সভার অধিবেশনে কৃষ্ণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী-সম্পাদক মনোনীত হন। এই সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সতী-বিরোধী হিন্দুর সঙ্গে সভার সকল সদস্য আহার-ব্যবহার প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করবেন। ১২৩৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের সভায় রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্রকে সাধুবাদ জানান হয়, কারণ সতী আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রেরণের জন্য ইংরেজীতে আরজি রচনা করেন রাধাকান্ত এবং আরজিসহ ব্যবস্থাপত্রের বাংলা ও হিন্দী অনুবাদ করেন তারিণীচরণ।* আরজির সঙ্গে প্রেরিত ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করেন হরনাথ তর্কভূষণ এবং এই কার্যে তাঁকে সহায়তা করেন নিমাইচন্দ্র শিরোমণি, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য। বিলাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য সভার পক্ষ থেকে বেথি সাহেবকে বিলাতে পাঠান হয়। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয়। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ১১ জুলাই বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল ধর্মসভার প্রেরিত আবেদন অগ্রাহ্য করে। এই সময় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' নিয়মিত সহমৃতা হওয়ার বাৎসরিক তালিকা প্রকাশ করে সতীদাহের প্রতি জনসমর্থনকে প্রমাণ করার জন্য অনলস ভাবে চেষ্টা করতে থাকে।

সতীদাহ প্রথা আইন-বিরুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই ধর্মসভার সদস্যদের সভার নীতি-নির্দেশ পালনে এবং হিন্দুধর্ম, সংস্কার ও সমাজ সংরক্ষণে অবিচল নিষ্ঠা শিথিলতাপ্রাপ্ত হতে লাগল। ফলে শিথিল সংগঠনে ভাঙনের ঝড় এসে ক্রমাগত ধাক্কা দেওয়ায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। ধর্মসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল সতীবিরোধীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিহার করে চলা। কিন্তু দেখা যায় ধর্মসভার অন্যতম

* পরিশিষ্ট 'ক'-এ তারিণীচরণ অনূদিত বাংলা আরজি ও বাংলা ব্যবস্থাপত্রটি সংযোজিত হল।

প্রভাবশালী সদস্য ভগবতীচরণ মিত্র তাঁর কন্যার সঙ্গে সতীবিরোধী মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বিবাহ দেন এবং বরযাত্রী হিসাবে সতী-বিরোধী দলের নেতা রামমোহন রায়ের ভ্রাতা দেওয়ান রামতনু রায় ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। এই প্রশ্নে ধর্মসভায় আলোড়ন সৃষ্টি হলে উদয়চাঁদ দত্ত তাঁর দলভুক্ত ভগবতীচরণের পক্ষ সমর্থন করে দোষস্থালনে দুর্বল যুক্তির অবতারণা করে জানান যে, সতীবিরোধী মথুরানাথ মল্লিক ও অন্যান্যেরা বিনা আহ্বানেই তাঁর গৃহে বরানুগমন করেন। হরচন্দ্র লাহিড়ীর ব্রাহ্মসভা গমনকে কেন্দ্র করে ধর্মসভার সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট গুঞ্জন শুরু হলে সম্পাদক ভবানীচরণ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে হরচন্দ্রের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি অস্বীকার পত্র প্রকাশ করে সদস্যদের সমালোচনার মুখ বন্ধ করেন। সতীবিরোধী দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহে ধর্মসভার পণ্ডিতাধ্যক্ষ নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণে গোপীমোহন দেব বাহাদুর ক্রোধান্বিত হয়ে ধর্মসভার অন্যতম সদস্য বৃন্দাবন পালকে তাঁর গৃহের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ না করার আদেশ দিলেও সে আদেশ রক্ষিত হয়নি। এছাড়া শিবনারায়ণ ঘোষের ধর্মসভা পরিত্যাগ, কালাচাঁদ বসু প্রমুখ দলপতিদের দলাদলি প্রভৃতি একাধিক আঘাত ধর্মসভাকে হীনবল করে তুলতে থাকে। রক্ষণশীল সমাজপতিদের কঠোর বন্ধন শেষ পর্যন্ত এমন শিথিল হয়ে পড়ে যে, ধর্মদ্বেষী ও সতী-আইনের প্রণেতা ইংরেজ রাজপুরুষগণও বহু সদস্যের গৃহে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হতে থাকেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার একটি অধিবেশনের বিবরণ থেকে এই সভার পরিণতির চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে:

> "পরে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত ডাক্তার উইলসন সাহেবের স্থান হইতে যে পত্র প্রাপ্ত হন তাহার চুম্বক পাঠ করিলেন তাহাতে ঐ সাহেব লেখেন যে ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলবর্দ্ধক প্রকৃতোপায় ভারতবর্ষের কৃষিকার্যের প্রতি পোষণ করণ।
>
> অনন্তর উক্ত বাবু প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মসভাতে জাতীয় বা ধর্মবিষয়ে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তদ্বিবরণ চন্দ্রিকাপত্রে আর প্রকাশ না হয় যেহেতু তাহা প্রকাশ করণেতে লোকের কিছুমাত্র উপকার নাই বরং তাহাতে আমাদের মধ্যেই পরস্পর ঈর্ষাঈর্ষি জন্মে এবং ধর্ম্মসভারো লোপ সম্ভাবনা। ....অতএব আমার পরামর্শ এই যে একটা শাখা সভা অবিলম্বে স্থাপন হয় এবং এইক্ষণকার সভাতে অপ্রয়োজনীয় যে নানা বিষয় উপস্থিত হইতেছে তাহা ঐ সভাতে উপস্থিত না করিয়া সকলের হিতজনক জমিদারী ও কৃষিকর্ম্মাদির আন্দোলন করা যায়।"[৩২]

হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের প্রহরী ধর্মসভা খ্রীস্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার সম্পর্কেও এই সভা সতর্ক ছিল। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক একটি ছাত্রকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করায় হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ধর্মসভার সভাপতি রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে মতিলাল শীলের শিমুলিয়াস্থ বাসভবনে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪ মে অনুষ্ঠিত সভায় 'শীলস্ ফ্রি কলেজ' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে মতিলাল শীলের উদ্যোগে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১ মার্চ স্থাপিত 'শীলস্ কলেজ' নব প্রতিষ্ঠিত শীলস ফ্রি কলেজের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। এই কলেজ সম্পর্কে ভবানীচরণের পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেন :

> " পাদ্রি সাহেবেরা বিদ্যাদানচ্ছলে হিন্দু বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করতে নিতান্ত যত্নবান্ তন্নিবারণ কারণ শীলস্ ফ্রি কলেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয় ।"[৩৩]

ইতিপূর্বে হিন্দু কলেজের পরিচালক-সমিতির অন্যতম সদস্যবৃন্দ রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করার অভিযোগে ঐ কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওকে অপসারিত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বিধবাবিবাহ প্রচলন করে একটি বহুকালের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য এই শতকে যে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে রক্ষণশীল ধর্মসভার প্রতিক্রিয়া তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবর্তনে ধর্মসভা নীরব ছিল না। বিধবা বিবাহকে আইন-সিদ্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই এ বিষয়ে একটি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য ধর্মসভার ভূমিকা থেকেই সেই সত্য প্রমাণিত হয়। বিধবা বিবাহের সপক্ষে আইনগত স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই বাংলাদেশের কোন অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করে ব্রিটিশ সরকারের গোচরীভূত করার উদ্দেশ্যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে পাঠিয়েছিলেন। সোসাইটির সম্পাদক উইলিয়ম থিওবোল্ড সাহেব এই ব্যবস্থাপত্রের ন্যায্যতা বিচারের জন্য ধর্মসভার কাছে প্রেরণ করেন। ধর্মসভা এই ব্যবস্থাপত্রের বিরুদ্ধযুক্তি সম্বলিত 'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থাপত্র' শিরোনামাঙ্কিত একটি পুস্তিকা ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা ও সংস্কৃতে প্রস্তুত করে ১৭৬৭ শকে ঐ সোসাইটিতে প্রেরণ করে।*

বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য একাধিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকা বহুদিন পূর্ব

* পরিশিষ্ট 'খ'-এ 'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থাপত্র'-এর বাংলা রচনাটি সংযোজিত হল।

থেকেই উদ্যোগী হন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা, ইয়ং বেঙ্গল পরিচালিত বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকা বিধবা বিবাহের সপক্ষে ইতিপূর্বে জনমত গঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং তারও পূর্বে রাজা রাজবল্লভের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তি পারিবারিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই সব বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা সর্বাত্মক আন্দোলনের রূপ লাভ করেনি। বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে ব্যাপক জনমত গঠন করতে সক্ষম হন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম তিনি ১৭৭৬ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'—এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সপক্ষতায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা সত্ত্বেও এই সামাজিক সংস্কারের সপক্ষে আইনগত স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ অক্টোবর প্রায় এক সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। এই সময়ে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদী-গোষ্ঠী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে প্রায় সাঁইত্রিশ সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি বিধবা বিবাহ-বিরোধী আবেদনপত্র ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ তদানীন্তন ভারত সরকারের কাছে পাঠান হয়। অবশেষে সব বাকবিতণ্ডাকে অগ্রাহ্য করে সরকার ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করেন।

বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সভাসমিতিতে এ সম্পর্কে বিতর্কের অবসান হয়নি। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে স্থাপিত 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সভার সম্পাদক তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বিদ্যাসাগরের পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বিষয়িনী' থেকে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বিরোধ ও বিতর্কের স্বরূপটি জানা যায়। এই সভা হিন্দুধর্ম রক্ষা ও শাস্ত্রবিচারে স্বাধীন আলোচনার আবেদন জানালেও আমন্ত্রিতদের কাছে প্রেরিত একটি চিরকুটে বিধবা বিবাহের সমর্থনকারীকে উপস্থিত না থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান হয়েছিল। নলডাঙ্গার রাজা যশোহরের একটি বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ঐ পরিবারে বিধবা বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তাই তিনি আমন্ত্রিত হন নি। এই সভা বিধবা বিবাহকে উপবিবাহ নামে আখ্যাত করে শাস্ত্রবিরোধী বলে ঘোষণা করে। বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে তা' বিতর্কিত সমস্যা হিসাবেই থেকে যায়।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার সম্পাদক হন, কিন্তু ভবানীচরণের জীবনাবসানের পর সভার বিশেষ কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। তাছাড়া সতীবিরোধী আইন প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপতিরা কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়েই ধর্মসভার নীতি ও আদর্শবিরুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

কিন্তু পরিস্থিতিই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের পুনরায় সংহত হতে বাধ্য করল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিই তাঁদের এই শিক্ষা দিল যে, ধর্ম ও সংস্কারের অর্গলকে দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে রাখা বা বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে কেবল প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই আত্মরক্ষার যথেষ্ট উপায় নয়। তার জন্য চাই আপন ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু উদার নীতি অবলম্বন করা। তাই তাঁরা খ্রীস্ট ও ব্রাহ্মধর্মের প্রবল জোয়ার থেকে হিন্দু সন্তানদের রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামীর কঠোরতাকে কিছু শিথিল করে হিন্দু ধর্মের প্রকোষ্ঠ থেকে বহির্গমনের পথের পাশে পুনঃপ্রবেশের একটি পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৫মে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি গৃহে 'পতিতোদ্ধার সভা' স্থাপন করলেন। এই সভা স্থাপনে ভবানীপুরবাসীদের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক, কারণ এই অঞ্চলে সেই সময় হিন্দু সন্তানদের খ্রীস্টান হওয়ার প্রবণতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ৫ জুন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হিন্দু সমাজপতিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সভাকে শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছে:

> "Last week we published an analysis of the proceedings of the great Hindoo Meeting held on the 25th May at the Oriental Seminary, and we cannot but think that the assembly itself, and the resolutions expressed and adopted at it, constitute one of the most important events that has occurred in India in the present century."

এই সভায় ধর্মচ্যুত ও স্বধর্মদ্বেষী হিন্দুদের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন সম্ভব কি না সে বিষয়ে দেশের হিন্দু পণ্ডিত-মণ্ডলীর অভিমত প্রার্থনার জন্য প্রশ্নের আকারে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়:

> "যাহারা নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়াছে এবং যাহারা স্বেচ্ছায় পরধর্ম্ম গ্রহণ ও ইহার আচারাদি পালন করিয়াছে, তাহারা সত্য সত্যই পূর্ব্ব ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে অভিলাষী হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাহা করিতে সমর্থ হইবে কিনা।"[৩৪]

১৭৭৫ শকে পতিতোদ্ধার সভার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের একশ' জন

পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্রিকা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সভার অভিমত হল খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্মে ধর্মত্যাগীর স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আছে কিন্তু হিন্দুধর্মে ধর্মত্যাগীর প্রত্যাবর্তনের পথ নেই বলে ধর্মত্যাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থার প্রতিকারের সপক্ষে দেশের হিন্দু পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছে বিধান চাওয়া হয়। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপতিদের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ও পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি স্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এই শতকে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কার-মুক্তির আহ্বান ও প্রগতিশীল কর্মসূচী যুব সমাজের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্ত যুবমানসে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ব্যাপক ও গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়। যাঁরা খ্রীস্টধর্মকে বিজাতীয় মনোভাবের উদ্দীপক বিবেচনা করে বর্জন করলেন তাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রগতি-শীল আবেদনের দেশীয় প্রবক্তা হিসাবে ব্রাহ্মধর্মকে শ্রেয়বোধে আলিঙ্গন করলেন। ফলে ব্রাহ্মধর্মের দ্রুত সাফল্যজনক অগ্রগতি ঘটতে লাগল :

> "রাজা রামমোহন রায় যখন ১৮২৯ অব্দে ইংলণ্ড গমন করেন, তখন প্রকাশ্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্তদিগের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় জন মাত্র ছিল। ১৮৩৯ অব্দে ব্রাহ্মের সংখ্যা একশত এবং ১৮৪৯ অব্দে পাঁচশত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬৪ অব্দে ব্রাহ্মদিগের শাখাসমাজ ৪০টী এবং তাহাদিগের সংখ্যা দ্বি-সহস্রেরও অধিক হইয়া উঠিয়াছিল।"[৩৫]

এই অগ্রগতিকে প্রতিহত করার জন্য বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে ঢাকা জিলার রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দ ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'ঢাকা হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার জগবন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দু'জন উকিল লক্ষ্মীকান্ত বসু ও ঢাকার ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের যুবনেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পিতা উগ্র ব্রাহ্মধর্মদ্বেষী কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই সভা স্থাপন করেন। সভার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'হিন্দুহিতৈষিণী' ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা'র লেখক হরিশ্চন্দ্র মিত্র। হরিশ্চন্দ্র পূর্বে বৈধব্য ব্যবস্থার চরম বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার পর তিনি হিন্দুর যাবতীয় সংস্কার ও আচারের সমর্থনে লেখনী ধারণ করেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ জুলাই 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' তাঁর সম্পর্কে লিখেছে :

> "হরিশবাবু এত কাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের সপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণে তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণে এতাদৃশ পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।"

ব্রাহ্মধর্মের স্রোত প্রতিহত করা এবং হিন্দুধর্মের আদর্শকে সুসংহত ভাবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়াতে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা' নামে আর একটি সভা স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর ও শ্রীনাথ সিংহ। ১২৭২ বঙ্গাব্দে এই সভার জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করেন নাটোরের রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর। ঐ বৎসরই ফাল্গুন মাসে 'হিন্দু রঞ্জিকা' নামে সভার মাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। রাজসাহীতে মুদ্রণ যন্ত্র না থাকায় ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে রাজসাহীর দুবলহাটীর রাজা হরনাথ রায় চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে নূতন মুদ্রণ যন্ত্র ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ করা হয়। এই সময় থেকে পত্রিকাটি রাজসাহী থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীনাথ সিংহ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয় এবং ৬৫ বৎসর পর্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল। এই সভার লক্ষ্য অনুযায়ী পত্রিকাটিতে সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় স্থান পেত। জনসাধারণের ধর্মশাস্ত্রজ্ঞানের অভাবমোচনই পত্রিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলে মুদ্রণালয়ের নামকরণ হয় 'তমোঘ্ন যন্ত্রালয়'।

এই সময়ে বাংলার বাইরে ব্রাহ্মধর্ম এবং দয়ানন্দ সরস্বতী পরিচালিত আর্য সমাজের আন্দোলন সম্প্রসারিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন নামে একজন হিন্দু ধর্মপ্রেমিক ব্যক্তি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করেন। তিনি বিহারের জামালপুর রেলওয়ে অফিসের একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন হিন্দুধর্ম প্রকৃত রূপে প্রচার না হওয়ায় এবং সাধারণ মানুষ হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম অবগত না হওয়ায় হিন্দুধর্ম ও আচার-ভ্রষ্ট হয়ে অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এই অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে (১২৮৪ বঙ্গাব্দ) বিহারের মুঙ্গের জেলায় 'আর্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেন স্থানীয় কালেক্টরের সেরেস্তাদার চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুঙ্গের ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, জমিদার গঙ্গাপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ দাস এবং ভাইরাম অগ্নিহোত্রি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। কৃষ্ণপ্রসন্ন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাংলা ও হিন্দীতে হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে এই সভার উদ্যোগে 'ধর্ম্মপ্রচারক' নামে একটি বাংলা ও হিন্দী দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কাশিমবাজারের জমিদার রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের ভূতপূর্ব সভাপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং ১২৯১ বঙ্গাব্দে এই আন্দোলনকে বাংলাদেশে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে উভয়ে কলকাতায় উপস্থিত হন।

তাঁদের আন্দোলনের সপক্ষতা করে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার অধ্যক্ষগণ এবং মহেশচন্দ্র পাল হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশে উদ্যোগী হন। এই আন্দোলনের সূত্রেই 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শশধর তর্কচূড়ামণি উভয়েই নবজীবন পত্রিকায় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কঠোর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন শশধর তর্কচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতে না পারায় 'নবজীবন' পরিত্যাগ করে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় স্বমত প্রকাশ করতে লাগলেন।

রক্ষণশীল ধর্মান্দোলনের লক্ষ্য হিন্দুধর্ম ও সমাজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা নয়, হিন্দুধর্ম ও সমাজের উপর আপতিত বিরুদ্ধাচারীদের আঘাতকে প্রতিহত করা। উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ কৌশল স্থির করাই ছিল রক্ষণশীল সভাসমিতিগুলির কাজ। সংস্কারের নির্মোকে আত্মগোপন করে দ্রুত ধাবমান যুগ ও জীবনকে এই সব রক্ষণশীল সভাসমিতিগুলি একপ্রকার অস্বীকার করতে চেয়েছিল।

৩ ॥ সংস্কারবাদী আন্দোলনে সভাসমিতি ॥

সংস্কারবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য হল, হিন্দুধর্ম ও সমাজের ব্যাধিস্বরূপ অযৌক্তিক প্রথাসিদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করা। অবশ্য হিন্দুধর্মের অনুশাসনের ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত ব্যাখ্যা থেকেই মুখ্যতঃ সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাধির উৎপত্তি। কারণ, হিন্দুধর্ম সুপ্রাচীন কাল ধরে আমাদের সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার-পদ্ধতির সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং সেই ধর্ম আমাদের স্নান-পান-আহার-বিহার-বিশ্রাম প্রভৃতি সকল কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তাই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় ধর্মের বেনামীতে ভ্রান্ত সংস্কার, গোঁড়ামী ধর্মের আসন অধিকার করে বসেছিল। দীর্ঘকাল প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজকে মুক্ত জীবনের স্বচ্ছন্দ বিচরণের উদার ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্যই সংস্কারবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত সভাসমিতির নেতৃবৃন্দ হিন্দু ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম বা গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোন গোষ্ঠীগত অভিপ্রায় পূরণ করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ মনে হলেও হিন্দুধর্ম ও সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত উদার মানবিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই আন্দোলনের মৌল অভিপ্রায়। তাই এই আন্দোলনকে বলা যেতে পারে, সংকীর্ণ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে উদার ধর্মনীতির সংগ্রাম। সর্বপ্রকার কুসংস্কার-সৃষ্ট নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও অসহায়তা থেকে সামাজিক সাধারণকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে এই যুগের প্রগতিশীল বিদ্বজ্জন মিলিতভাবে একাধিক সভাসমিতি গঠন করে জনমত সৃষ্টিতে উদ্যোগী হলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে নব্য যুব-সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে একদিন শ্রদ্ধাহীন মনোভাব নিয়ে উন্মার্গগামী আচরণ করেছে সেই যুবসম্প্রদায়ই আবার পূর্ববর্তী ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এই দশকে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে কলুষতা মুক্ত করে পুনর্গঠনে ব্রতী হয়েছে। হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কিছু সুশিক্ষিত ছাত্র ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দু ফিলাডেলফিক সোসাইটি' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। জ্ঞান-বিস্তার আলোচনা করাই যদিও এই সভার ঘোষিত অভিপ্রায় ছিল, তথাপি হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সমস্যাকেও তাঁরা সভার আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে স্থান দেন। এই সভার সভাপতি হন এইচ. জেস্কি সাহেব। সভার একটি বৈঠকে লাড্‌লিমোহন দত্ত নামে একজন বিশিষ্ট ছাত্র বহুবিবাহ প্রথাব ঘৃণ্য রূপটি পত্রাকারে লিখিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জুলাই প্রকাশিত ২৩ সংখ্যক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা এই প্রবন্ধের প্রতি সাধুবাদ জানিয়ে লেখে :

> "সভার গত বৈঠকে বাবু লাডলিমোহন দত্ত কুলীনদিগের বিবাহ বিষয়ক এক পত্র পাঠ করিয়াছিলেন, কুলীনদিগের বহুবিবাহে যে২ দোষ ঘটে ঐ পত্রে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত ছিল এবং তিনি লিখিয়াছিলেন যে বহু বিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরই বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় কেবল অর্থের নিমিত্ত বিবাহ করিলে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রণয় ও দার পরিগ্রহের তাৎপর্য সম্পন্ন হইতে পারে না, উক্ত বাবুর এই মত আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রামাণ্য করি যেহেতু পরমেশ্বর পুরুষ জাতীয়দিগের সাহায্যার্থে এবং সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া পুরুষের কর্ম্মে উৎসাহ প্রদান নিমিত্ত স্ত্রী জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব এতাদৃশ স্ত্রীলোকদিগকে কেবল অর্থের নিমিত্ত ব্যবহার করিলে জগদীশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়।[৩৬]

ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত চেতনা পরিত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনায় বিতর্ক-বিরোধের উর্ধ্বে সর্বমানবিক আবেদন ও ঐক্য স্থাপন প্রচেষ্টায় কিশোরীচাঁদ মিত্র স্বীয় ভবনে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি "Hindu-Theo-Philanthropic Society" নামে 'বিশ্ব প্রেমোদ্দীপনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় আলেকজাণ্ডার ডাফ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। সভার মাসিক অধিবেশনে ইংরেজী অথবা বাংলা ভাষায় ঈশ্বরের প্রকৃতি, গুণ এবং ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক

উদার চিন্তা-সমন্বিত প্রবন্ধ পঠিত হত। সভায় হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা করা হলেও ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ সম্পর্কে যুক্তিসম্মত উন্নত ও উদার অভিমত প্রচারের উদ্যোগে গৃহীত হয়। সর্বোপরি এই সভা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করা। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে সভার প্রাণস্বরূপ কিশোরীচাঁদ মিত্র রাজকর্মানুরোধে কলকাতা ত্যাগ করায় এই সভার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তবে এই উদার ধর্মচিন্তার আবেদন সংস্কারের রুদ্ধদ্বার-কক্ষে বন্দী সমাজ-মানসে ধীরে ধীরে সাড়া জাগাতে লাগল।

হিন্দুধর্ম-সমর্থিত সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তির সন্ধানে সচেতন ছাত্র সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় সভার নাম 'সর্ব্বশুভকরী সভা'। এই সভা স্থাপিত হয় ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে কলকাতার ঠন্‌ঠনিয়ায় অবস্থিত রামচন্দ্র চন্দ্রের ৫৮ সংখ্যক ভবনে। হিন্দু কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা উদ্যোগী হয়ে তারকনাথ দত্তের নেতৃত্বে এই সভা গঠন করেন। ১২৫৭ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' নামে সভাব একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সভা স্থাপন বৃত্তান্ত ও পত্রিকার উদ্দেশ্য বিবৃত হয়ঃ

> "আমরা কএক জন ছাত্র একমতাবলম্বী হইয়া গত ফাল্গুন মাসে সর্ব্বশুভকরী নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভা সংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহু কালাবধি আমাদিগের দেশে কতকগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। কিন্তু এই সঙ্কল্পিত অসাধ্যসাধন বিষয়ে সর্ব্ব-শুভকরী কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারিবেন তাহা জগদীশ্বর জানেন।
>
> কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিত যে কৌলীন্যব্যবস্থা, বিধবাবিবাহপ্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষ দোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও মঙ্গল লাভ হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ দ্বারা কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং এই পত্রিকাতেও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় সবিস্তর প্রকটিত করা যাইবেক....।"

মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক হলেও পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা এত গভীর ও ব্যাপক ছিল যে, রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন ঃ

"ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্ব্বশুভকরী' নামে পত্রিকা বাহির করেন।"[৩৭]

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্য বিবাহের দোষ' এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর এই পত্রিকায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বিষয়ও মাঝে মাঝে নির্দেশ করে দিতেন। চৈত্র-সংক্রান্তির উৎসবে জিহ্বা ও পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করা এবং মৃত্যুর পূর্বে অন্তর্জলি পালন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য বিদ্যাসাগর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্র মাধবচন্দ্র গোস্বামীর প্রতি নির্দেশ দেন।[৩৮] সমাজকল্যাণে ব্রতী সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত ১১ আগস্ট ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সপ্রশংস মন্তব্য করেন :

"সর্ব্বশুভকরী নাম্নী মাসিক পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর পরমানন্দ লাভ করিলাম, ঐ পত্রের রচনা অতি উত্তম এবং তাহাতে উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইতেছে, প্রার্থনা করি এই 'সর্ব্বশুভকরী' সর্ব্ব শুভকরী হইয়া চিরস্থায়িনী হউক....।"

এই সময়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যসেবামূলক 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সমাজসংস্কারকেও তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম বিদ্যোৎসাহী পুরুষ কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দীর্ঘ দিন কালীপ্রসন্ন এর সম্পাদক ছিলেন। অন্যান্য সম্পাদকদের মধ্যে উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধারমণ বিদ্যারত্নের নাম পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবী ও মনস্বী ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় আহূত সভায় সাহিত্য চর্চা, প্রবন্ধ পাঠ ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনা হত। সভায় বিশিষ্ট প্রবন্ধকারদের পুরস্কার প্রদান ও বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের উপযুক্ত মর্যাদায় সম্মানিত করা হত। সাধারণের অবগতির জন্য সভায় পঠিত প্রবন্ধ ও প্রদত্ত বক্তব্য বিষয় পূর্বাহ্নে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হত। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে ৪ নভেম্বর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এরূপ একটি প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখা যায় :

"হিন্দু ধর্মের উৎকৃষ্টতা বিষয়ক প্রবন্ধ নানা প্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিতে হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন, তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। ২ মাঘ সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক—"[৩৯]

যদিও নির্বাচিত প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তথাপি এরূপ মনে করা যায় যে, ঐ

প্রবন্ধ হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপক ছিল না। কারণ, এই সভা হিন্দুধর্মকে সামাজিক নিষ্পেষণ যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের চরম বিরোধী ছিল বলেই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণের ব্যবস্থা করে এবং বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে বিধবাবিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এক সহস্র টাকা পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করে।

ধর্মীয় কুসংস্কারকে মুক্ত করে সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধানকল্পে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদসমিতি' নামে প্রগতিশীল ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা গঠিত হয়। এই সভা স্থাপনের জন্য কিশোরীচাঁদ সমকালীন হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও আচার-সর্বস্বতার নগ্ন দিকটি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে তুলে ধরেন ঃ

> "আমাদিগের ব্যবহারিক ধর্ম্ম বহু দোষের আকর। ইহা সকল প্রকার উন্নতির বিঘ্নকারী। ইহা প্রতিনিয়ত এবং অতি সূক্ষ্ম ভাবে আমাদিগের আহার-নিদ্রার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত নহে, এমন কি শৌচাদি বিষয়েও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিতেছে, তাহা নহে ; কেবল আমাদিগের যাত্রা নিরোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় ইহা অমঙ্গলকর বলিয়া ঘোষণা করিতেছে এবং কালাপানি পার হইতে নিষেধ করিতেছে, এমতও নহে ; পরন্তু আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে এবং বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিতেছে। হাঁ, আমাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে আহার ও পান করিতে হইবে এবং নিদ্রা যাইতে হইবে—যেন আমাদিগের সাধারণ কার্য্য না করিয়া আমরা একটি গম্ভীর এবং পবিত্র-ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেছি।"[৪০]

কিশোরীচাঁদের প্রস্তাব ক্রমে এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থনে সভাটি স্থাপিত হয়। কিশোরীচাঁদের দ্বারা প্রস্তাবিত এবং অক্ষয় দত্ত সমর্থিত সভার প্রধান কর্মসূচী হল স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ রোধ প্রভৃতি। সভার সভাপতি হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যুগ্মসম্পাদক মনোনীত হন কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য মনোনীত হন যথাক্রমে সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সেন, দিগম্বর মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের কার্যনির্বাহক-সমিতিতে উল্লিখিত সদস্যদের সঙ্গে শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী ও

জীবনকৃষ্ণ সেনের নাম পাওয়া যায়। কিশোরীচাঁদের ডায়েরীতে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বরের দিনলিপিতে এই সভার সভ্য হিসাবে রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারকনাথ সেন প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।[৪১]

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে এই সভার পক্ষ থেকে বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে সর্বপ্রথম আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক প্রথম গ্রন্থের ভূমিকায় সভার এই উদ্যোগের কথা সপ্রশংস ভাবে উল্লেখ করেন। তাছাড়া এই প্রকার উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত ভাবে ব্যবস্থাপক সভায় অনুরূপ আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সপক্ষে এই সভা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেন এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিশোরীচাঁদ, প্যারীচাঁদ, রাধানাথ সিকদার ও তারকনাথ সেন এই বিষয়ে প্রার্থনা পত্র প্রস্তুত ও সংশোধনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে সভার পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিধবাবিবাহের সপক্ষে আইনগত সমর্থন আদায়ের জন্য বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিক প্রচেষ্টার সাফল্যই যদিও প্রমাণিত হয়, তথাপি এই আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক সংযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভার মতো সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতির ভূমিকাও নগণ্য ছিল না।

এই সভার পক্ষ থেকে অন্তর্জলি প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাবও আলোচিত হয়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা উঠে যাবে এই আশা প্রকাশ করে সরকারের কাছে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হয়। সভা চড়ক উৎসবে দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করে।

ধর্মান্দোলন ও সমাজ সংস্কারে 'ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র প্রগতিশীল ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে রক্ষণশীল ধর্মান্দোলনের অন্যতম সমর্থক শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তাঁর ভ্রাতা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উদ্যোগে এই সভার অন্যতম সদস্য প্রসিদ্ধ ধনী খেলাৎচন্দ্র ঘোষের পাথুরিয়া ঘাটার বাড়িতে সভাটি স্থাপিত হয়। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে ১৭ বৈশাখ থেকে তিন দিন ব্যাপী এই সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার স্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১২৮০ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ তারিখে উক্ত সভার শেষ সভাপতিত্ব করেন। কালীকৃষ্ণ

দেবের দেহান্তরের পর তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই সভার স্থায়ী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

কলকাতা ছাড়াও দিনাজপুর ও বিক্রমপুর অঞ্চলে এই সভার শাখা স্থাপিত হয়। তাছাড়া জয়পুরের মহারাজা, বিজয়নগরের মহারাজা ও নেপালের কর্নেল সমসের জঙ্গবাহাদুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভার সদস্য ছিলেন এবং একাধিকবার সভার অধিবেশনে যোগদান করেন। সভার মাসিক মুখপত্র 'সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী' ১২৭৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার জন্য এই সভা সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বসুর দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাকে সভা প্রশ্রয় দেয়নি। বহুবিবাহ ও কন্যাপণ রহিত করার জন্য সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কলকাতায় প্রথম কলের জল সরবরাহ শুরু হলে এই জলের ব্যবহারে ধর্মনাশের সম্ভাবনায় রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং তা আন্দোলনের রূপ নেয়। তখন এই সভা বাংলা দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত-দের মতামত গ্রহণ করে ঐ জলের ব্যবহার্যতার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে এবং সভার অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে দেখান যে ধর্মনাশের আশংকা ভ্রান্ত ও অমূলক :

> "ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার তৎকালীন মহানুভব সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণ ঐ বিষয়ে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এবং সেই ব্যবস্থা সমস্তের বলাবল ও ব্যবস্থাপক-দিগের সংখ্যা বিবেচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন যে বর্তমান প্রণালীর যন্ত্রোত্থিত গঙ্গাজল আর্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্নানপানে অবশ্যই গ্রাহ্য হইতে পারে।..
>
> প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্মার্ত শ্রীযুত ভারতচন্দ্র শিরোমণি তথা আমার সভাপণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের বেদ দর্শনাদি সর্বশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য এবং আমার সভাসদ্ ভূতপূর্ব্ব ভাস্করাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এই পুস্তক সংক্রান্ত শাস্ত্র পর্য্যালোচন কার্যে আমার বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন।"[৪২]

উনিশ শতকে বিরুদ্ধবাদিরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণের লক্ষ্য স্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিল তথাকথিত ধর্মসমর্থিত সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে। তাই সংস্কারবাদী আন্দোলনে ব্যাপৃত সভাসমিতিগুলি সমাজসংস্কারের মধ্য দিয়ে বিপন্ন হিন্দুধর্মকেই পরোক্ষভাবে রক্ষা করেছিল। স্বার্থসর্বস্ব কিছু মানুষ হিন্দুধর্মের মৌল আবেদন—মানব-কল্যাণমুখী

আদর্শকে সংস্কারের ক্লেদ-পঙ্কিলতা দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, হিন্দুধর্ম হয়ে উঠেছিল মানব নিগ্রহের হাতিয়ার স্বরূপ। সংস্কারের সেই মলিনতা থেকে হিন্দুধর্মের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করার কাজেই সংস্কারবাদী সভাসমিতিগুলি এই শতকে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

উপচ্ছেদ : সভাসমিতি পরিচালিত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে প্রভাবিত সমকালীন সাহিত্য

সভাসমিতিকৃত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় এই শতকে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়। আন্দোলনের ফলে যে যুগসমস্যাগুলি সমাজের সামনে এসে উপস্থিত হয়, সেগুলি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপাদান ও উপকরণে পরিণত হয়ে তাকে একান্ত শৈশবেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। এই যুগের আন্দোলনে সমাজের বুকে যে তরঙ্গাভিঘাত লেগেছে সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসে স্নাত হয়েছে নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও কাব্য-কবিতার বিষয়, চরিত্র ও কাহিনী। সমকালীন সাহিত্য-শিল্পীরা কোথাও ধর্ম ও সমাজসংস্কারের চড়া তারে সুর বেঁধেছেন, কোথাও আবার আপন ভালোলাগা-মন্দলাগা বা সমর্থন-অসমর্থনকে রচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ধর্মান্দোলনের ত্রিধারায় খ্রীস্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে নব্যশিক্ষিতের অশিষ্ট আচরণ, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি বিষয়গুলি সভাসমিতির অঙ্গনে পরস্পরবিরোধী যে মতামত সৃষ্টি করেছিল সেই মতামত বাংলা সাহিত্য রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার উৎসমুখ অজস্র ধারায় উন্মুক্ত হল। সভাসমিতির এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অনালোচিত থেকে গেছে বলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক উপাদান ব্যবহারের উৎস সঙ্গত কারণেই নির্দেশিত হয়নি।

সভাসমিতির আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণায় এই শতকে বাংলা সাহিত্যের যে উৎসমুখ খুলে গেল তার পর্যালোচনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতা প্রয়োগের ধারাবাহিক পরিচয় জানবার যেমন একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে তেমনি সমকালীন শিক্ষিত মানসে ধর্ম ও সমাজ সমস্যার প্রতিক্রিয়াটিও জানা যাবে। আন্দোলনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে প্রচার করার জন্য আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন, সেগুলি আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ অংশ বলে তার পর্যালোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। সেই কারণে রামমোহনের সতীদাহ, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ, শশধর তর্ক-চূড়ামণির হিন্দুধর্ম, দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের ব্রাহ্মধর্ম-প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত প্রবন্ধের মধ্যে যেগুলি প্রচার-সর্বস্ব-রচনা হয়ে উঠেছে সেগুলির আলোচনা পরিহার করা

হল। বর্তমান আলোচনায় উল্লিখিত আন্দোলনে প্রভাবিত সাহিত্যমূল্য বিশিষ্ট রচনাগুলিই পর্যালোচনা করা হবে।

॥ ধর্মান্দোলন ও সাহিত্য ॥

নাটক ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ধর্মান্দোলনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকের পর্যালোচনা সূত্রে প্রথমেই আমরা দেখি, মধুসূদন দত্ত রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) প্রহসনে ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবসম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে হিন্দুধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। প্রহসনটির কেন্দ্রীয় চরিত্র নবকুমার তার অনুগামীদের কাছে আদর্শ ব্যাখ্যা করে বলেছে :

> "আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম। কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি ; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে।"

মধুসূদনের অপর প্রহসন 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)-তে রক্ষণশীল হিন্দু ভক্তপ্রসাদের ধর্মাড়ম্বরের অন্তরালে লাম্পট্যের চিত্রটি অঙ্কিত হলেও নব্য যুবসম্প্রদায়ের যথেচ্ছ ইংরেজী শব্দ ব্যবহার এবং আচার-আচরণের মধ্যে হিন্দু রীতি-নীতির প্রতি অমর্যাদা প্রকাশে রক্ষণশীল হিন্দুর প্রতিক্রিয়ার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভক্তপ্রসাদের কাছে তাই অধর্মাচরণের দৃষ্টান্ত হল, 'এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানি মত' এবং 'ক্লেবর' শব্দ ব্যবহার তার কাছে বিরক্তি উদ্রেককারী।

বেহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গোৎসব' (১৮৬৮) নাটকে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবের বর্ণনা আছে। কিন্তু নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, শিক্ষিত ব্রাহ্মদের কাছে হিন্দুর দুর্গোৎসবের মহিমাপ্রচারই নাটকটির মূল উদ্দেশ্য।

অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৫) নাটকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নন্দলালের প্রতি রক্ষণশীলদের উপহাসে উনিশ শতকের প্রথম দিকের কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের প্রতি রক্ষণশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীরই অনুসরণ ঘটেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হয়েও ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগীদের আচরণের আতিশয্য লক্ষ্য করে যে কৌতুক অনুভব করেন তারই প্রতিক্রিয়ায় তাঁর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) প্রহসনটি রচিত হয়।

মনোমোহন বসু উনিশ শতকের প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দু নাট্যকার হিসাবে বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁর 'নাগাশ্রমের অভিনয়' (১৮৭৫) প্রহসনটি ব্রাহ্মসমাজের

প্রতি কটাক্ষমূলক রচনা। রূপকের আশ্রয়ে কেশবচন্দ্র ও তাঁর ভারতাশ্রম, আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাকে লক্ষ্য করে চরিত্র ও ঘটনা পরিকল্পিত হয়েছে। তাঁর 'আনন্দময় নাটকে' (১৮৯০) কাহিনীর কেন্দ্রে আছে একটি ষড়যন্ত্র, কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু সমাজিক দোষ বর্ণনার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের নিন্দা করা হয়েছে।

উপন্যাস ॥ বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে ধর্মান্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট ভাবেই অনুভূত হয়। খ্রীস্টধর্মের সমর্থনে লেখা হানা ক্যাথেরীন মুলেন্সের উপন্যাসোপম রচনা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) উল্লেখযোগ্য। দেশী খ্রীস্টানদের জন্য এই সমাজের ঘটনা অবলম্বনে কাহিনীটি রচিত হয়। দেশী খ্রীস্টান সমাজেই রচনাটি প্রচারিত হয়, হিন্দু পাঠকসমাজে এই রচনাটির প্রচার হয়নি। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) হিন্দুর সনাতন নীতি, ধর্ম ও সুরুচির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছে। 'অভেদী' (১৮৭১) উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পারস্পরিক মতবিরোধের ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠে' (১৮৮৪) হিন্দুর ধর্মচেতনার সঙ্গে দেশাত্মবোধকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন এবং হিন্দুর পৌত্তলিক সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকেই স্বদেশকে দেবী দুর্গার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৫) উপন্যাসে গার্হস্থ্য কাহিনীর অন্তরালে বঙ্কিম গীতোক্ত কর্মবাদ ও হিন্দুর সমাজিক আচার-আচরণের একটি সুসমঞ্জস প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সংস্কারবাদী-হিন্দুধর্মান্দোলনে অগ্রণী সভাসমিতি হিন্দুধর্মের পুনর্বিচারের যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা'র অন্যতম প্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে প্রথমে তিনি 'নবজীবন' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যায় অন্ধ-আনুগত্যের অভাব দেখে শশধর তর্কচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গ ত্যাগ করে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় লিখতে থাকেন।

হিন্দু ধর্মান্দোলনে ব্যাপৃত সভাসমিতিগুলির ব্রাহ্মধর্ম-বিরুদ্ধতার ঢেউও উপন্যাস-সাহিত্যের তটে এসে লেগেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কটাক্ষ করেছেন। কলকাতা থেকে দেবীপুরে প্রত্যাগত দেবেন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ ও ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকে বঙ্কিম তার কলকাতায় শেখা ঢং বলে কটাক্ষ করেছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুযায়ী দেবেন্দ্রের নারীমুক্তি সাধনের প্রয়াসকে তিনি বিশেষ অর্থবহ বলে ইঙ্গিত করেছেন। বঙ্কিম সমকালীন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাসে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচারী যুবসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী-

-দের বিরুদ্ধে লেখকদ্বয়ের মনোভাবের প্রকাশ নিতান্ত কঠোর। ইন্দ্রনাথের হাস্যরসপ্রধান 'কল্পতরু' (১৮৭৪) উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পাত্রপাত্রীর বিরুদ্ধে যে তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করেছেন তা ঔপন্যাসিক রসবিস্তারকে যে বিপর্যস্ত করেছে সে দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করেননি। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাসে হিন্দুধর্মের উচ্চাদর্শ প্রচার যেমন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে আনন্দ দিয়েছিল তেমনি অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ঐ সমাজের মনোবেদনা ও উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। এইসব রচনায় বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি স্থূল ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক আক্রমণে তিনি দ্বিধাহীন ছিলেন। এই উদ্দেশ্যবাদিতা উপন্যাস-লক্ষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাঁর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮), 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৯০), 'কালাচাঁদ' (১৮৮৯-৯০) প্রভৃতি ব্যঙ্গ কাহিনীগুলি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। মডেল ভগিনী উপন্যাসটি সরাসরি ব্রাহ্ম সমাজ এবং বিশেষভাবে কোন ব্রাহ্ম পরিবারের নৈতিক জীবনের প্রতি তীব্র কটাক্ষমূলক।

প্রবন্ধ॥ এযুগের অনেক প্রাবন্ধিকের রচনায় সমকালীন ধর্মান্দোলনের প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) স্কেচধর্মী নিবন্ধজাতীয় রচনাটিতে মদ্যপানের কুফল বর্ণনা লক্ষিত হলেও তৎকালীন সমাজ-নেতাদের সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষা বিষয়ে দলাদলির ও অনাচারী রক্ষণশীল সমাজের হিন্দুধর্ম রক্ষার হাস্যকর প্রচেষ্টার কথাও বিবৃত হয়েছে। 'ধর্মসভা'র দলাদলির চিত্রই এই সূত্রে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও আধুনিক মননের আলোকে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনকে প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সমন্বয়বাদী নব্য হিন্দুধর্মের আদর্শে রচিত তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) প্রবন্ধ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব কি,' 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি', 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে', 'জ্ঞান', 'সাংখ্য দর্শন' প্রভৃতি প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের আধুনিক এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এই প্রবন্ধগুলিতে সনাতন হিন্দুধর্মাদর্শকে এক নতুন তৎপর্যের উপকূলে পৌঁছে দিয়েছেন। সেখানে অন্ধ শাস্ত্রানুসরণ বা লোকাচার ও দেশাচার-নির্ভর ধর্মানুষ্ঠান সমর্থিত হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবল আঘাতে বিপর্যস্ত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারকল্পে যে কয়েকজন মনস্বী ব্যক্তি সাহিত্য চর্চা করেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' (১ম ভাগ, ১৮৭৬) প্রবন্ধ গ্রন্থে সনাতন হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিবৃত হয়েছে। 'আচার প্রবন্ধে' (১৮৯৫) ভূদেব হিন্দুর শাস্ত্র ও লোকাচারসিদ্ধ আচরণের যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মানসিকতার অপর শরিক বীরেশ্বর পাঁড়ে যুক্তি ও শাস্ত্রের সাহায্যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক প্রবন্ধ

রচনা করেন। তাঁর 'ধর্মবিজ্ঞান' (১৮৯০) ও 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' (১৮৯৭) প্রবন্ধ দুটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা ও সাহচর্যে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। চন্দ্রনাথ সনাতন হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে ব্রাহ্ম ও প্রগতিশীল হিন্দুধর্ম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে ঘোরতর বিরোধী মনোভাব নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথাগত হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থন-জ্ঞাপক গ্রন্থের মধ্যে 'হিন্দু বিবাহ', (১৮৮৭) 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২) উল্লেখযোগ্য। পূর্ণচন্দ্র বসু বঙ্কিম-পর্বের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মাদর্শে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। তাঁর সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সভাসমিতিগুলির বক্তব্যই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর 'সমাজতত্ত্ব' (১৩০৮) প্রবন্ধটি বিশ শতকের প্রারম্ভে রচিত হলেও উনিশ শতকীয় রক্ষণশীল মানস-গঠনটিই প্রবন্ধে পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় :

> "প্রাচীন হিন্দু সমাজ যে উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই আদর্শের প্রতি লোকলোচনের দৃষ্টি ফিরান এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান হিন্দু সমাজ হাজার ভ্রষ্টাচারে পরিপূর্ণ ও কলঙ্কিত হউক, তথাপি তাহার ধর্মনৈতিক আদর্শের বিশদ মূর্তি সকলের মনে জাজ্বল্যমান হওয়া উচিত।"

কাব্য-কবিতা।। ধর্মান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কাব্য-কবিতায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মনঃপ্রকৃতি এবং যুগচিত্রের একটি দিক্ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতায় হিন্দুধর্মে আস্থাহীন ইয়ংবেঙ্গল সমাজের প্রতি যেমন কটাক্ষ আছে তেমন ইংরেজী সভ্যতা, যীশুখ্রীস্ট ও আলেকজাণ্ডার ডাফের হিন্দুধর্ম বিরোধী প্রচারকার্যের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গোক্তি—

> হোয়ে হিঁদুর ছেলে টঁ্যাসে চেলে
> টেবিল পেতে খানা খাবে।
> এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না
> খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে।।
> ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
> জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
> হোল কর্মকাণ্ড লণ্ড ভণ্ড
> হিঁদুয়ানী কিসে রবে।।

ইংরেজী সভ্যতা, যীশুখ্রীস্ট এবং আলেকজাণ্ডার ডাফ সম্পর্কে তাঁর বিদ্রূপাত্মক উক্তি—

> ধন্য রে বোতলবাসী, ধন্য লাল জল।
> ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল।।

দিশিকৃষ্ণ মানিনে ক খৃষিকৃষ্ণ জয়।

মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়॥

যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।

ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥

মহাকবি ধূর্জটি নামে পরিচিত এক কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে দ্বাদশ স্বর্গ বিশিষ্ট 'একাদশ অবতার বা পঞ্চানন্দ মঙ্গল' (১২৯৩) কাব্যে ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধীদের কটাক্ষ করেছেন। কোন অজ্ঞাতনামা বসু মহাশয় 'স্বর্গভ্রষ্ট কাব্যে' (১৮৬৯) খ্রীস্টধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। যীশুখ্রীস্টের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বন করে নবীনচন্দ্র ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে 'খৃস্ট' কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটিতে কবির উদ্দেশ্যবাদিতা না থাকলেও খ্রীস্ট ধর্মান্দোলন যে পরিমণ্ডল রচনা করেছিল তার প্রভাব কবিকে খ্রীস্টের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনায় উৎসাহিত করেছিল একথা বলা যেতে পারে। আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'ভারতমঙ্গল' (১৮৯৪) কাব্যটিতে ভারতের মঙ্গলবিধানে রামমোহনের আবির্ভাবকে অলৌকিকতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এই কাব্যে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টিকে কবি উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত জাতীয় জাগরণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

॥ সমাজ-সংস্কারক অন্দোলন ও সাহিত্য ॥

উনিশ শতকে সমাজ-সংস্কারক সভাসমিতিগুলির আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব সমকালীন সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলি সাহিত্য রচনায় কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে কোথাও গৃহীত হয়েছে, কোথাও আবার প্রাসঙ্গিকভাবে সেগুলি এসেছে।

নাটক ॥ নাটকের দর্পণে এই সমস্যাগুলি এযুগে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থন ও অসমর্থনের উভয়বিধ প্রতিক্রিয়া সমকালীন নাট্য-সাহিত্যে নানা ভাবে এসেছে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর ঐ বৎসরই উমেশচন্দ্র মিত্র প্রথম 'বিধবা বিবাহ' নাটক রচনা করেন। নাটকটিতে বিধবার জীবনের বেদনার দিকটি নাট্যকার গভীর মমত্বের সঙ্গে তুলে ধরে বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। একই বৎসরে বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বিধবোদ্বাহ' নাটক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'চপলা চিত্তচাপল্য' নাটকটি বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থন-জ্ঞাপক। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে শিমূয়েল পীববক্স নামে খ্রীস্টধর্মান্তরিত এক মুসলমান বিধবাবিবাহের সমর্থনে 'বিধবাবিরহ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'দলভঞ্জন' নাটক-এর বিষয় বিধবা বিবাহের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ ষড়যন্ত্র।

ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্র বিধবাবিবাহের সমর্থনে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে 'ম্যাও ধরবে কে' এবং 'শুভস্য শীঘ্রং' নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'বহরমপুর নাট্য সমাজ' কর্তৃক প্রকাশিত বিরাজমোহন চৌধুরীর 'বঙ্গ বিবাহ' নাটকটিতে বিধবা বিবাহ সমর্থিত হয়েছে। নাটকটি বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।

কৌলীন্য প্রথা সম্পর্কিত প্রথম ও সর্বাধিক আলোড়ন-সৃষ্টিকারী নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক (১৮৫৪)। কৌলীন্য-প্রথার কদর্য রূপটি তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত এক নাটক রচনা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই নাটকটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। নাটকটিতে কুলীনদের হৃদয়হীনতার যে চিত্র অঙ্কিত হয়, তা সে যুগের কুলীন-সমাজকে ভীষণভাবে রুষ্ট করেছিল। অম্বিকাচরণ বসু রচিত 'কুলীন কায়স্থ নাটক' (১৮৬১)-এ কায়স্থ সমাজে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' (১৮৭২) নাটকটি কৌলীন্য-প্রথা ও বহুবিবাহেব সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব নাটক' (১৮৬৬) বহুবিবাহের প্রতি নিন্দাসূচক রচনা। এই নাটকটিও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আয়োজিত বহুবিবাহ-বিষয়ক নাটক বচনা প্রতিযোগিতার সূত্রেই বচিত। তারকচন্দ্র চূড়ামণির বহুবিবাহ বিষয়ক 'সপত্নী' নাটকটি (১৮৫৮) উত্তর পাড়ার সমাজ সংস্কাব আন্দোলনের অন্যতম নেতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়েব প্রেরণায় রচিত। দয়ালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়েব 'সুশীলা সরলাসুন্দরী নাটক'-এ (১৮৭৩) বহুবিবাহের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। বাল্যবিবাহকে আক্রমণ করে রচিত সে যুগেব নাটকগুলির মধ্যে শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বিবাহ' (১৮৬০) নাটকখানি উল্লেখযোগ্য। বামচন্দ্র দত্তের 'বাল্য বিবাহ' (১২৮১) নাটকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে।

উপন্যাস ॥ সমকালীন উপন্যাসে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গটি সামাজিক প্রশ্ন হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসে বিধবাবিবাহের বিষময় পরিণতি চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে বিধবাবিবাহ কেন্দ্রীয় সমস্যা না হলেও এতে বিধবাবিবাহের অশুভ পরিণতি চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের পরই রমেশচন্দ্র দত্তের ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটলেও রমেশচন্দ্র বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর 'সংসার' (১৮৮৬) উপন্যাসে বিধবা-বিবাহের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কোরকে কীট' (১৮৭৭) উপন্যাসটির আখ্যানবস্তু কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ।

প্রবন্ধ ॥ প্রবন্ধ সাহিত্যে লেখকের যুক্তিনিষ্ঠ ও মননঋদ্ধ আলোচনায় সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ভাবনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সতীদাহ' প্রবন্ধটিতে সতীদাহ সমর্থিত হয়েছে। তবে লেখক এই প্রথার নিষ্ঠুরতা ও বলপ্রয়োগ সমর্থন করেন নি। চন্দ্রশেখরের 'সারস্বতকুঞ্জ' (১২৯১) প্রবন্ধ গ্রন্থে আলোচ্য প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চন্দ্রশেখরের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'সতীদাহ' নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন।

অক্ষয় দত্ত বিধবাবিবাহের সমর্থনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রবন্ধ লেখেন। শাস্ত্রীয় যুক্তির অসারতা প্রমাণ অথবা পুনর্বিচারের মাধ্যমে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন অপেক্ষা বিধবা নারীর অসহায়তার প্রতি সমাজের সহানুভূতি উদ্রেক করাই এই সব প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৭৭৬ শক, চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ এ প্রসঙ্গে উদ্ধার্য :

> "কোন পতিবিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথিবিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার সামগ্রী অর্পণ করিল না!— জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না। এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না'-এই শিরোনাম চিহ্নিত প্রবন্ধে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় আবেগ ও পাশ্চাত্য মানবতাবাদী মতবাদে পরিচালিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর অভিমতকে 'পারিবারিক প্রবন্ধে' (১৮৮২) ব্যক্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ আন্দোলনের সমকালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বহুবিবাহ আন্দোলনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে 'বহুবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন। অবশ্য গ্রন্থাকারে সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাল্যবিবাহ' (১৮৮২) প্রবন্ধে বাল্যবিবাকেই সমর্থন করেছেন।

কাব্য-কবিতা ॥ কাব্য-কবিতায় সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গ কাব্যমূল্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও কবিরা তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গীর দ্বারা

বিধবাবিবাহের প্রতি অসমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর কবিতায় বিধবাবিবাহের প্রতি অসমর্থন শালীনতা-বর্জিত রসিকতার সুরে ব্যক্ত হয়েছে :

যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব ॥
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে ॥

দাশরথী রায় পালাগান রচনা করে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষ করেছেন :

আমাদিগকে দিতে নাগর, এলেন গুণের বিদ্যাসাগর,
বিদ্যাসাগর বিধবা পার কর্তে তরীর গুণ ধরেছে গুণনিধি।

নবীনচন্দ্র সেনের 'বিধবা কামিনী' (১৮৬৪) কবিতায় বিধবা নারীর বেদনাময় জীবনের বর্ণনা আছে। তাঁর 'কে তুমি' (১২৮৪) কবিতায় বিধবা রমণীর প্রতি সহানুভূতি গভীর মর্ম বেদনার সুরে ব্যক্ত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. George Otto Travelyan—The life and letters of Lord Macaulay, new edition, Vol. I, London 1895, p. 464.

২. Peary Chand Mitra—David Hare (Basumati Sahitya Mandir edition, Calcutta 1949) p. 17-18.

৩. K. P. Sen Gupta—The Christian Missionaries in Bengal (1773-1833), p. 115.

৪. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ প্রকাশিত ২ সং, পৃ. ৭২

৫. Baptist Missionary Society Periodical Accounts, Vol. I, p. 8.

৬. Alexander Duff—India and Indian Mission, p. 204.

৭. Baptist Missionary Society, Methodist Missonary Society —Bound letters of Thomas. Nov. 4. 1800., Comment in the Mergin probably by Ryland, p. 208.

৮. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—আত্মীয় সভার কথা, পৃ. ৪

৯. ঐ ঐ পৃ. ১৭

১০. Calcutta Journal, Vol. 3., May, 18, 1819.

১১. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ প্রকাশিত, ২ সং, পৃ. ৬১

১২. শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয়-চরিত, পৃ. ১৫

১৩. প্রধান আচার্য : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পৃ. ২২

১৪. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সং, পৃ. ৬৫

১৫. যোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলার নব্য সংস্কৃতি, প্রকাশ কাল ১৯৫৮, পৃ. ৩০

১৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পৃ. ১১

১৭. যোগেশচন্দ্র বাগল—দেবেন্দ্রনাথ, পৃ. ৭২-৭৩

১৮. Thomas Edwards—Henry Derozio, 1884, p. 32.

১৯. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নিউ এজ প্রকাশিত ২য় সং, পৃ. ১০২

২০. Peary Chand Mitra—David Hare (Basumati Sahitya Mandir Edition, Calcutta 1949) p. 17-18.

২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড। পৃ. ২৩৭

২২. রাজনারায়ণ বসু—সেকাল আর একাল (সাহিত্য পরিষৎ সং, কলিকাতা ১৯৫১) পৃ. ৩২

২৩. Alexander's East India Magazine, June 1831, i, 7, 704-দ্রষ্টব্য A.F. Salahuddin Ahmed—Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-1835, Rddhi India,

২৪. The Days of John Company (w.B.Govt. Press, Cal. 1959) edited by Anil Chandra Das Gupta, p. 575.

২৫. The National Magazine, New Series, Vol, XXVI, No. 4, April 1914, Some Literary Societies of Calcutta,

২৬. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ প্রকাশিত ২য় সং), পৃ, ১৪৩

২৭. ঐ ঐ পৃ. ১১৬

২৮. Goutam Chattopadhyay—Awakening in Bengal in early nineteenth century, Vol.I. p. 1.

২৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড পৃ. ৯

৩০. ঐ ঐ পৃ. ১০

৩১. ঐ ঐ পৃ. ৩০৪

৩২. ঐ ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃ. ৫৯৫

৩৩. ধর্মসভার অতীত সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত দৃষ্ট শ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ, কলিকাতা ১৮৪৯, পৃ. ১৭-১৮

৩৪. যোগেশচন্দ্র বাগল—জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ, প্রকাশ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩-৭৪

৩৫. ভূদেব মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস (২য় সং) ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৫

৩৬. বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য় খণ্ড) পৃ. ২৬৭-৬৮

৩৭. রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত (৩য় সং. ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ) পৃ, ৩৮-৩৯

৩৮. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, বুকল্যাণ্ড প্রকাশিত পৃ, ৮০-৮১

৩৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালীপ্রসন্ন সিংহ (সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড) পৃ. ১৩

৪০. মন্মথনাথ ঘোষ—কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, পৃ. ১০৩

৪১. ঐ ঐ পৃ. ১০৭

৪২. কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর—যন্ত্রোত্থিত জলশুদ্ধি (প্রকাশকাল ১৮৮২) অবতরণিকা অংশ, পৃ. ৵০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে সভাসমিতি ॥

বাংলাদেশের নারীজাতি দীর্ঘকাল বঞ্চনা অবহেলা ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে গৃহবদ্ধ জীবের মতো জীবন যাপন করে এসেছে। নারীজাতি যে সমাজের একটি অংশ এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নতিসাধন করতে হলে পুরুষের সঙ্গে নারী জীবনেরও যে বিকাশ-সাধন প্রয়োজন এ সত্য দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। নারীজাতি যেমন সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক নৈতিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে নারীজাতির স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রতি পদক্ষেপে প্রতিহত করা হয়েছে। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত নারীসমাজ নিষ্ঠুর সামাজিক শাসনের অন্ধকারায় রুদ্ধ থেকেছে। নারী জাতির এই গ্লানিময় পরাধীন জীবনের জন্য দায়ী হিন্দুসমাজের একটি গরিষ্ঠতম অংশের রক্ষণশীল মনোভাব। সংকীর্ণমনা এই সমাজ সতীত্বের মেকি অলংকারে ভূষিত করে বাল্যবিবাহের যূপকাষ্ঠে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একান্ত অঙ্কুর অবস্থাতেই দিয়েছে বলি, ধর্মনাশ ও স্বামীর অকালমৃত্যুর ভ্রান্ত আশংকা সৃষ্টি করে বিদ্যা অর্জন থেকে নারী জাতিকে করেছে বঞ্চিত এবং সর্বপ্রকার কলুষতামুক্ত পবিত্র চরিত্র সংরক্ষণের প্রলোভন দেখিয়ে অন্তঃপুরে রেখেছে বন্দী করে। স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে এই সমাজের অভিমত হল স্ত্রীজাতি আপন স্বভাবে ভীরু ও দৈহিক শক্তিতে দুর্বল বলে পুরুষের অধীনতা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। সুতরাং পুরুষের ইচ্ছাতেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে এ যুগে যাঁরা ব্যতিক্রম তাঁদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব উল্লেখযোগ্য :

> "He assisted the late Gauramohan Vidyalankar the Head Pandit of the School-Society in the preparation and publication of a pamphlet called the Stri-Siksha Vidhayaka, on the importance of female education and its concordance with the dictates of the Sastra, encouraged the training of girls in the indigenous schools and set an example to his countrymen by educating the female members of his own family."[১]

উনিশ শতকে নবজাগরণের অন্যতম শর্তই হল নারী মুক্তির প্রতিষ্ঠা। যুক্তির হাতিয়ার

নিয়ে সচেতন সমাজ এগিয়ে এল অন্ধকারায় বদ্ধ নারীসমাজকে মুক্তির আলোকোজ্জ্বল প্রান্তরে উদার উন্মুক্ত আকাশ-বাতাসের সংস্পর্শে নিয়ে যেতে। অবশ্য একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই উত্থাপিত হতে পারে যে, এ যুগে সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে যে আন্দোলন চলছিল তা' নারীমুক্তি প্রচেষ্টারই তো অঙ্গ। কিন্তু এ যুক্তি মেনে নিয়েও বলা যায় যে, এই শ্রেণীর আন্দোলন ছিল নারীর স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য অনুদার সমাজের প্রতি যুক্তিনির্ভর নির্দেশ। এই প্রচেষ্টার মহত্ত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু নারী জাতিকে আত্মনির্ভরতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার আসল কুঞ্চিকা ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারের উদ্যোগের ভিতর। নারীসমাজকে সেই স্বনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষাসচেতন ও স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠতে এযুগে এক শ্রেণীর সভাসমিতি বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সমাজে এতাবৎকাল পুরুষের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে হিন্দু, রক্ষণশীল সমাজের সংকীর্ণমনা অনুদার শ্রেণী কল্পিত আতঙ্ক সৃষ্টি করে, নানা কুৎসা রটনা করে কার্যকর বিরোধিতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগলেন। আবার ভিতরে ভিতরে এই নারী জাগরণের প্রশ্নে যথেষ্ট আতঙ্কিতও হয়ে উঠলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এই আতঙ্কের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন :

> "লোকে বলিতে লাগিল—'এই বার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছুই বাকি থাকবে না।' নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন, 'বাপ্‌রে বাপ্‌ মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে আর রক্ষা আছে!' এক 'আন' শিখাইয়া রক্ষা নাই। চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।"[২]

কিন্তু যুগের ডাককে উপেক্ষা করার মতো সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বহু বিরুদ্ধতার মধ্যেও এ যুগের সভাসমিতিগুলি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে চলল।

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে 'ফিমেল জুভিন্যাল সোসাইটি' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই বৎসর ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটির সহযোগিতায় 'Mrs. Lawsan and Mrs. Pearce's Seminary'.... বিদ্যালয়ের মহিলারাও কয়েকজন শিক্ষানুরাগী মহিলা দেশীয় মহিলাদের শিক্ষার অভাব-জনিত দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য সভাটি স্থাপন করেন। 'কলকাতা স্কুল বুক

সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স সভার সভাপতি মনোনীত হন। সভার উদ্যোগে একই বৎসর কলকাতা গৌরীবেড়ের নন্দনবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে জানবাজার, শ্যামবাজার ও চিৎপুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়গুলির নামকরণ হয় 'জুভিন্যাল স্কুল', 'লিভারপুল স্কুল', বার্মিংহাম স্কুল' ও 'সালেম স্কুল'। অভিভাবকদের আতঙ্ক এবং সংকীর্ণচেতা রক্ষণশীলদের প্রকাশ্য বিরোধিতা বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রী সংগ্রহে প্রথমে যথেষ্ট অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সেই সময় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা ও স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্নে উদার মানসিকতা পোষণ করে জুভিন্যাল সোসাইটির উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য অগ্রণী হলেন। তাঁর শোভাবাজারের বাড়িতে স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের সময় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ছাত্রদের সঙ্গে কৃতি ছাত্রীদেরও পুরস্কৃত করা হতে লাগল। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে যে পুস্তিকা রচনা করেন রাধাকান্ত সেই রচনায় কিছু তথ্য সরবরাহ করেন এবং জুভিন্যাল সোসাইটির দ্বারা পুস্তিকাটির মুদ্রণ ও প্রকাশনায় তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। জুভিন্যাল সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তিকাটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হলে রাধাকান্তের প্রচেষ্টায় স্কুল সোসাইটি পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ফিমেল জুভিন্যাল সোসাইটি 'বেঙ্গল ক্রিশ্চান স্কুল সোসাইটি'র সঙ্গে মিলিত হয়ে স্কুল বুক সোসাইটি এবং রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক পঠন-পাঠন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই জুভিন্যাল সোসাইটি এই বিচ্ছিন্নতাকে বরণ করে নেয়।

ফিমেল জুভিন্যাল সোসাইটির পর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী দ্বিতীয় সভার নাম **'Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity'**। এই সভার সংক্ষিপ্ত নাম 'লেডিস সোসাইটি'। সভাটি স্থাপনের একটি পূর্ব বৃত্তান্ত আছে। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কিছু মহিলা সভ্যের যোগাযোগের সূত্রে **'British and Foreign School Society'**-র কিছু সভ্য অর্থ সংগ্রহ করে কুমারী কুক নামে এক শিক্ষিতা মহিলাকে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতা স্কুল সোসাইটিকে সহযোগিতা করার জন্য প্রেরণ করে। কিন্তু কলকাতা স্কুল সোসাইটি তখনও পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মতো জনমত গড়ে তুলতে পারেনি বলে সভ্যদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় ইংলণ্ড থেকে সদ্য

আগত কুমারী কুকের কলকাতায় অবস্থানের দায়িত্ব বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় চার্চ মিশনারী সোসাইটি কুমারী কুকের কলকাতায় বসবাসের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করে। কুক কার্যারম্ভের পূর্বে বাংলা ভাষায় কথোপকথন শিক্ষার জন্য একদিন স্কুল সোসাইটি পরিচালিত একটি বালকদের পাঠশালায় গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে একটি বালকের ভগিনীকে পাঠশালায় পড়ার জন্য ক্রন্দন করতে দেখে গভীর বেদনা অনুভব করেন। কুমারী কুক এই দৃশ্য দেখার পর ঐ অঞ্চলের অন্যান্য পুরো-মহিলা এবং বালিকাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লেখাপড়া বিষয়ে তাদের আগ্রহের কথা জানতে পারেন। কুমারী কুক অনতিবিলম্বে ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর, শোভাবাজার, কৃষ্ণ বাজার, মল্লিক বাজার এবং কুমারটুলি অঞ্চলে চার্চ মিশনারী সোসাইটির সহযোগিতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন শুরু করেন এবং ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা আট এবং ছাত্রীর সংখ্যা দু'শ তে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সূচীশিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। কুমারী কুকের অপরিসীম উদ্যোগে বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইতিমধ্যে কুক চার্চ মিশনারী সোসাইটির রেভারেণ্ড আইজ্যাক উইলসনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে শ্রীমতী উইলসনে পরিণত হলেন। বিবাহের পর শ্রীমতী উইলসন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত রইলেন বটে কিন্তু পূর্বের মতো বিশেষ সময় দিতে পারতেন না। এই পরিস্থিতিতে চার্চ মিশনারী সোসাইটি একটি মহিলা সমিতির হাতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কার্যভার ন্যস্ত করার প্রস্তাব করে। তখন কতিপয় ইংরেজ মহিলা একটি মহিলা সমিতি গঠনে উদ্যোগী হয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের পত্নী লেডী আমহার্স্টকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ২৪ মার্চ 'Ladies Society for Native Female Education' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। নবগঠিত এই সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য আট জন সহকারী পৃষ্ঠপোষক সহ তের জন সদস্যা মনোনীত হন। এছাড়া সম্পাদিকা হন শ্রীমতী এলারটন এবং সুপারিণ্টেণ্ডের পদ গ্রহণ করেন শ্রীমতী উইলসন। সমিতির উদ্যোগে বহু সভ্য সংগৃহীত হল এবং সভ্যদের মধ্যে দেশী-বিদেশী বহু স্ত্রী ও পুরুষ ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সভ্যের বাৎসরিক চাঁদা বত্রিশ টাকা ধার্য করা হয়।

এই সমিতি চব্বিশটি বিদ্যালয় এবং চার শত ছাত্রী নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। যোগেশচন্দ্র বাগল সমিতির শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত কার্যক্রমের ১৮২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একটি তালিকা প্রদান করেছেন :[৩]

Year	Girls' School	No. of Girls.	Those Examined.
1822	8	200	-
1823	15	300	110
1824	24	400	100
1825	30	500	-
1826	-	540	200
1827	-	600	170

এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে, সমিতির স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছিল। সমিতির উদ্যোগে কলকাতা শহরে 'Central Female School'—নামে একটি কেন্দ্রীয় স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এই ব্যাপারে জোড়াসাঁকোর রাজা বৈদ্যনাথ রায় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে বিশ সহস্র টাকা চাঁদা হিসাবে দান করেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ মে তারিখে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কেন্দ্রীয় স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয় ভবনটির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। বিদ্যালয় গৃহের নীচের তলায় প্রস্তর ফলকে বিদ্যালয়টির নির্মাণ বৃত্তান্ত ইংরেজী ও বাংলায় উৎকীর্ণ করা হয়:

The
Central School
Founded by a Society of Ladies
for the education of
Native Female Children
was greatly assisted by
a liberal donation of Rs. 20. 000 from
Raja Buddinath Roy Bahadur
and its objects were further promoted
and funds saved by
Charles Knowles Robinson Esquire
who planned and executed the building
1828

এই

মাধ্যমিক পাঠশালা

এতদ্দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার্থে

সম্ভ্রান্ত খ্রীস্টান স্ত্রী-সমূহের এক সমাজ কর্তৃক

স্থাপিত হইল

তন্নিমিত্তে

শ্রীমান রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর

অতি সচ্ছলরূপে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান দ্বারা

বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন

এবং ইহার প্রয়োজন সকলের তদতিরিক্ত সাধন ও অর্থের আহরণ

শ্রীল শ্রীযুত চার্লস্ নৌল্‌স রবিনসন সাহেব কর্তৃক হয়

যিনি ঐ গৃহের পাণ্ডুলিপি, পরে তদনুসারে গৃহনির্মাণ করেন।

সমিতির শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ ক্রমশ শহর অতিক্রম করে গ্রামে এবং বাংলাদেশের বাইরেও সম্প্রসারিত হতে থাকে। বাংলাদেশে বর্ধমান, কালনা এবং পাটনা, বেনারস ও এলাহবাদে লেডিস সোসাইটি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত বিষয় পঠন-পাঠনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে। এরূপ প্রচেষ্টায় উদ্বিগ্ন হয়ে সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যানুরাগী হিন্দুরা সমিতির উপর থেকে ক্রমশ তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে লাগলেন। 'রিফর্মার' পত্রিকার সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঐ পত্রিকায় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ১৯ ডিসেম্বর লেখেন :

> 'The design of this institution appears to have been to qualify its pupils for the purpose of going into respectable families, to instruct the women who are not is the habit of appearing abroad ; but by the system of education which has been adopted, we fear it will fail to produce the happy effects which had been anticipated. The pupils of this institution consist for the most part of the lowest castes, who are not permitted to frequent the houses of the respectable natives. For these it will be difficult to find access to the respectable females, particularly when it is known that their education consists chiefly in the knowledge of the New Testament and the Religious tracts."[৪]

এই ভাবে কেন্দ্রীয় স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয় সহ লেডিস সোসাইটি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির জনপ্রিয়তা হিন্দুদের মধ্যে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি খ্রীস্টান শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণকল্পে 'নর্মাল স্কুল' স্থাপিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয় নর্মাল স্কুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। অবশেষে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে এই মিলন সম্পূর্ণ হয়।

ভারতহিতৈষী বিদেশী ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাদের উদ্যোগে বাংলার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান 'The Calcutta Ladies Association for Native Female Education' ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি স্থাপিত হয়। সমিতি স্থাপনে মিসেস উইলসন ও রেভারেণ্ড আইজ্যাক উইলসন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল মিসেস উইলসনের পরিচালনাধীনে একটি কেন্দ্রীয় স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন এবং দেশীয় মহিলাদেব মধ্যে শিক্ষাব প্রসারের জন্য কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করা। দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে রেভারেণ্ড কিউফার্ডের সভাপতিত্বে মিশনারী সোসাইটির কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বৎসরেব মধ্যে ছ'টি বিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হয় এবং বিদ্যালয়-গুলিব স্থান লেডিস সোসাইটি পবিচালিত বিদ্যালয়গুলি থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই নির্বাচিত হয়। বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই এণ্টালি এবং জানবাজার অঞ্চলে স্থাপিত হয়। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সোসাইটি আরও ছ'টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। সর্বসমেত বারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও ঐ বছরেই আর্থিক অনটনে দু'টি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যালয়গুলি তত্ত্বাবধানের জন্য মিস্ হেবরন নামে এক ইংরেজ মহিলা সবেতন নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তিনি স্থান ত্যাগ করায় আট জন সদাশয় ইংরেজ মহিলা বেতন ছাড়াই বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সমিতি পরিচালিত বিদ্যালয়-গুলিতে হিন্দু ছাত্রী পড়লেও অধিকাংশ ছাত্রীই ছিল মুসলমান। বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য-সূচীর মধ্যে খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত পুস্তিকা পাঠ, যিশুর বন্দনা গান ও প্রার্থনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এই সব কারণেই ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে সার্কুলার রোডের একটি মাত্র বিদ্যালয় সমিতির পরিচালনায় বিদ্যমান ছিল।[৫] সমিতি প্রায় দশ বৎসর কার্য পরিচালনার পর ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে অবলুপ্ত হয়। খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক পঠন-পাঠনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ায় ইংরেজ মহিলা পরিচালিত সভাসমিতিগুলির যে পরিণতি হয়েছিল এই সমিতির ভাগ্যেও সেই অবস্থা ঘটে।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারে দেশীয় বিদ্বৎজনের উদ্যোগে গঠিত সভাসমিতির মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৮) সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই সভা স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গঠনে উদ্যোগী না হলেও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার গুরুত্ব' বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল। সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই উভয় বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে জনচেতনা জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা প্রশ্নে সমাজের সর্বস্তরে এমনকি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদেব মধ্যেও যে বিভ্রান্তি ছিল তা নিঃসনের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উদ্যোগী হয়, অবশ্য স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থিত হয়নি। ঈশানচন্দ্র বসু স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে লেখেন :

> "এক্ষণে স্ত্রীস্বাধীনতা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, সমুদয় বঙ্গীয় সমাজেরই অথবা সমুদায় সভ্য সমাজেরই আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ের মতভেদে দুই তিন দলে বিভক্ত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় স্ত্রীদিগের স্বেচ্ছাচারিতাই কি ব্রাহ্মসমাজের কি সমুদায় বঙ্গীয় সমাজের কি সমুদায় পুরুষ সমাজের ভয়। আমি শুনিয়াছি কোন কোন ইংরাজও স্বজাতীয় স্ত্রীদিগের যথেচ্ছাচারিতায় উৎপীড়িত হইয়া আমাদের স্ত্রীদিগের অবস্থাকে জনসমাজের মঙ্গলকব বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এরূপে যথেচ্ছাচারিণী না হইয়া যদি এদেশীয় স্ত্রীগণ যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তাঁহারা যাহা চান করুন, কাহারই চক্ষে তাহা অসহনীয় হইবে না। আমি আবো বলিতে পারি তাঁহারা লোকের শ্রদ্ধার পাত্রী হইবেন ".[৬]

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ আয়োজন এবং জনচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টিতে ইউরোপীয় মহিলাদের তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও দেশীয় মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবারের মহিলাদের তেমন আকর্ষণ করতে পারে নি। তার অন্যতম কারণ খ্রীস্টধর্মমূলক কাহিনী ও পুস্তিকা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় উচ্চতব শ্রেণী যথেষ্ট আতঙ্কিত বোধ করে। এই আতঙ্ক যাতে স্ত্রীশিক্ষা বিমুখতায় পর্যবসিত না হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সে সম্পর্কেও জনচেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করে :

> "আমরা এক্ষণে খ্রীস্টান স্ত্রীলোকদিগেব উপরে এই বিষয়ে নির্ভর কবিয়া নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু আর এরূপ নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের উচিত হয় না। কাল প্রভাবে কলিকাতা মহানগরে ও পল্লিগ্রামে কতকগুলি বয়স্কা বিদ্যাবতী হিন্দু স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃপুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অবস্থা তত ভাল নয়, অতএব উল্লিখিত কার্য অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে লওয়ান যাইতে পারে। অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়া উল্লিখিত শিক্ষা কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।"[৭]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই ভাবে দেশীয় উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারের প্রথম নান্দীপাঠ করে এবং তারপর একে একে নারীমুক্তির প্রশ্নে বহু সভাসমিতি গড়ে ওঠে।

ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ১ জুন অনুষ্ঠিত সভার উদ্যোক্তারা ঐ বৎসর ২৩ জুন 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড' নামে একটি সমিতি গঠন করে জন-হিতকর কাজে উদ্যোগী হন। সমিতির তহবিলের অছি নিযুক্ত হন রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করে সমিতির পক্ষ থেকে আর্থিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা একটি অন্যতম বিষয় ছিল। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে ২০ অক্টোবরের সভায় এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পুস্তকের মান বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল ও কৃষ্ণমোহন। পুরস্কৃত ব্যক্তিদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, গোপীকৃষ্ণ মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এই উদ্যোগের গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের মিলিত আগ্রহের গভীরতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর 'বেথুন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ ১২ আগস্ট মৃত্যুর পর তাঁর সমাজকল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত সমকালীন বিশিষ্ট দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের যৌথ উদ্যোগে এই সভা গঠিত হয়। তৎকালীন শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক এবং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এফ. জে. মৌএট-এর আহ্বানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ স্প্রেঞ্জার, পাদ্রী জেমস্ লঙ্, ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী প্রমুখের উপস্থিতিতে মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে এক আহূত সভায় বেথুন সোসাইটি স্থাপিত হয়। সভায় ধর্ম ও রাজনীতি বাদে যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে ডাঃ মৌএট এবং প্যারীচাঁদ মিত্র। প্যারীচাঁদ মিত্র সমিতির প্রথম দু'বছর সম্পাদক ছিলেন। তারপর রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদক হন। রামচন্দ্র মিত্র অসুস্থতাবশতঃ পদত্যাগ করায় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে কৈলাস বসু প্রথমে অস্থায়ীভাবে পরে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ থেকে স্থায়ীভাবে সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সভার প্রাথমিক ও প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের মধ্যে পাঁচজন ইংরেজ এবং উনিশ জন বাঙালী সদস্য ছিলেন। ইংরেজ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এফ. জে. মৌএট, পাদ্রী জেমস্ লঙ্, মেজর জি. টি. মার্শাল, ডাঃ স্পেঞ্জার ও এ. এল. ক্লিট। বাঙালী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাসচন্দ্র বসু, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার মিত্র ও গোপালচন্দ্র দত্ত। এই সোসাইটি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার ব্যাপারে এই সভার সুচিন্তিত মতামত জনচেতনা জাগ্রত করতে সহায়তা করে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সোসাইটির সভাপতি কর্নেল এইচ. গুডউইন স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র বসুর স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। তিনি সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সাফল্য লাভ করা যায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ নভেম্বর ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের সভাপতিত্বে পরিচালিত সোসাইটি নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী সোসাইটির কার্য পরিচালনার জন্য ছ'জন বিশিষ্ট সদস্যের অধীনে ছ'টি বিভাগ স্থাপিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ক ষষ্ঠ বিভাগটি। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ম্যাকলিয়ড ওয়াইলি-পঠিত প্রবন্ধে হানা মুরের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী এবং আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যের বিষয় উল্লিখিত হয়। সোসাইটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাজা কালীকৃষ্ণ প্রবন্ধের সমর্থনে প্রদত্ত এক বাংলা বক্তৃতায় হিন্দুশাস্ত্রে নারীজাতির প্রতি ব্যবহার এবং স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির সামগ্রিক উন্নতিতে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সোসাইটির ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দু নারীর শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ বিধানে স্বদেশের কল্যাণ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা দেন। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ সভায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় দেশের শিক্ষিত সমাজের স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও কার্যকালে অগ্রসর না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে মাসিক অধিবেশনে সোসাইটির সভাপতি ডাফ সাহেব ইতিপূর্বে গঠিত স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ক বিভাগের দীর্ঘ নীরবতার পর রাজা কালীকৃষ্ণের পুত্র কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণের সভাপতিত্বে বিভাগটির পুনর্গঠনের কথা ঘোষণা করেন। হরেন্দ্রকৃষ্ণ কয়েক বৎসর এই বিভাগের সভাপতির দায়িত্বভার বহন করার পর পদত্যাগ করায় ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ সভাপতির পদে বৃত হন এবং হরশঙ্কর দাশ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর ২৮ নভেম্বর সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে সভাপতি বিচারপতি

ফিয়ার এক বক্তৃতায় ছাত্রীদের জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন।

এইভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও সর্বাত্মক নারী জাগরণে দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেথুন সোসাইটি এযুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনের একটি ব্যাপক সমাবেশ ঘটে কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে। এই সমাবেশে সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদসমিতি' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। প্রথম সমাবেশেই নূতন সভার জন্য গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উত্থাপিত এবং অক্ষয় দত্তের সমর্থিত স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাবটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে সভার সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরের গৃহেই একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের সমাজহিতৈষণামূলক কার্যক্রমের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রগতিশীল নেতাদের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২৭০ বঙ্গাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে গঠিত 'থিস্‌টিক ফ্রেণ্ডস্‌ সোসাইটি' নামে 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'র অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীসমাজের সামগ্রিক উন্নতি বিধান করা। ব্রাহ্মবন্ধু সভা বয়স্কা নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একই বৎসরে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করে। এই সভা বিবাহোত্তর বালিকাদের স্বগৃহে পঠন-পাঠনের ধারাবাহিক চর্চা অনুমোদন করে বৎসরে দু'বার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে এবং পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করে। আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী সভা'র উপর ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

বামাবোধিনী পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে প্রকাশিত সংখ্যায় এই পত্রিকার এবং বামাবোধিনী সভার একটি ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়। পত্রিকার এই সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, যশোহর নিবাসী বাবু বসন্তকুমার ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ) কলকাতায় ১৬নং রঘুনাথ চ্যাটার্জী লেনের বাড়িতে অবস্থান কালে স্ত্রীলোকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ-প্রদর্শক স্বরূপ একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্যে বসন্তকুমার ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, বসন্তকুমার দত্ত প্রমুখের মিলিত উদ্যোগে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে বামাবোধিনী সভা স্থাপিত হয়। বসন্তকুমার ঘোষের উল্লিখিত বাসস্থান সভার কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সভার উদ্যোগে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে (ভাদ্র, ১২৭০ বঙ্গাব্দ) উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী

পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড কমিটির পক্ষে প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শিবচন্দ্র দেব উদ্যোগী হয়ে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সংকলন করে 'নারী শিক্ষা' নামে দুটি পুস্তক মুদ্রণে আর্থিক সহায়তা দান করেন। হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড কমিটির সাহায্যে বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে সংকলিত কিছু প্রবন্ধ 'বামারচনাবলী' নামে প্রকাশিত হয়।

বামাবোধিনী সভা পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ ছাড়া বয়স্কা পুরোমহিলাদের শিক্ষা দান করা, শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কৃত করা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-বর্জিত উদার ও সংস্কারমুক্ত ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। নারী-জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনেই এই সভার কর্মতৎপরতা নিয়োজিত ছিল।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ৫ এপ্রিল স্থাপিত 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'র স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' গ্রন্থের ৭৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায় এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাকালটি যথাযথ নয়।* এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় উত্তরপাড়ার 'গভর্ণমেণ্ট ভার্ণাকুলার স্কুল' গৃহে। তারপর যোগীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় উত্তরপাড়ার স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ে কয়েক মাস সভা অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে উত্তরপাড়ার তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী ও সমাজহিতৈষী জমিদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জুলাই থেকে তাঁর বাসগৃহের একটি কক্ষে সভার কার্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। সভার প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ ছিলেন নিম্নরূপ :

সভাপতি	—	বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি	—	প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক	—	হরিহর চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক	—	করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ	—	প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হিসাবরক্ষক	—	মন্মথ চট্টোপাধ্যায়

হিসাবরক্ষক মন্মথ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যতম সদস্য কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভার শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সভা হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমান বিভাগে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়। প্রতি জেলায় ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং কৃতি ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদানে উৎসাহিত করার জন্যও এই সভা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

* পরিশিষ্ট 'গ'-এ Ootterparah Hitokorry Shova for the year 1863-64.

পুরস্কার প্রাপ্ত কৃতি ছাত্রীদের মধ্যে হুগলী স্কুলের ছাত্রী কবি কামিনী রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬-'৬৭ খ্রীস্টাব্দের সরকারী শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্টে বর্ধমান জেলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিতকরী সভার নাম উল্লিখিত হয়েছে :

> "The chief authority on the subject of female education in the Burdwan division, is the Hitokari Sabha."[৮]

বয়স্কা এবং অন্তঃপুরচারী নারীদের শিক্ষার জন্যও এই সভা বিশেষ ব্যবস্থা করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতহিতৈষিণী মিস্ মেরী কার্পেন্টার সহ ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে হিতকরী সভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উত্তরপাড়ার বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান।[৯] হিতকরী সভার স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগের প্রতি বিদ্যাসাগর ও কার্পেন্টারের এই পরিদর্শন বিশেষ স্বীকৃতিজ্ঞাপক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২ নভেম্বর তাঁর অনুগামীদের নিয়ে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সংস্কার সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। সভার সভাপতি হন কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদকের পদে বৃত হন গোবিন্দচন্দ্র ধর। এই সভার মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণকর কার্য পরিচালনার জন্য পাঁচটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদকতায় 'স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক বিভাগটি উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগের পরিচালনায় প্রথমেই বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর অভাব 'মোচন করার জন্য ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ১ ফেব্রুয়ারি একটি শিক্ষয়িত্রী-বিভাগ স্থাপিত হয়। এই সময়ে বামাবোধিনী পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তৈরি করা। এই বিদ্যালয়ে কয়েকজন দেশী ও বিদেশী বিদুষী মহিলাসহ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় প্রমুখ উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং সময়াবকাশে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়টি প্রথম পটলডাঙ্গায় স্থাপিত হয়। স্থানাভাবে বিদ্যালয়টি কয়েকবার বিভিন্ন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৯ আগস্ট তদানীন্তন সরকার বিদ্যালয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বার্ষিক দু'হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করে।

ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আবার স্ত্রীসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্য ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল 'বামাহিতৈষিণী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করে। এই সভার সভাপতি হন কেশবচন্দ্র এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ী সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করেন। প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং শেষ শুক্রবার

সভায় স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যরা স্ত্রীজাতির কল্যাণ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতেন ও বক্তৃতা করতেন। নারীসমাজকে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং আত্মিক উন্নতির জন্য তাদের পালনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সর্বাত্মক জাগরণের শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষা লাভের সঙ্গে শিক্ষার সুফলগুলি আস্বাদন করাবার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সভার ভূমিকার বৈচিত্র্যটি লক্ষ্য করার মত। এই সভার কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে বিচারপতি ফিয়ারের স্ত্রী শ্রীমতী ফিয়ার, কুমারী পীগট, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সভ্যপদ গ্রহণ করেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা-সমিতির উদ্যোগ-আয়োজন এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেশবচন্দ্র আচার্যের পদ গ্রহণ করে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে ব্রাহ্ম মহিলাদের একটি স্বতন্ত্র উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে এই সমাজ যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। তাঁরা নিজেদের স্ত্রী ও পুরোমহিলাদের নিয়ে প্রকাশ্য সভা ও উৎসব-অনুষ্ঠানে পুরুষদের উপস্থিতির মধ্যে হাজির হতে লাগলেন। এই উৎসাহ এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হল যে, দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এক সময়ে নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্য স্থানে ঘোড়ায় চড়ার প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর নিজের জবানীতে বলেছেন :

> "স্ত্রী স্বাধীনতার আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারে কোন বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্য্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবেশীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। সে সব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমি তখন উদ্যম নব্য ভাবের নেশায় উন্মত্ত। এইরূপে অন্তঃপুরে পর্দা ত উঠাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল।"[১০]

ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ প্রবলভাবে লাগল যখন দুর্গামোহন দাস ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল থেকে কলকাতায় আইন-ব্যবসায়ের জন্য উপস্থিত হলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থী নব্য ব্রাহ্মের দল দুর্গামোহন দাসকে কেন্দ্র করে

স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। প্রথমে কেশব সেনকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে মহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে বসবার আসন নির্দেশ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু কেশব সেন এ বিষয়ে বিলম্ব করায় দুর্গামোহন হঠাৎ একদিন স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে সমাজগৃহে প্রকাশ্যে বিনা অনুমতিতে আসন গ্রহণ করলেন। দ্বিধাগ্রস্ত কেশব সেন এ বিষয়ে সমর্থন জানাতে পারলেন না, বরং সমাজের তত্ত্বাবধায়ক মহিলাদের প্রকাশ্যে আসন গ্রহণ নিষেধ করলেন। এই সময় স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষীয়েরা ডাক্তার অন্নদা খাস্তগীরের বাড়িতে স্বতন্ত্র প্রার্থনা সভা শুরু করেন। কেশবচন্দ্র এই বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক পার্শ্বে মহিলাদের পর্দার বাইরে বসার স্থান নির্দিষ্ট করলেন। সাময়িকভাবে কেশবচন্দ্র ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিপন্মুক্ত হলেও অন্যান্য কারণে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং সংস্কারপন্থী নব্য ব্রাহ্মের দল ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি পৃথক সমাজ স্থাপন করেন। এই সাধারণ ব্র হ্মসমাজেব মহিলারা নারীসমাজকে বিদ্যাচর্চা ও সেবাকার্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১ আগস্ট 'বঙ্গমহিলা সমাজ' নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। মহিলা সমাজ পরিচালনার জন্য সভাপতি হন বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রাধারানী লাহিড়ী এবং সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করেন আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা বসু। সমাজের উদ্যোগে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মে 'ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়।

এই বঙ্গ মহিলা সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১২৯২ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্যোগে 'সখী সমিতি' নামে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও বিধবাদের শিল্প-শিক্ষার জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'একটি প্রস্তাব' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ থেকে সমিতির উদ্ভবের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এই সমিতির নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিরণ্ময়ী দেবী সমিতির যাবতীয় কার্য নির্বাহ করতেন। এই সমিতি সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবাদের প্রতিপালন এবং উপযুক্ত শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হয়, শিক্ষান্তে এই সমিতি নারীদের সবেতন অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে। সমিতির উদ্যোগে বিধবাদের অনাথ আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে বিধবা শিল্পাশ্রম গঠন করা হয়। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৫ পৌষ সমিতিব তত্ত্বাবধানে 'মহিলা শিল্পমেলা' অনুষ্ঠিত হয় এবং এই মেলায় সমিতির বালিকাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়। মেলায় লেডী ল্যান্সডাউন উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক উন্নতিবিধান-কল্পে 'ঢাকা শুভসাধিনীসভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধীনে

ঢাকায় একটি স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সভার সম্পাদক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়। একই বছরে 'ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভা আয়োজিত বাৎসরিক পরীক্ষায় সকল ছাত্রীই বৃত্তি লাভ করতেন। সরকার সভাকে ১৫০ টাকা অনুদান দিতেন। সভার সম্পাদক ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে 'বরিশাল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। এই সভাও বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করত এবং কৃতি ছাত্রীদের পারিতোষিক প্রদানে সম্মানিত করত। সভার সম্পাদক ছিলেন জগদ্বন্ধু লাহা। বিক্রমপুরে কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণকর্মের জন্য 'বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। একই সময় ঢাকা জিলায় 'পশ্চিম-ঢাকা হিতকরী সভা' নামে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকল্পে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভা স্থানীয় যুবকদের শরীর চর্চার ব্যবস্থা করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পৌর-ব্যবস্থার উন্নতি বিধান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার জন্য অতিরিক্ত সড়ক ও সেতু নির্মাণে কর্তৃপক্ষকে তৎপরতা গ্রহণে উদ্যোগী করে তুলতে চেষ্টা চালাতে থাকে। কবি রজনীকান্ত গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে নীতিজ্ঞান প্রচারের জন্য এই সভার পক্ষ থেকে সম্পাদক নিজের ব্যয়ে রামায়ণ-মহাভারত থেকে নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বন করে কবিতার আকারে প্রকাশ করতেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য ফরিদপুরে 'ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধিকাংশ সংগঠক কার্যোপলক্ষে কলকাতায় বসবাস করতেন, তবে সভার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সংগঠকগণের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়রত বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত মানুষ, কিছু স্থানীয় জমিদার এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আর্থিক ও অন্যবিধ সহযোগিতা করা এবং নারীসমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নীতি-নির্দেশ দেওয়া এই সভার অন্যতম কার্যক্রম ছিল।

উনিশ শতকে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য এই উদ্যোগ ও আয়োজন নারীসমাজকে দীর্ঘকালের হতাশা থেকে মুক্ত করে জাতীয় জাগরণের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

উপচ্ছেদ : সভাসমিতি পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাবিত সাহিত্য

উনিশ শতকে সভাসমিতির মাধ্যমে নারীজাতির সর্বাত্মক মুক্তির আহ্বান ধ্বনিত হলে বাঙালী সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নারীজাতির শিক্ষা, স্বাতন্ত্র্য ও

স্বাধীনতা দানের উদ্যোগ-আয়োজনকে সচেতন সমাজের একাংশ যেমন সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালেন তেমনি রক্ষণশীল সমাজের একটি গরিষ্ঠতম অংশ আশংকা ও আতঙ্কে বিভিন্নভাবে বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। নারীমুক্তির প্রশ্নে পারস্পরিক বিরুদ্ধতার রূপটি সমকালীন সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সমর্থন ও অসমর্থনের সূত্রে দুই বিরুদ্ধবাদী-গোষ্ঠীর সাহিত্যিক প্রয়াসের মধ্যে এযুগে স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যে সমর্থনের প্রশ্নটি দু'ভাবে এসেছে; প্রথমত ইতিবাচক স্বীকৃতি জ্ঞাপনের দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। ইতিবাচক স্বীকৃতির স্বরূপগত পরিচয় হল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ঘোষণা, সমাজকে সহানুভূতিশীল করে তোলা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাধীন নারীর স্বরূপ বর্ণনা করা। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন বা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পাঠ্যবিষয় বিন্যাস করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে এতাবৎ প্রচলিত বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য যুক্তিনির্ভর বিরুদ্ধতা ও পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। সমাজজীবনে অবজ্ঞাত এবং সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত নারীসমাজের সামনে এই শিক্ষার আলোকে মুক্তির তোরণদ্বার ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে লাগল। নারীসমাজের ব্যথা-বেদনা ও অবহেলা-বঞ্চনার সঙ্গে আশা-আশ্বাস এবং মহিয়সী মহিলাদের কীর্তিকথা ও বীর্যবত্তা স্থান পেতে লাগল সমকালীন সাহিত্যে।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে আন্দোলিত সমাজে অনুকূল ও প্রতিকূল মনোভাবের সঙ্গে আর একটি মধ্যবর্তী মনোভাবের পরিচয় এযুগের এক শ্রেণীর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় এই তৃতীয় শ্রেণীর মনোভাবের স্বরূপগত পরিচয় হল সামঞ্জস্যবাদী; এই মনোভাবের জন্ম আশংকা থেকে। নারীসমাজ মুক্তির আস্বাদ পেয়ে যাতে পুরুষের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না করে তাই নীতি-ধর্ম-আদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এক শ্রেণীর সাহিত্য অনেকাংশে সুভাষিতের ভূমিকা নিয়েছে।

নাটক ॥ সমকালীন বাংলা নাটকে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কিত আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। শ্যামাচরণ দাস দত্ত নিকোলাস রো এর 'দি ফেয়ার পেনিটেন্ট' নাটকের অনুবাদ করেন 'অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক' (১২৬৩) নামে। নাটকটি নিতান্ত স্ত্রীপাঠ্য। নাটকের নামপৃষ্ঠায় নারীসমাজের প্রতি উপদেশের ছলে বলা হয়েছে :

পাঠান্তে যদ্যপি হয় পতি প্রতি মতি।
সফল হইল শ্রম ভাবিব যুবতী ॥

পাশ্চাত্য শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী সমাজের নারীসমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির

নিদর্শন হিসাবে হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গকামিনী নাটক' (১৮৬৮) এবং জোড়াসাঁকো নাট্যশালা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 'হিন্দু মহিলা নাটক' (১৮৬৮) ও বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দু মহিলা নাটক' (১৮৬৯) উল্লেখযোগ্য। হিন্দু মহিলাদের অসহায় অবস্থার কথা নাটকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার উগ্র বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতের আমূল পরিবর্তন হওয়ায় প্রহসনটি পুনর্মুদ্রিত হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১২৮০) নাটকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করা হয়েছে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন শিক্ষা বাঙালী নারীর বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সমকালের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত তাঁর স্বরচিত 'অপূর্ব সতী নাটকে' (১৮৮৫) দেখিয়েছেন শিক্ষার ফলে বারবণিতা কন্যার চরিত্র সংশোধন। হরমণি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে মায়ের বারবণিতা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করেছে। স্ত্রীশিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য সুফল নাটকটিতে প্রদর্শিত হয়েছে। কোন অজ্ঞাতনামা লেখকের 'মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসন'-এ (১২৮১) স্ত্রীস্বাধীনতাকে উপহাস করা হয়েছে। অমৃতলাল বসু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে আদৌ সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর 'বিবাহ বিভ্রাট' (১২৯১) প্রহসনে পণপ্রথার কুফল প্রদর্শিত হলেও প্রসঙ্গত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। বিলাসিনী কারফরমার চরিত্রটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অমৃতলালের 'তাজ্জব ব্যাপার' (১২৯৭) প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে স্ত্রী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আতঙ্ক প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষকে এই পরিবর্তনে অন্তঃপুরচারী ও শিশুর প্রতিপালক রূপে দেখান হয়েছে।

উপন্যাস ॥ বাংলা উপন্যাসে সমাজমুখীনতার শর্তে প্রাসঙ্গিক ব্যাপার হিসাবেই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয় এসেছে। কিছু উপন্যাস লিখিত হয়েছে স্ত্রীপাঠ্যোপযোগী করে। এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলি স্ত্রীজাতির গ্রহণযোগ্য নীতি-আদর্শের কিছুটা প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। আখ্যান জাতীয় যেসব রচনায় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সমর্থিত হয়েছে সেগুলি উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীপাঠ্য রচনায় পরিণত হয়েছে। ব্রজনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'সরোজ-বাসিনী' ও 'কনকনলিনী' (১২৯০) দু'খানি স্ত্রীশিক্ষামূলক উপন্যাস। কালীময় ঘটকের 'ছিন্নমস্তা' (১৮৭৮) স্ত্রীশিক্ষামূলক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক ভাবে নারীমুক্তির কথা ঘোষিত হয়েছে। প্রফুল্ল সামাজিক কারণে স্বামী ও শ্বশুর পরিত্যক্তা হয়েও প্রধানত শিক্ষার গুণেই আপন ভাগ্যকে জয় করে দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হয়েছে এবং পরিশেষে সমাজ সংসারে পূর্ণ মর্যাদায় স্থান পেয়েছে।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রচিত 'মনোরমা' (১২৭২) আখ্যানধর্মী রচনা হলেও উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 'আদর্শ নারী Or Model Women' (১২৯১) আখ্যানমূলক রচনা। দেশীয় স্ত্রীলোকগণ যাতে শিক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনে উদ্যোগী হয় সেই জন্য গ্রন্থটিতে দেশ ও বিদেশের মহিয়সী মহিলাদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধ ॥ সমকালীন প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে বহু চিন্তাশীল অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক (১৮২২) প্রবন্ধ গ্রন্থটি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গ্রন্থটির প্রথমভাগে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিবৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগটি প্রাচীন ভারতের বিদুষী রমণীর পরিচয়জ্ঞাপক। তারাশঙ্কর তর্করত্ন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০) প্রবন্ধ গ্রন্থের চারখণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বহু তথ্য বিন্যাস করেছেন। সমাজ ও দেশের কল্যাণচিন্তা থেকেই তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩) যদিও পতিব্রতা রমণীর প্রতি সামাজিক ও নৈতিক উপদেশাত্মক প্রবন্ধ গ্রন্থ, তথাপি গ্রন্থটিতে এদেশে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধ যুক্তিপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থটি স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি সমর্থনজ্ঞাপক। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) পতি ও পত্নীর মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। নারী জাতির নৈতিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। বঙ্গদর্শনের লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'কুঞ্জলতার মনের কথা' প্রবন্ধ পুস্তিকায় নারীজীবনের অন্তর্বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটিতে নরীমুক্তির প্রশ্নে সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

কাব্য-কবিতা ॥ উনিশ শতকের অন্যতম বিতর্কিত প্রশ্ন স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বাংলা কাব্য-কবিতায় অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিতায় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়কে দ্বিবিধ মনোভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। দেশীয় ভাবধারায় লালিত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে তিনি সমর্থন করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে তাই তিনি লিখেছেন :

> "আহা, স্ত্রীলোকেরা জ্ঞান শিক্ষাকরণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমাদের ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, আমরা যদ্যপি গৃহবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ইত্যাদি অনিষ্ট হইবার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার মূলীভূত বলিয়া

স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারা বিদ্যাবতী হইলে ঐ সকল অনিষ্ট অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে৹ আর সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয়।"[১১]

এ প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'-এ (১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দ ২৮ মে) প্রকাশিত তাঁর কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার্য :

"বোন, মূর্খ হোয়ে এমন কোরে
বাঁচতে নাহি চাই লো।
ছি, মরতে গেলে নাহি মেলে
যমের বাড়ী ঠাই লো॥"[১২]

ইংরেজী ভাবধারায় পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষার তিনি ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন। এই শিক্ষায় স্ত্রীলোকের দেশীয়-চরিত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকেই তাঁর কবিতায় বিরুদ্ধা-চরণ প্রকাশিত হয়েছে :

লক্ষ্মী মেয়ে ছিল যারা
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া।
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে থোড়া থোড়া॥
এরা পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে সেজেগুজে সভায় যাবে।
ড্যাম্ হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডি খাবে॥
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখতে পাবেই পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥

তাই অন্যত্র তাঁর কবিতায় স্ত্রীগণের অবিদ্যাও শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে :

বিদ্যা-বলে অবিদ্যার অপরূপ ক্রিয়া
মূর্খ হয়ে বেঁচে থাক আল্পনা দিয়া॥

রূপচাঁদ পক্ষী (রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র) তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় পাশ্চাত্য রীতির স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে৹ ঘোমটা দেয়না মাথায় টেনে
চিঠি লিখে লোক আনে, মানে না গুরুজনায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬২) উনিশ শতকের নারী জাগরণকেই প্রকারান্তর দ্ব্যর্থহীন ভাবে সোচ্চার করেছেন। এই কাব্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আলোকে পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হয়েছে। তাদের স্বাধীন সত্তার কুণ্ঠাহীন প্রকাশে নারীজীবনের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। সমকালীন রক্ষণশীল সমাজের কাছে বীরাঙ্গনা কাব্য সমাগত নারীমুক্তির সংকেত বহন করে এনেছে।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় উদ্যোগী সভাসমিতি পরিচালিত কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে নানা প্রকার কারিগরি বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই কারিগরি বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে সূর্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'চিত্তসন্তোষিনী' (১৮৭০) কাব্যের একটি কবিতায় লিখেছেন :

অন্দরেতে জুতো সেলাই হয়েছে বিধান।
হিঁদুর নারী শিল্প শিখে, বিবি বেতন পান॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবিধ কবিতা' (১৩০০) নামে সঙ্কলিত গ্রন্থে 'বাঙালীর মেয়ে' কবিতায় স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে :

রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া, গাড়ী মুদে যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া,
বাসর ঘরে ঝুমুর-কবি চোখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হলে পিস্‌শাশুড়ি ঘোমটা মুখে চেয়ে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে হেমচন্দ্রেরও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর 'বাঙালীর মেয়ে' কবিতাটি ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'বিবিধ কবিতা' নামক সংকলন গ্রন্থে স্থান পেলেও কবিতাটি বহু পূর্বে রচিত। কারণ, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা সফল-স্নাতক পরীক্ষার্থিনীর গৌরব অর্জন করায় হেমচন্দ্র তাঁর 'বাঙালীর মেয়ে' কবিতা রচনাকালীন মনোভাবের পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে পরীক্ষার্থিনীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রশংসাব্যঞ্জক একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙালীর মেয়ে,"
তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চির সুখে আর
কে বলেরে বাঙালীর জীবন অসার?
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'ভারতমঙ্গল' (১৮৯৪) কাব্যের পঞ্চম সর্গে নারীগণকে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করার জন্য খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে :

অবরুদ্ধা অন্তঃপুরে পিঞ্জর মাঝারে।
বিহঙ্গ শাবক-সম বঙ্গ কুলবালা
অসহায় জ্ঞানহীনা চির অন্ধকারে।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে আলোড়িত সমাজমানসের রূপটি সমকালীন সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

১. A Rapid Sketch of the life of Raja Radhakanta Deva Bahadur with some notices of his ancestors and testimonials of his character and learning by the editors of the Raja's Sabda-kalpadruma—published in 1859, p. 19
২. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (নিউ এজ সংস্করণ ১৯৫৭) পৃ: ১৭৩
৩. J. C. Bagal—Women's Education in Eastern India, p. 26.
৪. Ibid—p.38.
৫. Rev. James Long—Hand Book of Bengal Missions, published in 1848, p. 439-40.
৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৯৪ শক, ৩৪৭ সংখ্যা—স্ত্রীজাতির অধিকার ও স্ত্রীস্বাধীনতা।
৭. ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ শক, ৩৯৪ সংখ্যা—স্ত্রীশিক্ষা।
৮. Report on Public Instruction for 1876-77, p. 269-দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলার নব্যসংস্কৃতি, বিশ্বভারতী সং, ১৯৫৮, পৃ. ৭৭
৯. যোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলার নব্যসংস্কৃতি, পৃ. ৭৬
১০. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি. পৃ.১৩৮
১১. সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ ৭ আগস্ট।
১২. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ মদ্যপান ও বারাঙ্গনাবিলাস-বিরোধী আন্দোলনে সভাসমিতি ॥

উনিশ শতকের উষালগ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রিক কলকাতার নগরজীবনে একশ্রেণীর মানুষের হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাগম ঘটে। তাঁদের বিদ্যা-বিত্তের বংশগত বা পারিবারিক পূর্ব ঐতিহ্য কিছুই ছিল না। তাঁরা ইংরেজ-প্রভুদের সংস্পর্শে এসে কিছু ব্যাকরণ-বিহীন ইংরেজী শব্দ এবং বিষয়কর্ম পরিচালনার উপযোগী কিছু পারসী-বিদ্যা অর্জন করেন। এই 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী', বংশগৌরব ও পারিবারিক ঐতিহ্যবিহীন এক শ্রেণীর নাগরিক হঠাৎ অর্থানুকূল্যে ভারসাম্যচ্যুত হয়ে কতকগুলি কুৎসিত আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে; মদ্যপান ও বারাঙ্গনাবিলাস তার মধ্যে অন্যতম। আভিজাত্যের অপকৃষ্ট চেহারা-চরিত্র নিয়ে এঁরা সমকালীন সমাজে 'বাবু' নামে অভিহিত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী এই বাবু সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন:

> "এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকা যোগে আমোদ করিতে যাইত।"[১]

এই বাবুদের স্থিতিকাল ক্ষণস্থায়ী হলেও 'বাবু-কালচার' সমাজদেহে যে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে দিয়ে গেল তা' উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির পথ বেয়ে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির আকারে বিরাজ করতে লাগল।

উনিশ শতকে বাঙালী জীবনের জড়ত্বমোচন ও চিৎ-প্রকর্ষ সাধনে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির যেমন গৌরবময় অবদানের একটা দিক্ আছে তেমনি অপর দিকে নৈতিক মানের অবনমন ঘটাতে এবং সমাজের বুকে ক্লেদ-পঙ্কিলতা সৃষ্টিতেও একটা ভূমিকা আছে। এই শতকে রুদ্ধ-দ্বার বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রবল প্রবাহ দুর্বার গতিতে এসে আঘাত করায় বাংলার সামাজিক স্থিতিশীলতা বিপর্যস্ত হল, দেশ ও জাতির নৈতিক ও চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য এবং চিরায়ত মূল্যবোধের উপর এল প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাতে সৃষ্ট দুষ্ট ক্ষত ইতস্তত: ভাবে সামাজিক সাধারণের মধ্যে দেখা গেলেও সমকালীন যুবজনের মধ্যে তা' আতঙ্কজনক রূপ নেয়। মদ্যপান,

বারাঙ্গনাবিলাস সেই সামাজিক দুষ্ট ক্ষতের রূপ এবং সেগুলি উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাঙালীর জাতীয় জীবনের দীর্ঘকাল-পোষিত নৈতিক মানকে বিপন্ন করে তুলল। সমকালীন ইয়ংবেঙ্গল সমাজের কাছে মদ্যপান হল সংস্কার-মুক্তির উপায় এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে অগ্রগমনের উপযুক্ত পদক্ষেপ। সেই সময়ে 'হিন্দুকলেজ কালচারে'র অন্যতম অঙ্গই ছিল মদ্যপান। এ বিষয়ে যে যত বেশি দুঃসাহস দেখাতে পারত সে সংস্কারের শৃঙ্খল মোচনে ততোধিক সমর্থ বলে বিবেচিত হত। মদ্যপান যে কোন অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন বোধই তাদের ছিল না। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে সমকালীন ছাত্রসমাজের মদ্যপান সম্পর্কে বিশেষ প্রবণতার একটি বর্ণনা দিয়েছেন :

> "তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি ও আমার সহচরেরা এরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম।"[২]

তাদের মদ্যপানের পিছনে যুক্তি হল সংস্কারের শৃঙ্খল মোচনে ও সভ্যতার সোপানে আরোহণের শক্তি সরবরাহ করবে সুরা। কিন্তু এই সুরা সংস্কারের শৃঙ্খল মোচনে শক্তিরস হিসাবে ব্যবহৃত হোক বা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা পরিপাকের জন্য পাচকরস হিসাবেই ব্যবহৃত হোক, ক্রমশ সুরা-সুরধুনীর প্রবাহের সঙ্গে সমাজদেহে নীতি-বিগর্হিত অসামাজিক ভ্রষ্টাচার এসে জমতে লাগল। এই মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক ভ্রষ্টাচারিতা থেকে সমাজ কোন সময়েই একেবারে মুক্ত ছিল না, কিন্তু এগুলিতে আসক্ত ব্যক্তিরা সমাজের বুকে স্পর্ধিত পদসঞ্চার না করে ভূমিতলচারী সরীসৃপবৃত্তি অবলম্বন করে অন্ধকারে আশ্রয় খুঁজত। এই খানেই উনিশ-শতকীয় পানভোজন ও ভ্রষ্টাচারিতা থেকে পূর্বের স্বাতন্ত্র্য।

এই যুগে নেশার ঘোরে আত্মসম্মান, বংশমর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য প্রভৃতি ভুলে সমাজের বহু মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সন্তান ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। আর্থিক অপচয়ের ফলে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর কলহ, সম্পত্তি নাশ, ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি পারিবারিক বিপর্যয় এবং মদ্যপানের ফলে চারিত্রিক স্খলন ও রোগ-ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যু বহু ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনল। পানশালাগুলির কাছাকাছি বহু বারাঙ্গনালয় গড়ে উঠতে লাগল এবং সমাজের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পানাসক্তি ও আনুষঙ্গিক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করে পরিশেষে বিবাহিত স্ত্রীকে পর্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে বারাঙ্গনালয়ে কুৎসিত ও অসামাজিক জীবন যাপন করতে লাগল। 'বাবু কালচার' ও 'হিন্দু কলেজ' কালচারের অপকৃষ্ট দিকটির তুলনামূলক আলোচনায় রাজনারায়ণ বসু তাঁর বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ-

শক্তির সাহায্যে মাত্রাগত পার্থক্যটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করেছেন :

> "যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি পাইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্য রূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত ; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যা সংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্ব্বে গ্রামের প্রান্তে দুই এক ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত ; এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা কি সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।"[৩]

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এই শতকের সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরা সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে মদ্যপানের ভূমিকাই সর্বাধিক বলে গণ্য করেছেন। তাই এই সময়ে তাঁদের উদ্যোগে একাধিক মদ্যপান-বিরোধী সভাসমিতি গড়ে উঠেছে। এগুলি ছাড়াও বহু ব্রাহ্মসভা ও জনহিতকর সভা মদ্যপান ও বারাঙ্গনা বৃদ্ধি জনিত সামাজিক সমস্যার প্রতি সরাসরি আঘাত হানার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশের ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান তত্ত্ববোধিনী সভা ধর্ম প্রচারের সঙ্গে দেশ ও জাতির নৈতিক পুনরুজ্জীবনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মদ্যপান ও বারাঙ্গনাবিলাসের বিরুদ্ধে একাধিক সংবাদ প্রকাশ করে সামাজিক সচেতনতা-বোধ জাগিয়ে তুলতে এবং দেশবাসীকে এই সব কদর্য অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পুনঃপুনঃ আবেদন জানাতে থাকে। এই পত্রিকার শ্রাবণ ১৭৭২ শক, ৮৪ সংখ্যায় 'পানদোষ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধের একাংশে বলা হয়েছে :

> "ইংরাজ জাতির এদেশ অধিকার হইবার পূর্ব্বে সাধারণরূপে মদ্য-ব্যবহার কতিপয় নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল ; কিন্তু এইক্ষণে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরদের মধ্যেও সুরাপান অধিক দৃশ্য হয় ; বিশেষত নব্য সম্প্রদায়ী প্রায় তাবৎ বিদ্বান্ ও ধনি যুবককে ইহাতে সাতিশয় লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এবম্প্রকারে বিদ্বান্বর্গের দ্বারা মদ্যের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়া এবং ধনি বাবুদিগের দ্বারা তাহা সম্মানে গৃহীত হইয়া তদীয় সমূহ

দোষ সত্ত্বেও সাধারণের আদরণীয় হইয়াছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে এই ক্ষণিক সুখদ অথচ বহু দুঃখদ গরল-পানে অনেক মনুষ্য বুদ্ধিভ্রষ্ট ও নানা প্রকার লাঞ্ছনা বিশিষ্ট হইয়া অবশেষে ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে।...এতদ্ভিন্ন মদিরার অন্য এক দুর্জ্জয় প্রভাব এই, যে তদ্দারা মনুষ্যের বুদ্ধিনাশ হইয়া কুকর্ম্ম সাধনের দুই প্রধান প্রতিবন্ধক যে লজ্জা আর ভয় তাহা সম্যক্‌রূপে অন্তর্হিত হয়, তাহাতে আমারদিগের মনোগত যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠে, এবং স্ব স্ব ক্ষমতা প্রকাশে পূর্ণ উৎসাহ প্রাপ্ত হয়।"

পত্রিকাটির শ্রাবণ ১৭৬৮শক, ৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে কলকাতার বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে বারাঙ্গনা বৃদ্ধিজনিত উদ্ভূত সমস্যার উল্লেখ করে এই অবস্থার বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে :

"বেশ্যাগমন পাপ এইক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্ত্তী, অতি দীন পর্য্যন্ত এই দুষ্কর্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কর্ম্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করে না—আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না।"

সামাজিক হিতচিন্তায় নিযুক্ত সভাসমিতিগুলির মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (২০ এপ্রিল, ১৮৫৫) এবং নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ) সে যুগে বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট সমাদর অর্জন করেছিল। বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা এই সভার উদ্দেশ্য হলেও সমাজসেবার আদর্শও বিশেষভাবে গৃহীত হয়। সভার বিভিন্ন সময়ে সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু, রাধানাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখ। সভার সভ্যগণের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সভার আহূত অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা হত। এই সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনার জন্য এবং পাদরি লঙ্‌কে ইংরেজিতে 'নীলদর্পণ' নাটক অনুবাদের জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় পাদরি লঙ্‌কে নীলদর্পণ অনুবাদ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কারাবাসে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সেই অর্থদণ্ড পরিশোধের দায়িত্ব নেয়। এই সভা বিধবাবিবাহে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিবাহকারীকে অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করত।

সমাজের নৈতিক অবনতির দিকেও এই সভার দৃষ্টি প্রখর ভাবে জাগরূক ছিল। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বারবণিতার সংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যায় এই সভা গভীর-ভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। কেবল কলকাতা নয়, সমগ্র বাংলাদেশের যুবসমাজের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনে শংকিত হয়ে এই সভা অবিলম্বে এর প্রতিকার কল্পে বারবণিতাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নির্দেশ করার জন্য 'ব্যবস্থাপক সভা'র কাছে আবেদন পাঠায়। ১৯ নভেম্বর ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত আবেদনটি নিম্নরূপ :

"প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগর প্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট জন্য লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সলে আবেদন করিবেন, আবেদনপত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের বিদিতার্থ প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

নগরপ্রান্তে বেশ্যাগণ বসতিকরণ কারণ বঙ্গদেশবাসিগণের ভারতবর্ষীয় লেজিস্‌লেটিব কৌন্সলে আবেদন।

মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসীগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তি-রক্ষা ও কুরীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে তাহা বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহাব সন্দেহ নাই, নগরির যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয় কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীত বাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ-করণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্য দ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারযোষাগণের নিমিত্তে হয় কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃ-কালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি

প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতে অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে, অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য-বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগরবাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যত্তপি রাজা হইয়া প্রজা-দিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকারূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতিপূর্ব্বে সোনাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থান ছিল অত্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি তজ্জন্য নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ জন্য সভ্য মহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট করুন যদ্দারা আমাদের ইপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগতভৃত্য

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

পতিতালয় ও পতিতার সংখ্যাবৃদ্ধি যথেষ্ট সামাজিক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল বলেই এই সমস্যা থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবার জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা সরকারী হস্তক্ষেপের প্রার্থনা জানিয়েছিল।

মদ্যপানের প্রসার ও তার ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকলে কেবল এই সংকট মুক্তির জন্য রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরে স্কুলে শিক্ষকতা কালে 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সভাকেই মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনের জন্য স্থাপিত প্রথম সভা বলে দাবী

করেছেন।[8] কিন্তু এই দাবী কার্যত ঠিক নয়। কারণ, ইউনিট্যারিয়ান পাদরি রেভারেণ্ড সি. এইচ. ডল ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় মদ্যপান-বিরোধী একটি শক্তিশালী সভা গড়ে তোলেন এবং শুরুতেই এই সভার আট শতাধিক সদস্য সংগৃহীত হয়।[৫] রাজনারায়ণ স্থাপিত সুরাপান নিবারণী সভার জন্য মেদিনীপুর স্কুলের হেডপণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী মদ্যপানের বিপক্ষে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন তৎকালীন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও রাধাকান্ত দেবের পুত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর। পূর্বে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের বাড়িতে স্থানীয় মদ্যপায়ীরা মদ্যপানের জন্য সমবেত হতেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ঐ সভার সভ্য হওয়ায় রাজনারায়ণ ও তাঁর সভা মাতালদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা স্কুল ইনস্পেক্টর এইচ. এল. হ্যারিসনের কাছে রাজনারায়ণের নামে স্কুলের সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মিথ্যা অভিযোগ আনেন। অবশ্য এই অভিযোগ কোন গুরুত্ব পায়নি।

রাজনারায়ণের এই মদ্যপান-বিরোধী সভা স্থাপনের পর সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী এই আন্দোলন সম্প্রসারিত করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ প্যারীচরণ সরকার। শিক্ষিতজনের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রসারে বিভিন্ন আধিব্যাধির সৃষ্টি, পারিবারিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় এবং নৈতিক চরিত্রের ক্রমাবনতির ফলে সামাজিক অবক্ষয় প্যারীচরণকে ভীষণভাবে বিচলিত করেছিল তাছাড়া প্যারীচরণের এক অগ্রজ সহোদর অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে বিপথগামী হয়ে পরিবারের মর্মান্তিক পরিতাপের কারণ হন। এই সকল প্রতিক্রিয়া প্যারীচরণকে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেছিল। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর প্যারীচরণ 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' (The Bengal Temperance Society) স্থাপন করেন।* এই সভার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন স্বয়ং প্যারীচরণ এবং সহকারী পদে নিযুক্ত হন বাবু নীলমণি চক্রবর্তী ও বাবু হরলাল রায় বি. এ.। এছাড়া ঐ সভার পক্ষে প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ন, পত্রাদি রচনা ও পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে সহায়তা করবার জন্য বাবু দীননাথ ধর, বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু, বাবু প্রসন্নকুমার গুপ্ত, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৌলভি সৈয়দ জায়নুদ্দিন হোসেন, বাবু বীরেশ্বর মিত্র এম. এ., বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সভা স্থাপনের ছ'মাস পরে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে ২৪ মে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজের পক্ষে একটি মহতী জনসভা আহ্বান করেন। এই সভায়

* পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ First Report of the Bengal Temperance Society প্রদত্ত হল।

সভাপতিত্ব করেন রেভারেণ্ড সি. এইচ. ডল সাহেব। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আজিমুদ্দিন খাঁ, হাইকোর্টের বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, বাগ্মী কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভায় উপস্থিত হতে না পারায় একটি সহানুভূতি সূচক পত্র প্রেরণ করেন :

> "....I therefore hail with joy the inauguration of society in this city which aims at the disruption of one of the most fertile sources of crimes, corruption and wretchedness in our country. I shall take the deepest interest in its progress and give my cordial concurrence to all measures it may adopt for the eradication of this dreadful vice and the reclaiming of those who have succumbed to its influence."[৬]

এই সভার পক্ষ থেকে তিন প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হয় এবং সভ্যপদ গ্রহণকারীকে যে কোনও একটিতে স্বাক্ষর করতে হতো। প্রতিজ্ঞা পত্রত্রয় নিম্নরূপ :

১. আমি কখনও সুরাপান করিব না বা সুরাপানে প্রশ্রয় দিব না।

২. যথার্থ ঔষধরূপে ব্যতীত আমি অপর কোনও কারণে সুরাপান করিব না বা সুরাপানে প্রশ্রয় দিব না।

৩. ধর্মাচরণ রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত অপর কোনও কারণে সুরাপান করিব না বা সুরাপানে প্রশ্রয় দিব না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিজ্ঞাপত্রে যথাক্রমে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহারকারী ও তন্ত্রাচারে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্য নিয়মের কঠোরতা কিছুটা হ্রাস করা হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আহূত সভার পর এক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের চৌষট্টিটি স্থানে মূল সভার শাখা স্থাপিত হয়। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বরাহনগর এবং বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত মেদিনীপুর শাখা-সমিতি ঐগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলেও ক্রমশ এই শাখা-সমিতি বিস্তার লাভ করে।

সভার পক্ষ থেকে ইংরেজিতে 'ওয়েল উইশার' এবং বাংলায় 'হিতসাধক' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হিতসাধক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত

মদ্যপানের কুফল প্রসঙ্গে পরিবেশিত প্রবন্ধগুলির একটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

> "সুরার অনিষ্টকারিতা সকলেই সর্ব্বদা সচক্ষে দেখিতেছেন এবং অনেকেই যাবজ্জীবন তজ্জন্য জর্জরিত হইয়া রহিয়াছেন। এক জনের পান দোষে এক এক পরিবার ধনশূন্য, মানশূন্য, গৃহশূন্য এবং অন্নবস্ত্রশূন্য হইয়া দিবানিশি দৈহিক ও মানসিক অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন, এবং জীবনের সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া জীবন-নাশকেই সুখের একমাত্র উপায় মনে করিয়া মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছেন। এই প্রকার ক্লিষ্ট কত শত ভদ্র সন্তানকে আমরা রাজপথের পয়ঃপ্রণালীর ধারে মৃতপ্রায় পতিত থাকিতে দেখি।....কত শত সৎস্বভাব পতিব্রতা সতী পানোন্মত্ত পিশাচবৎ স্বামীর পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া লম্পট প্রতিবেশীর কুমন্ত্রণায় কুলে ও সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া ব্যভিচারিণী হইতেছে।"
>
> —হিতসাধক, বৈশাখ, ও জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৭৫ সাল ; পৃ. ৯৩-৯৪

ওয়েল উইশার এবং হিতসাধক—এই দুই পত্রিকার প্রচ্ছদ চিত্র হিসাবে একটি 'মাদক সেবন বৃক্ষ' মুদ্রিত থাকত। বৃক্ষটি মদ্যপানের ভয়াবহ পরিণতির একটি রূপক চিত্র। পাপ-প্রবৃত্তি, চিত্তদৌর্বল্য ভোগলালসা, কুসংসর্গ, অসৎদৃষ্টান্ত ও ইন্দ্রিয় প্রাবল্য ঐ বৃক্ষের মূল ; দারিদ্র্য, কর্তব্যবিমূঢ়তা, দুষ্ক্রিয়াসক্তি, রিপুপ্রভুত্ব, বুদ্ধিভ্রংশতা ও রুগ্‌ণতা বৃক্ষের শাখা ; মনস্তাপ, অপমান, ক্রোধ, ব্যভিচার, আত্মহত্যা, অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু ঐ শ্রীহীন অথচ সতেজ বৃক্ষের ফল ; বৃক্ষ-পাদমূলে জলসিঞ্চনকারী শয়তান ; বৃক্ষটিকে কুঠার দ্বারা ছেদনকারী কঙ্কাল শরীর মৃত্যু এবং পরমেশ্বর বৃক্ষের শীর্ষে রোষাগ্নি বর্ষণরত।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচরণের জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুশোকে মানসিক ও শারীরিক দুরবস্থার জন্য ঐ দুই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সভার কাজে ভাঁটা পড়েনি। মদ্যপানজনিত সামাজিক ক্ষতি পরিমাপের জন্য এই সভার উদ্যোগে রেভারেণ্ড ডল, আর. স্কট্ মানক্রিয়েফ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ঔষধালয় থেকে মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করার জন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সেই আবেদনে তেমন সুফল ফলেনি। প্যারীচরণ কিন্তু হতোদ্যম না হয়ে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ সভার সভ্যদের কাছে মাদক নিবারণের সূত্র সন্ধানের জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করে 'Tree of Intemperance' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই সব বহুমুখী প্রচেষ্টায় অবশেষে

সরকার ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে আবগারী আইনের ধারায় (43 of Act VII of 1878) ডাক্তারের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ঔষধালয় থেকে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

প্যারীচরণের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরও এই সভা জীবিত ছিল। কিছু দিন আনন্দমোহন বসু ও ভুবনমোহন সরকার সভার সম্পাদকেব কার্য পরিচালনা করেন। প্যারীচরণের মাদক-নিবারণী সমাজ সে যুগে সামাজিক পরিবর্তনে যে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল তা' বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'It set the tide of public opinion against intemperance'[৭]। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন তাঁর ছাত্রাবস্থায় প্যাবীচরণ ও তাঁর মাদক-নিবারণী সমাজকে কেন্দ্র কবে সেই সময় একটি গান বহুল প্রচারিত হয়েছিল :

"মধুপান আর কবো না
প্যারীচাঁদ করেছে মানা। ইয়ংবেঙ্গল আব বাঁচবে না।
খাড়া বড়ি থোড়ের নাড়ী
তাতে হলে বাড়াবাড়ি
অগ্নি যাবে যমের বাড়ী, কাল বিলম্ব আব সবে না।
যে মদেতে হবিশ ম'লো
যাতে গুপ্ত লুপ্ত হ'লো
সে মদ পান কবো না ভাই।—
কিন্তু ডাঙ্গা পথে নাইকো মানা।

শেষ পদে বোঝা যায়, এই গানটি কোনও গঞ্জিকা ভক্ত কবির রচনা, 'ডাঙ্গা পথ' অর্থে গাঁজার পথ।"[৮]

প্যারীচরণেব মৃত্যুব পর তাঁর প্রবর্তিত মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ইতিপূর্বে কলকাতাব অনতিদূরে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' বিভিন্ন জনহিতকব কাজকর্মে লিপ্ত থেকে প্যারীচরণেব মাদক নিবারণী সমাজের অন্যতম সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ কবে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। সভার বিভিন্ন শাখাব মধ্যে মদ্যপান নিবারণ শাখা ছিল অন্যতম। হিতকরী সভার প্রথম বাৎসবিক বিবরণী থেকে মদ্যপান নিবারণে বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজের শাখা হিসাবে এই সভার ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায় :

When the prospectus of the Bengal Temperance Society inaugurated at Calcutta by Baboo Peary Churn Sircar

reached ootterparrah Hitokory Shova erewhile most painfully witnessing the baneful effects produced in this Town by the use of intoxicating liquors, roused itself to action and co-operated with the main society in their objet to arrest the progress of this growing evil.'[৯]

এই সভা প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে মদ্যপান-নিবারণ বিষয়ক শাখা-সমিতির অধিবেশনে উদ্দিষ্ট কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করত এবং নিয়মিত প্যারীচরণ প্রতিষ্ঠিত সভাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করত।

কলকাতার নিকটবর্তী বরাহনগর অঞ্চলে বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭ মার্চ 'বরাহনগব মদ্যপান নিবারণী সমিতি' গঠন করেন। সমিতির সম্পাদক ছিলেন শশীপদ নিজে। তিনি মদ্যপানের কুফল প্রচারের জন্য স্থানীয় মদ্যপায়ীদের গৃহে ও পানশালাগুলিতে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হতেন। এজন্য তাঁকে বহু অপমান ও কুৎসিত মন্তব্য সহ্য করতে হত। পানশালাগুলির আড্ডা ভাঙবার জন্য তিনি পাঠাগার স্থাপন করেন। তাঁর অদ্ভুত প্রচার ক্ষমতায় বহু মদ্যপায়ী মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং সমিতির শপথ গ্রহণ করে এই গ্রন্থাগারে নিয়মিত উপস্থিত হতে থাকেন। শশীপদ প্রতিষ্ঠিত মদ্যপান নিবারণী সমিতি সম্পর্কে Anglo-Indian Temperance Association-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ডবলিউ. এস. কেইন-এর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

In 1864 Mr Banurji established the Barahanagar Temperance Society, now in the Working Men's Club, one of the oldest Temperance organisation of India. During the first year of its existance, upward of the twenty young men were, by Mr. Banurji's rare powers of influence, rescued from paths of intemperance and vice."[১০]

শশীপদ মদ্যপান সমস্যার মূলে আঘাত করার জন্য তাঁর কর্মক্ষেত্র বারাহনগরের বোর্নিও কোম্পানির চটের কল অঞ্চলের শ্রমজীবী সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হন। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং

আরও ব্যাপক উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রমজীবী সঙ্ঘ' (Working Men's Club)-গড়ে তোলেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র 'ভারত শ্রমজীবী' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রে পরিচালনার জন্য শশীপদ নিজে সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে এবং বাবু কালীকৃষ্ণ দত্তকে সম্পাদক মনোনীত করে 'বরাহনগর আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা' স্থাপন করেন। সভার উদ্যোগে স্থানীয় শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'সানডে স্কুল' নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়টি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—একটি শ্রেণীতে বয়স্ক ছাত্ররা এবং অপরটিতে শিশুরা শিক্ষালাভ করত। ছাত্ররা পূজাবকাশের পর নিজ নিজ অভিভাবকের কাছ থেকে তাদের আচরণ সম্পর্কে চিঠি নিয়ে আসত এবং তার ভিত্তিতে তাদের পুরস্কৃত করা হত।

মদ্যপান নিবারণে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর 'ভারত সংস্কার সভা'র ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ বৎসর ২ নভেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং ঐ সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ভারত সংস্কার সভা' (Indian Reform Association) স্থাপনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারসাধনে ব্রতী হন। সভায় সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে কেশবচন্দ্র সেন ও গোবিন্দচন্দ্র ধর। দ্বিতীয় বৎসরে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ঐ সভার যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হন।

ভারত সংস্কার সভা বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঁচজন সম্পাদকের পরিচালনাধীন পাঁচটি বিভাগ স্থাপন করে। মাদক-নিবারণী বিভাগের দায়িত্ব প্রথম বৎসরে যাদবচন্দ্র রায় বহন করেন এবং দ্বিতীয় বৎসর থেকে কানাইলাল পাইনের উপর সেই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। মদ্যপানের ফলে সামাজিক জটিলতা ও নৈতিক মানের অবনতি থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এই বিভাগের পক্ষ থেকে নিয়মিত মদ্যপানের কুফল বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ ও বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিভাগের পক্ষ থেকে 'মদ না গরল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। পত্রিকাটিতে মদ্যপানের কুফল বিষয়ে গদ্যে ও পদ্যে বহু রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। রচনাগুলির অধিকাংশ শিবনাথ নিজে লিখতেন। কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে মদ্যপানের বিরুদ্ধে ভারত সংস্কার সভার পক্ষ থেকে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'আশার দল' (Band of Hope) নামে সংগঠন স্থাপিত হয়। সভার উদ্যোগে মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে বহুব্যক্তির স্বাক্ষরসম্বলিত একটি আবেদন পত্র বড়লাটের নিকট প্রেরিত হয়। ইতিপূর্বে প্যারীচরণ সরকারের বঙ্গীয় মদ্যপান

নিবারণী সমাজের পক্ষ থেকে অনুরূপ উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই ভাবে যৌথ উদ্যোগের ফলেই আবগারী আইনের এক বিশেষ ধারা (43 of Act VII of 1878) অনুযায়ী মাদক দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারত সংস্কার সভা পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করলেও পতিতাবৃত্তি যে একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা সে সম্পর্কেও সচেতন ছিল। তাই এই সভা পতিতাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করে।

বিভিন্ন সভাসমিতি মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-বিলাসের মতো জঘন্য সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে উনিশ শতকে যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাতে সমাজ সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হয়েছিল একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু সেই ব্যাধির দ্রুত প্রসার যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা অনেকাংশে প্রতিহত হয়েছিল একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় যেমন এই মদ্যপান ও বারাঙ্গনা সমস্যার মতো ক্লেদপঙ্কিলতায় আবিল তেমনি এর বিরুদ্ধে সভাসমিতিগুলির আন্দোলন সেই অধ্যায়ের আবিলতা-মুক্তি প্রচেষ্টার উজ্জ্বল আর এক দিক্।

উপচ্ছেদ : মদ্যপান ও বারাঙ্গনাবিলাস বিরোধী আন্দোলন ও সাহিত্য

উনিশ শতকে মদ্যপান ও বারাঙ্গনা সমস্যার ব্যাপকতা সামাজিক ও নৈতিক স্থিতি-শীলতাকে যেমন গভীর ভাবে বিচলিত করেছিল তেমনি এই সমস্যা-বিরোধী আন্দোলন সচেতন যুগমানসকেও সমভাবে আলোড়িত করেছিল। তাই এই ব্যাপক সামাজিক সমস্যা সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে এ যুগের বাংলা সাহিত্যে অনিবার্যসূত্রে গৃহীত হয়েছে। শিল্পীমানস দেশ ও কালের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার রূপ চিত্রণের মধ্য দিয়ে জনমনে সুহৃদ্সম্মিত আবেদন সঞ্চারিত করার এক অঘোষিত দায়িত্ব পালন করেছে। এযুগের সাহিত্যিক প্রয়াস সেই সামাজিক সমস্যাকে শিল্পরূপ দিয়েছে নানা ভাবে। কাহিনীর রস পরিণতি সৃষ্টিতে, কাহিনীর মুখ্য অথবা গৌণ চরিত্রের নৈতিক অধঃপতন চিত্রণে এই সমস্যাকে ব্যবহার করা হয়েছে। মদ্যপান বা বেশ্যাসক্তির ফলে লাম্পট্য ও ব্যভিচার সমাজের উচ্চস্তর থেকে অতি সাধারণ স্তর এবং বিশেষভাবে যুব-সমাজের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সমাজের সেই সব পটচিত্র নানা ভাবে সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সেই চিত্রে কোথাও দেখা যায় সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান এই সব কদর্য অভ্যাসের দ্বারা বংশ মর্যাদাকে নষ্ট করেছে, কোথাও দেখা যায় এই অভ্যাসের পরিণতিতে চরিত্রবানের চারিত্রিক অবনমন এবং পারিবারিক বিপর্যয়, আবার কোথাও দেখা যায় শিক্ষিত যুবক বা পাঠরত ছাত্রের

নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলনজনিত সমস্যা। বুদ্ধিদৃপ্ত ও মননঋদ্ধ রচনায় যেমন কদর্যতা থেকে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে পরিচ্ছন্ন জীবনাচরণের প্রতি সরাসরি সমর্থন বিজ্ঞাপিত হয়েছে তেমনি নাটক-উপন্যাসে এই কদর্যতাকে কাহিনীর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। দেশ ও জাতির নৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনই এই জাতীয় সমাজিক সমস্যাজড়িত সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। গঠমান বাংলা সাহিত্যে এই উভয়বিধ সমস্যা বিশেষ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগও যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিল। সভাসমিতির মাধ্যমে সমস্যাগুলি বহু আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়ে যুগ-সমস্যার আকার নিয়ে সাহিত্যিক মানসে স্থান পায়। সামাজিক সংকটের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সভাসমিতিগুলি যেখানে নীরস নীতি ও আদর্শ প্রচারের ভূমিকা নিয়েছে, সাহিত্য সেখানে সেই উদ্দেশ্যেরই রসব্যাখ্যাতার দায়িত্ব পালন করেছে।

নাটক ॥ বাংলা নাট্য-কাহিনীর সমাজমুখীনতার ভিত্তি বিভিন্ন সমাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা-সংকট বাংলা নাটকের নূতন প্রাণসঞ্চার করে পৌরাণিক কাহিনীর গতানুগতিক একঘেয়েমীর পরিবর্তে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিল। বাংলা সামাজিক নাটকে মদ্যপান ও বারাঙ্গনাবিলাস সমকালীন সামাজিক সমস্যা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই ব্যাপক ভাবে গৃহীত হয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা' (১৮৫৯) মদ্যপান বিষয়ে রচিত প্রথম প্রহসন। প্রহসনটিতে শহরের নেশাখোর যুবকদের তীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছে। বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রহসনটি সম্পর্কে বলেছেন:

> "এতে রচনার কৃতিত্ব যে খুব বেশী আছে তা নয়—তবে শহরে নেশাখোর যুবকদের প্রতি লেখকের প্রচণ্ড ব্যঙ্গ তাদের অতীত দুরবস্থা থেকেই প্রমাণিত হয়।"[১১]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত ইয়ংবেঙ্গলের প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ ও ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০)-র অন্যতম বিষয় মদ্যপান ও বারবনিতা সঙ্গ। প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র নববাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অধিবেশনের সমাপ্তিতে সমবেত-চিত্তবিনোদনে মদ্যপান ও বারবনিতা-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন এবং এই লাম্পট্যের চরম পরিণতি ঘটে ভগিনীর মুখচুম্বনে, স্ত্রীর সঙ্গে বারবনিতাসুলভ আচরণে এবং পিতাকে কদর্য ভাষায় মদ্যপানে আহ্বানের মধ্য দিয়ে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) নিঃসন্দিগ্ধভাবে উদ্দেশ্যমূলক নাটক। নাটকের প্রারম্ভে উদ্ধৃত কয়েকটি ইংরেজী উক্তির মধ্যে এলিব বারেটের **'Touch not, taste not, smell not, drink not anything that**

intoxicates' উক্তিটিতে নাট্যকারের উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। নাটকের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মদ্যপান-নিবারণী সভাগুলির উদ্দেশ্যের অভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। প্রহসনটিতে অটল ও নিমচাঁদের মদ্যপানের ফলে চারিত্রিক স্খলন, পারিবারিক বিপর্যয়, স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা এবং বারবনিতা-বিলাস প্রভৃতি বর্ণনাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়া অটল, নিমচাঁদ ও নকুলবাবুর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে মদ্যপানের কুফল এবং মদ্যপান নিবারণী সভার কার্যকলাপের প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বিত্তবানের পরিবারে মদ্যপান সমস্যা কিরূপ কদর্যভাবে প্রকটিত হয়েছিল তারই নাট্যচিত্র ক্ষেত্রমোহন ঘটকের 'কামিনী নাটক'-এ (১২৭৫) পাওয়া যায়। কাশীর কোন জমিদার তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে মদ্যপানে আসক্ত করে তুলেছিল এবং তারই পরিণতিতে কন্যার পতিবিদ্বেষ এবং পরপুরুষানুরক্তি জন্মায় — নাটকটির মূল কাহিনী অংশ এইটি। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের 'সুধা না গরল' (১৮৭০) প্রহসনে মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক ব্যভিচার প্রদর্শিত হয়েছে। সমাজের সচেতন শিক্ষিত উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও সমাজহিতৈষী শ্রেণীর কয়েক ব্যক্তির মধ্যে পান-দোষ ও বেশ্যানুরক্তিসহ অন্যান্য লাম্পট্য উপজীব্য করে নাটকটি রচিত হয়। মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা নাটক' (১৮৭২) মদ্যপান ও ব্যভিচারের করুণ পরিণতি নিয়ে রচিত। নাটকটি দুটি অঙ্কে বিন্যস্ত। রামচন্দ্র দত্তের 'মাতালের জননী বিলাপ' (১৮৭৪) প্রহসনটি মদ্যপানজনিত চরম বুদ্ধিনাশের বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত। প্রহসনটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিশবাবু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট বক্তা। তিনি অ্যাটর্নি বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপান করেন এবং বেশ্যালয়ে যাওয়ার জন্য অর্থের দাবীতে নিজের মাকে পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন না। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭২) প্রহসনটিতে শিক্ষিত পরিবারে মদ্যপান এবং মদের নেশায় আসক্ত করে তুলে অন্যের জীবনহানী ঘটিয়ে পরস্ত্রী-সম্ভোগ-প্রচেষ্টা ও সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। মদ্যপানের কদর্যতা কাহিনীবৃত্তের কেন্দ্র। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮) প্রহসনে কলকাতার বাবুসমাজে মদ্যপান ও ব্যভিচারের দিকটি প্রদর্শিত হয়েছে। মদ্যপায়ী বাবুরা স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে, স্ত্রীপুত্রকে অনাহারে রেখে অর্থ সংগ্রহ করে নৌকাযোগে পতিতা সহ মাহেশে দ্বাদশ গোপাল দেখার জন্য যাত্রা করে। বাবুদের নীতিভ্রষ্ট জীবনের দিকটি তুলে ধরাই প্রহসনটির বিশেষত্ব। মদ্যপানের কুফল চিত্রণে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদ্যপানের ফলে প্রফুল্ল নাটকের নায়ক যোগেশের দেবোপম চরিত্রের শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে। মদ্যপান-জনিত সামাজিক সমস্যাই গিরিশচন্দ্রের এই নাটক রচনার মূল প্রেরণা।

এই যুগের কয়েকটি নাটকে বারাঙ্গনাবিলাসের বিষময় পরিণতি পূর্ণায়ত কাহিনী

হিসাবে গৃহীত হয়েছে। প্রসন্নকুমার পালের 'বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক' (১৮৬০-৬২), রাধামাধব হালদারের 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৩)-এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক। অমৃতলাল বসু তাঁর 'তরুবালা' (১২৯৭) নাটকে সমকালীন কলকাতার শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেশ্যাসক্তি এবং তার ফলে সৃষ্ট পারিবারিক অশান্তির বর্ণনা করেছেন।

উপন্যাস ॥ বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্বের নক্শা জাতীয় রচনায় মদ্যপান ও বারাঙ্গনা সমস্যা কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাসে' (১৮২৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্ভূত বাবুসমাজের চারিত্রিক স্খলনের অন্তরঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহিনীর নায়ক নববাবু তোষামুদে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে বাগানবাড়িতে বিলাসিনীদের নিয়ে কদর্য আনন্দ-উল্লাস করে। এই কদর্য জীবনযাপনে অর্থের আবশ্যক হওয়ায় স্ত্রীর গহনাগুলির প্রয়োজনে বিবাহের প্রথম রজনীর দীর্ঘকাল পর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় সমাজে'র অধ্যক্ষ সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং এই সভা স্থাপনের উদ্যোগ আগে থেকেই চলছিল।[১২] এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর নীতি ও শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমন করা। সুতরাং নববাবুবিলাস রচনার সঙ্গে গৌড়ীয় সমাজের উদ্দেশ্যের অভিন্নতা স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)—এই নক্শা জাতীয় রচনায় মদ্যপায়ীর কদর্য আচরণের কৌতুককর বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের অন্তঃসারশূন্য দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় (১ম খণ্ড ১৮৬২, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১৮৬৫) কলকাতার ধনী ও মধ্যবিত্তের হুজুকপ্রিয়তা এবং উৎসব অনুষ্ঠানের নামে ব্যভিচার ও মত্ততাকে অশিষ্ট ভাষায় তীক্ষ্ণ ভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। 'কলকাতার চড়ক-পার্ব্বণ' অংশ থেকে সে যুগের সমাজের কদর্যতার একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উদ্ধার্য :

> " ক্রমে গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গ্যাল। সহরে কানপাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারিদিকে ঢাকের বাদ্দি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ।....বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সকেরদলের পাঁচালি ও হাপ্ আখড়াইয়ের জোয়ার, গুল-গার্ডেনের মেম্বরই অধিক,—এঁরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরেরব্যালা এসে জমেছেন।"

মদ্যপানের বিরুদ্ধে জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'সখা' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের লিখিত 'ছাগলের বুদ্ধি' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়।[১৩] গল্পটিতে বলা হয়েছে, ওয়েল্‌স্‌দেশীয় কোন ভদ্রসন্তানের একান্ত অনুগত একটি ছাগল এক দিন মাত্র প্রভু-প্রদত্ত সামান্য সুরাপান করে নেশাগ্রস্ত হওয়ায় সুরার কুফল সম্পর্কে অবগত হয়ে পরবর্তীকালে প্রভুর অনুরূপ উদ্যোগের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ছাগলের আচরণে প্রভু লজ্জিত হয়ে সুরা পানের নেশা পরিত্যাগ করে।

এ যুগের উপন্যাসে মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-সমস্যা ঔপন্যাসিক উপাদান হিসাবে তেমন বিবেচিত হয়নি। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসে একটি মাত্র প্রসঙ্গে আত্মবিস্মৃতি ও বিবেক বিসর্জনের উপায় হিসাবে মদ্যপান প্রসঙ্গ এনেছেন। রূপ-তৃষ্ণায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মদ্যপানের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার কথা ঘোষণা করেছে; 'যদি কখনও স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণে শুনি, তবে মদ ছাড়িব নচেৎ মরি বাঁচি সমান কথা।' দেবেন্দ্রের কাছে মদ্যপান স্ত্রীকে ভুলে থাকার আপাত-উপায় হিসাবে অবলম্বিত হয়েছে।

প্রবন্ধ ।। বাংলা প্রবন্ধে মদ্যপান ও বারাঙ্গনা সমস্যা স্থান পেয়েছে, কিন্তু মদ্যপান সমস্যা আনুপাতিক ভাবে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রবন্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৫৩) মদ্যপানের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' (১৮৮৮) প্রকৃষ্ট জীবনাচরণ পদ্ধতির ব্যাখ্যায় মদ্যপান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিম মদ্যপান প্রশ্নটির প্রাচীনত্ব উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যুগ-সমস্যা বলেই পর্যায়ক্রমে এই বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। ধর্মতত্ত্বের অষ্টম অধ্যায়ে বলেছেন:

> "যাহা হৌক মদ্য সেবন সম্পর্কে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময়ে সেবন করা অবিধেয়।"

বঙ্গদর্শনের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ধর্মের বিচার' (বৈশাখ ১২৮০) প্রবন্ধে 'নব্য বাঙালীবাবুর জবানবন্দী' অংশে সমকালীন চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন; 'বেশ্যা, দ্রাক্ষারস এবং ব্যসন ছাড়া আর কোন বিষয়েই আসক্তি ছিল না।'

কাব্য-কবিতা ।। এযুগে কাব্য কবিতার পটে মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-বিলাস জনিত

সামাজিক সমস্যা স্থান পেয়েছে। তবে মদ্যপান সম্পর্কে যত কটাক্ষপাত ঘটেছে বারাঙ্গনা সমস্যার প্রতি তুলনামূলক ভাবে তা দেখা যায় নি। মদ্যপান থেকে অন্যান্য ব্যভিচারের সৃষ্টি বলে হয়তো মূল সমস্যাই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থলে পরিণত হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে মদ্যপানের প্রতি আসক্ত ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী সভ্যতার আনুকূল্যে বাঙালী সমাজে মদ্যপানের ব্যাপক প্রসারকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই ইংরেজী সভ্যতার এই কদর্য দিকটির প্রতি তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতার শাণিত শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 'ইংরাজী নববর্ষ' কবিতায় দুটি পংক্তিতে ইংরেজী সভ্যতার সেই অসারতার দিকটি তুলে ধরেছেন :

হিপ হিপ হুর্‌রে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্‌ গ্লাস॥

তিনি অন্য একটি কবিতায় ইংরেজী সভ্যতা, ধর্ম ও তার প্রচারকের প্রতি কটাক্ষ করতে গিয়ে সমগ্র ইংরেজী সভ্যতাকেই এক প্রকার কারণবারি-সিক্ত বলে অভিহিত করেছেন :

ধন্যরে বোতলবাসী, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দ ২৮ মে) পত্রিকায় নারী-জীবনের সমস্যা সম্পর্কে লিখিত তাঁর একটি কবিতায় পুরুষের পর-নারীর প্রতি আসক্তি নারীর অন্তরে কি গভীর বেদনার সঞ্চার করে তা অভিব্যক্ত হয়েছে :[১৪]

হলো, মেয়েমুখো কত্তা মোদের
বুকের ছাতি নাই লো।
এমন ভাতারের ভাৎ আর খাবো না
দেশান্তরে যাই লো।

ব্রজনাথ মিত্রের 'কাদম্বরী কাব্য' (১৮৬৯) পৌরাণিক আখ্যান কাহিনী অবলম্বনে রচিত, কিন্তু কবি কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন ; 'সুরাপান নিবারণ ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।' কবির উদ্দেশ্য এই কাব্যে কতখানি পূরণ হয়েছে বলা যায় না, তবে কবির উদ্দেশ্যবাদিতা লক্ষ্যণীয়। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সুরা ও নারীর প্রতি এক সময় গভীর আসক্তি জন্মায়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মোহমুক্তি ঘটে। সুরাপানের অশুভ পরিণতি অবলম্বনে ১২৭৪ বঙ্গাব্দে তিনি 'নবোন্নতি' নামে আখ্যায়িকা এবং রূপক

কবিতা 'মাদক মঙ্গল' রচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে'র (১৮৭১-১৮৭৬) দশম সর্গে বাঙালীর পরিচয় দিতে গিয়ে গভীর বেদনার সঙ্গে বলেছেন :

চতুর্থ চক্ষুর শূল লম্পট অধম,
বসেছে স্বৈরিণী সনে, হাবাতে বিষম,
কুলাঙ্গার দুরাচার, নাহি কিছু লাজ,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, পড় মুণ্ডে বাজ।
কত দিনে ফিরিবে মা, বঙ্গের ললাট,
সভ্যতায় মুক্ত হবে অন্দর কবাট,
বেড়াবে বাঙালি বাবু গাড়ীতে বসিয়ে,
পতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে।

আবার প্যারীচরণ সরকারের মদ্যপান নিবারণ প্রচেষ্টার উদ্যোগের প্রতি দীনবন্ধু উল্লিখিত কাব্যের একই সর্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন :

চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ
যাহার ইংরেজী বই পড়ে শিশুগণ
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ
হীনমতি সুরাপান—বিষম—শমন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৫৬
২. রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত, পৃ.৪৫-৪৬
৩. রাজনারায়ণ বসু—সেকাল আর একাল,

৪. রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত, পৃ. ৮২
৫. The First Report of the Bengal Temperance Society, p. 1.
পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য।
৬. Extract from a letter dated the 23rd May, 1864, from Raja Radhakant Deb Bahadur, addressed to

Babu P. C. Sircar—দ্রষ্টব্য M. N. Sircar—
Life of Peary Churn Sircar (A Recast)
1914, P. 64,

৭. প্রয়াস, ১ম বর্ষ, ১৮৯৯ অক্টোবর, পৃ. ৫৯০

৮. বিপিনচন্দ্র পাল—সত্তর বৎসর, পৃ. ১৮২

৯. Report of the Ootterparrah Hitokorry Shova for the year 1863-64, p. 13.

১০. Abkari—October, 1891,

১১. বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ

১২. যোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলার নব্য সংস্কৃতি (বিশ্বভারতী সং ১৯৫৮) পৃ. ৪

১৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) : 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' পৃ. ১১১

১৪. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৬৮

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চা এবং দেশী-বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ ও অনুসরণে সভাসমিতির উদ্যোগ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চা এবং দেশী-বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুসরণে সভাসমিতির উদ্যোগকে দুটি পর্বে বিভক্ত করে দেখলে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। প্রথম পর্বের বিস্তৃতি ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ ও তার কিছু পূর্ব থেকে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বের বিস্তৃতি ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনাধিকারের আবেদন পুনর্নবিকরণ কালে জানসাধারণের মধ্যে দেশীয় ভাষায় সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার প্রসারের জন্য বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে এক লক্ষ্য টাকা ব্যয় বরাদ্দ করার শর্ত আরোপিত হয় :

> "A sum of not less than a lakh of rupees in each year should be set apart and applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India." (Act 53 george III, Chapter 155, Clause 43)"[১]

এই শর্ত আরোপিত হওয়ার পূর্ব থেকেই বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চায় ও অনুবাদ-অনুসরণ কর্মে ইংরেজ কর্মচারী ও মিশনারীদের যথেষ্ট তৎপরতা দেখা যায়। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী এবং ক্রমে সমগ্র শাসনভার প্রাপ্ত হওয়ায় রাজকার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশী ভাষা শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষা অনুশীলনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা ভাষা-চর্চার ভিত্তিভূমি রচনার ক্ষেত্রে কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের ইংরেজী ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার অক্ষর সম্বলিত ব্যাকরণ **A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮),** জোনাথন ডানকানের বাংলায় অনূদিত ও প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত আইন-গ্রন্থ, স্যার উইলিয়ম জোন্স সম্পাদিত বাংলা হরফে মুদ্রিত কালিদাসের

রচিত সংস্কৃত 'ঋতুসংহার' (১৭৯২), এ. আপজন রচিত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' (১৭৯৩), ফরস্টারের দু'খণ্ডে প্রকাশিত Vocabulary—বা ইংরেজী-বাংলা অভিধান (১৭৯৯-১৮০২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অষ্টাদশ শতকে পর্তুগীজ মিশনারীদের বাংলা চর্চা এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের চর্চা ও অনুবাদ প্রয়াস বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চা ও অনুবাদ-অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পাশ্চাত্য প্রভাবের এই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভাষ'-সাহিত্যের সর্বপ্রকার উন্নতি বিধানের জন্য দেশের মধ্যে এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়:

> In fact, one of the most significant results of western impact was the development of Bengali literature. Not only were new books produced; translations from well-known English works were also brought out and through this process western ideas and values were beginning to exercise a profound influence upon Bengali life and thought."[২]

এই সময় দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের যৌথ ও পৃথক্ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতিসাধন এবং জনমানসে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সঞ্চারের জন্য একাধিক সভাসমিতি গঠিত হতে লাগল। বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা, অন্য ভাষায় রচিত উন্নততর সাহিত্য অনুবাদ ও অনুসরণ এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করা সভাসমিতিগুলির লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু সমকালেই ইংরেজী ভাষার প্রতি বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আগ্রহই উল্লিখিত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধ-প্রবণতা হিসাবে দেখা দিতে লাগল:

> "একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের সাহায্যে পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, অপরদিকে কলিকাতা সহরের সম্রান্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে নিজ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল।"[৩]

এছাড়া ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ২ মে গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বস্থ নতুন ভবনে হিন্দু কলেজের স্থানান্তর ও একই দিনে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর ঐ কলেজে যোগদান এবং তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যে ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি আরোপিত দেশীয় সাহিত্য প্রসারের পূর্ব শর্ত এবং ইংরাজ কর্মচারী ও মিশনারীদের বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চার উদ্যোগ যেমন দেশী-বিদেশী বিদ্বজ্জনকে সভাসমিতি গঠনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চায় প্রেরণা দান করেছিল তেমনি এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বাঙালী ও হিন্দু কলেজ-ছাত্রদের বিরুদ্ধ প্রবণতার প্রতিরোধ কল্পে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে সভাসমিতি গঠনে ব্যাপক তৎপরতা দেখা যায়। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সর্বাত্মক উন্নয়ন-কল্পে গঠিত সভাসমিতির প্রেরণা দানে উল্লিখিত কারণগুলির বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই জাতীয় সভাসমিতি গঠনের পশ্চাতে পূর্ববর্তী কারণ ছাড়াও বিশেষ রাজনৈতিক কারণ যুক্ত হওয়ায় দেশীয় বিদ্বজ্জনের মধ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চার সপক্ষে জনচেতনাকে প্রভাবিত করার ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গভর্ণর কাউন্সিলের আইন-বিষয়ক সদস্য লর্ড মেকলে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিলের কাছে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে এক মন্তব্যপত্র রচনা করেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ কাউন্সিলে উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই মন্তব্যপত্র অনুমোদন করেন:

> "The great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India: and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."[৭]

পাশ্চাত্য শিক্ষার এই সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে 'কস্যচিৎ হিন্দু বালকানাং হিতৈষিণঃ' নামে প্রকাশিত পত্রে সেই প্রতিক্রিয়ার একটি পরিচয় পাওয়া যায়:

> "বঙ্গভাষা আলোচনা ॥ হিন্দু বালকেরা যদ্যপি অগ্রে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া পরে অর্থকরী অন্যান্য বিদ্যা সাধন করেন, তবে পরমোপায় এই, যে তাঁহারা কখন স্বধর্ম্ম প্রতি দ্বেষী হইতে পারিবেন না। কিন্তু ইংরাজ লোক এতদ্দেশের রাজা হইয়া অবধি তাঁহারদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আপন২ সন্তানদিগের ঐ রাজভাষা শিক্ষা হেতু বহুমতে যত্নবান হয়েন, ঐ বালক সকল স্বদেশীয় ভাষা ভালরূপে জ্ঞাত হউক বা না হউক সর্ব্বদা তাহারা ইংরাজি লেখা

ও পড়ার প্রতি সাবধান করেন, তদ্দৃষ্টে যদ্যপি কোন ব্যক্তি সঙ্কেতে কিছু হিতোপদেশ দেন, তাহাতে কহেন যেরূপে . অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, অতএব ইহাতে এই বক্তব্য যে ধনলোভে ধর্ম্মহানি, এবং এ বিষয়ে এক্ষণে অনেকে খেদ করিয়া থাকেন, যেতাঁহারদিগের পুত্রকে যদ্যপি প্রথমে উত্তমরূপে স্বীয় ভাষা শিক্ষা দিতেন, তবেতাহারা স্বধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়া কখন কুপথগামী হইত না, এবং প্রবীণ লোকের সদুপদেশ উপহাস করিয়া তাদৃশ ঔদাস্য করিত না। অতএব এতদ্দেশস্থ সমস্ত ভদ্র হিন্দুবর্গ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের আপন২ সন্তানদিগকে অগ্রে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করুন, নতুবা সাধারণ অমঙ্গল যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে এই মহানগরে অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নগরস্থ প্রায় সকল বালক তদ্ভাষা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে যাহারদিগের পিতামাতা নিজ পুত্রের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দেন এই সকল বালক আপন২ বর্গমধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য থাকেন, কেননা মনঃসংযোগ বিনা কোন ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ যে যদ্দেশস্থ হউক তাহারদিগের স্বীয় ভাষা না জানিলে কখন অন্য ভাষা শিক্ষা করিয়া বিচক্ষণ হইতে পারেন না। কিন্তু বালকেরা বাল্যাবস্থায় আপন স্বেচ্ছা-দ্বারা কিছু করিতে স্বাধীন নহেন, তৎকালে তাহারদিগের পিতামাতার যেরূপ আজ্ঞা তদনুসারে চলিলে চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারেন, তথা 'সংসর্গজা দোষাগুণা ভবন্তি॥' কস্যচিৎ হিন্দু বালকানাং হিতৈষিণঃ।[৫]

সর্বোপরি ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ও ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্ত দুটি বাংলা ভাষা-প্রেমিক বিদেশীয় ও দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চা সম্পর্কে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী মনীষার সংযোগ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সভাসমিতি গঠনের অন্যতম সহায়ক কারণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। সভাসমিতিগুলি দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের বিভিন্ন রচনার অনুবাদ, বাংলা সাহিত্যের শৈশবমুক্তির জন্য ঐ সকল সাহিত্যের অনুসরণ, বাংলা শিক্ষার সম্প্রসারণে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে বাংলায় রচিত গ্রন্থে বিদেশী বিদ্যার আহরণ ও সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারের সমৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চায় 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' পথিকৃত্যের দাবী রাখে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই ১৬ জন ইউরোপীয় এবং ৮ জন দেশী সদস্য নিয়ে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপুস্তক বাদে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বিদ্যালয়গুলির জন্য ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থপ্রণয়ন এবং সেগুলি বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণের জন্য সমিতি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমিতির অধ্যক্ষ মনোনীত হন স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, মি. জে. এইচ. হ্যারিংটন, মি. ডবলিউ, বি. বেলি, ড. কেরী, জে. পিয়ার্সন, মি. ডবলিউ. এইচ. ম্যাক্নটন, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা সোসাইটির অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সংবাদ পরিবেশন করে :

> "১১ অকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমীদের কথা ক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।"[৬]

বাংলায় মৌলিক ও অনুবাদ-পুস্তক প্রকাশের দ্বারা এই সমিতি শিক্ষাপ্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেনের যৌথ সহায়তায় নীতিমূলক ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি 'নীতিকথা' (১৮১৮) নামে প্রকাশিত হয়। তারাচাঁদ দত্ত মনোরঞ্জক গল্পের একটি আকর্ষণীয় রচনা 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯) প্রকাশ করেন। রামকমল সেন ইংরেজী ঈশপের গল্পের অনুবাদ 'হিতোপদেশ' (১৮২০) রচনা করেন। রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২২) দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই সোসাইটি প্রকাশ করে। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে সোসাইটি 'পশ্বাবলী' নামে পশু বৃত্তান্ত-সম্বলিত একটি মাসিক পুস্তিকা সংকলন করতে থাকে। পশ্বাবলীর বিষয় ইংরেজীতে সংকলন করতেন জে. লসন্ এবং বাংলায়

অনুবাদ করতেন পীয়ার্স। প্রতি সংখ্যায় একটি পশুবৃত্তান্ত স্থান পায়। স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের রচিত ড. গোল্ডস্মিথের গ্রন্থের অনুবাদ 'গ্রীকদেশের ইতিহাস' (১৮৩৩), গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসের কয়েকজন বীরপুরুষের গল্প 'সত্য ইতিহাস সার' (১৮৫৩), 'অদ্ভুত ইতিহাস সিকন্দর সাহেব দিগ্বিজয়' (১৮৫৭), 'জঙ্গিস খাঁর বৃত্তান্ত' (১৮৫৭), মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'নুরজাহান রাজ্ঞীর জীবনচরিত' (১৮৫৮) ছাড়াও 'ভারতবর্ষের ইতিহাস—দুই বালম', 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত', 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভূগোল-বিষয়ক গ্রন্থ 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন,' (প্রথম সং ১৮২৪, দ্বিতীয় সং ১৮২৭) সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

দেশী-বিদেশী বিদ্বজ্জনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলবুক সোসাইটির কার্যক্রম বাংলার বিদ্বৎসমাজকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার বাংলাদেশের কিছু বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি হিন্দু কলেজে রাত্রি ৮ ঘটিকায় সমবেত হয়ে 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে'[৭] 'গৌড়ীয় সমাজ' নামে এক সভা স্থাপন করেন। সভায় রাধাকান্ত দেবের প্রস্তাবক্রমে রামকমল সেন সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রামজয় তর্কালঙ্কার, উমানন্দ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কাশীকান্ত ঘোষাল, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শিবচরণ ঠাকুর, বিশ্বনাথ মতিলাল, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাধাকান্ত দেব, কালাচাঁদ বসু, রামচন্দ্র ঘোষ, রামকমল সেন, কাশীনাথ মল্লিক, বীরেশ্বর মল্লিক, রসময় দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশনে গঠিত অস্থায়ী অধ্যক্ষ-সভায় মনোনীত হন লাডলিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও কাশীনাথ মল্লিক। রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদক-পদে বৃত হন। সমাজের ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য অনুশীলন অন্যতম কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বাংলা ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রণয়ন ও অনুবাদ প্রয়াস শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ মে অনুষ্ঠিত সভায় কালীশংকর ঘোষাল তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত 'ব্যবহার মুকুর' গ্রন্থটির অংশ বিশেষ পাঠ করেন এবং গ্রন্থটি সমাজকে দান করেন।

বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও দৈন্য থেকে মুক্ত করা ও শিষ্ট সমাজে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা দানের ক্ষেত্রে এই সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গৌড়ীয় সমাজের উদ্যোগে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শিত হয় তা' পরবর্তী সভাসমিতির মধ্যে ক্রমশই গভীরতর রূপ গ্রহণ করতে থাকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বিষ্ট ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গভাষানুশীলনে দেশবাসীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত 'নববিশিষ্টশিষ্টগণ সভা'য় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সভার সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। 'বঙ্গরঞ্জিনী সভা' নামে নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভার নাম সংক্ষেপ প্রসঙ্গ 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত করার সময় সভার উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে :

> "শ্রীযুত বঙ্গদূত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।....পূর্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শন দ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা।
>
> উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব সামাজিকেরা সকলে বিবেচনাপূর্বক বঙ্গরঞ্জিনী নামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াসপূর্ব্বক অনেক অনেক সমাজ স্থাপিত করেন তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশহউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গ প্রযুক্তই না হউক বিশিষ্ট কুলোদ্ভব জনেরদের গমনাভাবপ্রযুক্ত সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণ দ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষ হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্মদ্বেষী ও নাস্তিক মতাবলম্বী মান্যান্য বিবেচনা শূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্ব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্য পংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবে না ইত্যাদি নিয়ম পুনর্বার পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি। বঙ্গরঞ্জিনী সভাসম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।"[৮]

বর্ষীয়ানদের বাংলা ভাষা-সাহিত্য প্রীতি ক্রমশ ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং তারই ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগে ও হিন্দু কলেজের কতিপয় ছাত্রের সহযোগিতায় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ৩০

ডিসেম্বর গঠিত 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র মধ্য দিয়ে।' সভার অধিবেশন হয় অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ভবনে। সভার উদ্বোধনী ভাষণে জয়গোপাল বসু সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন ;

> "এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ এক সভা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের এই অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক .. যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক একণে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থে অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেক বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন।"[৯]

জয়গোপাল বসুর প্রস্তাবক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (হিন্দু কলেজের তৎকালীন ছাত্র) সম্পাদকের পদে এবং নবীনমাধব দে'র প্রস্তাবক্রমে রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় (হিন্দু কলেজের তৎকালীন ছাত্র) সভাপতির পদে মনোনীত হন। কিন্তু উভয় মনোনয়নই শর্ত সাপেক্ষ হয়। নীবনমাধব তাঁর প্রস্তাবে উল্লেখ করেন যে, সম্পাদক সভ্যদের তাঁর কার্যক্ষমতার দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারলে স্থায়ীভাবে সম্পাদক পদে আসীন হবেন এবং অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকলে তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। সম্পাদকের মনোনয়ন তাই আপাততঃ এক মাসের জন্য স্থায়ী বলে স্থির হয় এবং সভাপতি প্রতি মাসে পরিবর্তনযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভার অধিবেশন প্রতি রবিবার অনুষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং বাংলা ভাষায় সভার কার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্যামাচরণ গুপ্ত উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চার উৎসাহ দেশবাসীর মধ্যে ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি মনোনীত হন শ্যামাচরণ শর্মণঃ এবং সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সপ্তাহে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ঘোষিত বেন্টিঙ্কের ভাষানীতির প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভাষা-সাহিত্য প্রীতি ও প্রসার প্রচেষ্টায় উৎসাহ-উদ্দীপনার মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পায়। এই সময়ের পরে কোন এক সময়ে 'বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। সভা

স্থাপনের সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। এ সম্পর্কে আনুমানিক সিদ্ধান্ত :

> "তবে মনে হয় বড়লাট বেন্টিঙ্ক ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন ধার্য করিয়া গেলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বঙ্গভাষার প্রকর্ষের নিমিত্ত এই সভা স্থাপন করিয়া ছিলেন....।"[১০]

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উৎকর্ষতা বিধানের জন্য এই সভা স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে দেশবাসীর স্বার্থবিরোধি সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা এই সভার অন্যতম নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভার একটি বিবরণ থেকে বিভিন্ন সংবাদ জানা যায়।[১১] সভার সভাপতি ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। গৌরীশঙ্কর পরবর্তীকালে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। সভার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামলোচন ঘোষ, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহেশচন্দ্র সিংহ, প্যারীমোহন বসু প্রমুখ। প্রথম দিকে প্রতি বৃহস্পতিবার সভার অধিবেশন হত, কিন্তু পরবর্তীকালে সভার অধিবেশনের দিনের পরিবর্তন ঘটে। সভায় ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। পুর্বোক্ত ৮ ডিসেম্বরের সভায় সভাপতি গৌরীশঙ্কর পূর্ব অধিবেশনে স্থিরীকৃত বিষয় 'দুঃখ হইতে সুখ জন্মে কি সুখ হইতে দুঃখ জন্মে' আলোচনার জন্য উত্থাপিত হলে রামলোচন ঘোষ অদৃষ্ট, ধর্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণার আশংকায় বিষয়টির আলোচনায় আপত্তি করেন এবং ধর্মালোচনা সভার দশম নিয়মের বিরোধী বলেও উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে এই সভা ইংরেজ সরকারের দেশবাসীর স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদের একটি মঞ্চে পরিণত হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় নিয়েই সভাটির অবলুপ্তি ঘটে।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ভাষার নিয়মবদ্ধ চর্চার জন্য 'বঙ্গরঞ্জিনী সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। একই নামে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে অনুরূপ উদ্দেশ্যে একই নামে একটি সভা গঠিত হয়েছিল। বর্তমান বঙ্গরঞ্জিনী সভাটি পূর্বোক্ত সভা অপেক্ষা কিছুটা হীনবল বলেই মনে হয়। কারণ, এই সভার কার্যক্রম সীমিত ছিল বলেই বিশেষ প্রচার-সৌভাগ্য লাভ করেনি। কলকাতা সিমুলিয়া অঞ্চলের কিছু ব্যক্তি বাংলা ভাষা শুদ্ধ রূপে লেখা ও পড়ার জন্য এই সভাটি গঠন করেন।

ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শে লালিত হিন্দু কলেজের ছাত্ররা শিক্ষান্তে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মিলন-বাসরের সেই পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত জ্ঞানালোচনার স্মৃতি ভুলতে পারেনি। তাই তারা নতুন ভাবে মিলন ও জ্ঞান-বিস্তার আলোচনার জন্য সংস্কৃত কলেজ হলে সমবেত হয়ে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ 'সাধারণ

জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। সভার অধিবেশনে বিভিন্ন সদস্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করতেন। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা'র তৎকালীন সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্য 'এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাকরণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাংলা ভাষা চর্চার সপক্ষে প্রবন্ধটিতে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করা হয়। এক সময়ে যে হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থীরা ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ধ্যান-জ্ঞান বলে মনে করতেন তাঁদের চিন্তাধারার এই পরিবর্তন যুগপ্রবাহের বিশেষ দ্যোতনাকেই প্রতিফলিত করে।

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ অক্টোবর স্থাপিত 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে নামান্তরিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের একটি বিশিষ্ট সংগঠন হলেও উনিশ শতকের বাংলা দেশে এই সভা সবার্থসাধক এক সভার গৌরবের অধিকারী হয়। এই সভার পরিচয় দান প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন ; "এই সভা সর্ব্বতোভাবে রাজকীয় কার্যবিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্ম প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"[১২] বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' বাংলা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে। ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক বিবরণে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে শাস্ত্র-সাহিত্য ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের চর্চা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> "এই পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচারিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক,....।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও বাংলা ভাষা চর্চার সপক্ষে জনমত জাগ্রত করার জন্য সচেষ্ট হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উন্নতির অন্তরায়ের প্রসঙ্গে এর চর্চার স্বল্পতা ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের অনুরাগের অভাবকেই কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে :

> "আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যতকাল বঙ্গভাষা বিশিষ্টরূপে চর্চা ও আরম্ভ না করিবেন ততকাল বঙ্গভাষা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। এক্ষণে কতিপয় মাত্র কৃতবিদ্য ব্যক্তি বঙ্গভাষার অনুশীলন করিয়া থাকেন, বাঙ্গালাতে অতি অল্প সংখ্যক উত্তম গ্রন্থ ও প্রবন্ধ যাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা তাঁহাদিগের দ্বারা রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ কৃতবিদ্যের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প...."[১৩]

বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চা ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিদ্যা-বিষয়ক অনুবাদ গ্রন্থ রচনায় দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের প্রচেষ্টায় গঠিত উনিশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমিতি 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'। এই সমাজ স্থাপনের সময়কাল সম্পর্কে 'সত্যপ্রদীপ'

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'বাংলার নব্য-সংস্কৃতি' গ্রন্থে, বিনয় ঘোষ 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থে এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস বলে উল্লেখ করেছেন।* এছাড়াও যোগেশচন্দ্র বাগলের উক্ত গ্রন্থে এবং 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৬১ বঙ্গাব্দের চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কথা' শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধে কিছু তথ্যগত ত্রুটি আছে।‡ বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রাপ্ত প্রথম রিপোর্টে দেখা যায় সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ এবং যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থে ও প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যের ত্রুটিগুলিও ধরা পড়ে।† তাছাড়া পাদ্রী লঙ্ তাঁর 'Returns

FIRST REPORT
VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE
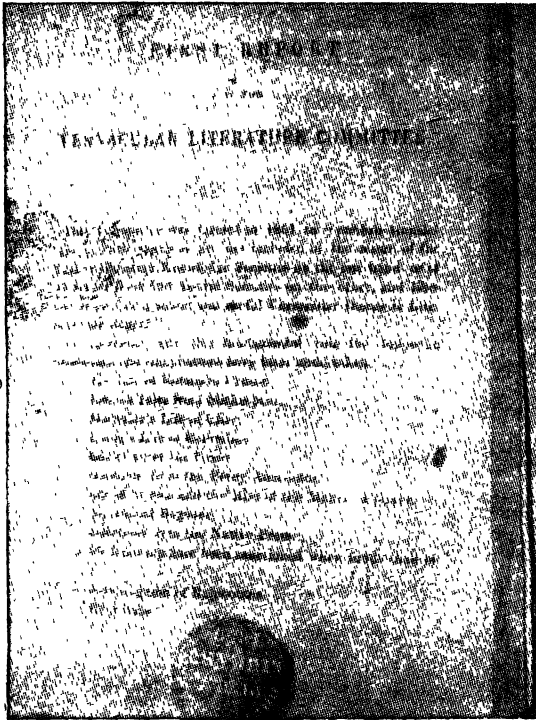
ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটির প্রথম রিপোর্ট

relating to publications in the Bengali Language in 1857 etc.' গ্রন্থের ৫৪ সংখ্যক (LIV) পৃষ্ঠায় সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ বলে সঙ্গত

ভাবেই নির্দেশ করেছেন। সমাজের প্রথম রিপোর্টে ঘোষণা করা হয়েছে :

> "....publish translations of such works as are not included in the design of the Tract or Christian Knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other, and likewise to provide a useful vernacular Domestic Literature for Bengal."

সমাজের পরিচালক-সমিতি ষোল জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। বিদ্যোৎসাহী বাঙালীদের মধ্যে এই পরিচালক-সমিতিতে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রসময় দত্ত। সমাজের সম্পাদক ছিলেন হজসন প্রাট, মেরিডিথ টাউনশেণ্ড ও হেনরি উড্রো। পরিচালক সমিতির অন্যান্য ইউরোপীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জে. আর. কলভিন, এ. গ্রোট, পাদ্রী উইলিয়ম কে, পাদ্রী জেমস্ লঙ্. জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ই. এ. সেমনেলস্, ডবলিউ. সিটনকার, ড. স্প্রেঙ্গার, এম. ওয়াইলি। ক্রমান্বয়ে রাধাকান্ত দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁদের গ্রন্থাগারের যাবতীয় বাংলা পুস্তক সমাজকে দান করেন। সমাজের পক্ষে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাস থেকে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাকে চিত্রশোভিত করার জন্য বেথুন লণ্ডনের অন্যতম প্রকাশক চার্লস নাইটের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে সাতাশটি ব্লক আনিয়ে ছিলেন। ১৭৭৪ শকের (১৮৫২ খ্রীঃ) কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি এবং আর্থিক অনটনের জন্য ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশ দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থাকে।

সমাজের পক্ষ থেকে প্রথম বৎসরে নিম্নলিখিত গ্রন্থ অনুবাদ ও সংকলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

The life of Robinson Crusoe.
Lamb's Tales from Shakespeare.
Macaulay s Life of Clive.
Irving's Life of Columbus
Life of Peter the great
Selections from the Percy Anecdotes

Life of Sivajee and the Rise of the Maharatta Power,

An Annual Register

Selections from the Native Press

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বাংলা অনুবাদ 'রবিন্সন ক্রুশোর চরিত্র', সেক্সপিয়র কৃত গল্প' 'লর্ড ক্লাইব চরিত্র', 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও পাদ্রী লঙ্ সংকলিত 'সংবাদ-সার' (Selections from the Native Press) ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে সমাজের পক্ষে চ্যাপম্যান গ্রন্থে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য এক পরিকল্পনা পেশ করেন এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক মৌলিক পুস্তক প্রণেতাকে দু'শত টাকা পারিতোষিক দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত পুস্তক রচনার বিষয় নিম্নরূপ :

১। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞান শাস্ত্র,

২। দেশ-প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোলের বৃত্তান্ত,

৩। বাণিজ্য ও লোকবার্তা বিধান,

৪। লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র,

৫। শিল্প-বিদ্যা,

৬। শিক্ষা-বিধান,

৭। জীবন-চরিত,

৮। নীতিগর্ভ গল্প।

সমাজের অন্যতম সদস্য পাদ্রী লঙ্ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মে'র পূর্বে সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকার সঙ্গে সমকালীন সংবাদপত্র ও প্রকাশিত পুস্তকের প্রকাশনা-বৃত্তান্ত মিলিত করে যোগেশচন্দ্র বাগল একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করেন :[১৪]

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশকাল	মুদ্রণ সংখ্যা
রবিন্সন ক্রুশোর চরিত্র (১২খানি চিত্র)	জে. রবিন্সন	১৮৫৩	১,০০০
লর্ড ক্লাইব চরিত্র (৭ খানি চিত্র)	হরচন্দ্র দত্ত	ঐ	১,০০০
সেক্সপিয়রকৃত গল্প	ড. রোয়ার	ঐ	১,৫০০
সংবাদ সার (৪ খানি চিত্র)	জে. লঙ্	ঐ	৭৫০
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার	ঐ	৭৫০
গঙ্গার খালের বিবরণ (২ খানি চিত্র)	জে. রবিন্সন	১৮৫৫	১,০০০

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশকাল	মুদ্রণ সংখ্যা
মনোরম্য পাঠ	রামচন্দ্র মিত্র	১৮৫৫	১,০০০
পাল ও বর্জিনিয়া (২ খানি চিত্র)	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন	১৮৫৬	১,০০০
বৃহৎ কথা, ১ম খণ্ড	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	১৮৫৭	১,০০০
পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা এবং নায়ক-শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা (১ খানি চিত্র)	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	ঐ	২,০০০
হংসরূপি রাজপুত্রদিগের বিবরণ (১ খানি চিত্র)	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	ঐ	২,০০০
নূতন পঞ্জিকা ১২৬২ ও ১২৬৩ বঙ্গাব্দ	রাজেন্দ্রলাল মিত্র		৩,৫০০
বিবিধার্থ সংগ্রহ (১-৩৬ খণ্ড)	ঐ		৩৯,৬০০

সমাজের ১৮৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক বিবরণে সমাজ কর্তৃক প্রকাশিতব্য পুস্তকের একটি ফিরিস্তি 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকায় (১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ ২৪ জুলাই) প্রকাশিত হয়—

সাইবিরিয়া দেশে দুরকৃতদিগের বৃত্তান্ত।
রাজপুত্র ইতিহাস।
ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের বৈচিত্র্য।
সংবাদপত্র হইতে দ্বিতীয় সংগ্রহ।
বৃহৎ কথা, দ্বিতীয় খণ্ড।
বাঙ্গলা কবিতা সার।

এছাড়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলকাতার ইতিহাস রচনার জন্য পাঁচশ টাকা পুরস্কার প্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এইভাবে বাংলা অনুবাদ ও মৌলিক পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ যে ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজন করেন তা' বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গঠন-পর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

ভারতহিতৈষী জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য তৎকালীন শিক্ষা-সমাজের সম্পাদক ড. এফ. জে. মৌএট-এর আহ্বানে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর স্থাপিত 'বেথুন সোসাইটি' নানা প্রকার হিত চিন্তার মধ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি-বিধান, প্রচার-প্রসার ও আলোচনা অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ

করে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ মে সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি সোসাইটির পূর্ববর্তী মাসিক অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্তের 'বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত অশালীন অভিমতের যুক্তিপূর্ণ তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু রঙ্গলালের প্রবন্ধটি সোসাইটির বাৎসরিক রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়নি :

> "পূর্বের সভায় মনে হয় এই প্রবন্ধ পাঠের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। সভাপতির বিশেষ অনুমতিতে ইহা পঠিত হইয়া থাকিবে। সভার প্রথম বার্ষিক বিবরণেও হয়ত এই কারণে কবি রঙ্গলালের প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হয় নাই।"[১৫]

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে জগদীশনাথ রায় 'On Education in Bengal and the necessity of instruction in the Vernacular Language'-নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'On Vernacular Education in Bengal'—নামে প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বেথুন সোসাইটিতে এইসব আলোচনার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কারণ, বাংলা দেশের অধিকাংশ বিদ্বজ্জন এই সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অনুকূলে ব্যক্ত অভিমত জনচেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অনিবার্য ভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা ভাষা-সাহিতের উন্নতিবিধানে এবং বাংলা সাহিত্যকে জনসমক্ষে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র ভূমিকা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে একটি মতবিরোধ আছে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের তারিখ অনুযায়ী '১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাকাল বলে স্থির করা হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাকাল সঙ্গত কারণেই ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ করেছেন।[১৬] তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে উদ্ধৃত তথ্যগুলি নিম্নরূপ :

১। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি (১ মাঘ ১২৬৩ সন) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সংবাদ—

> "বিজ্ঞাপন। —২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবে, দর্শক মহাশয়গণ সভারোহণ করত বাধিত করিবেন।
>
> কালীপ্রসন্ন সিংহ
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।"

১৭৭৮ শকাব্দের মাঘ মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৪৪ সংখ্যক পৃষ্ঠাতে পূর্বোক্ত ঐ বিজ্ঞাপনটি পরিবেশিত হয়।

২। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ১৪ জুন (১ আষাঢ় ১২৬০) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সভার আর একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়:

> "জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ।.... ৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।"

সুতরাং এই তথ্যের ভিত্তিতে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে গ্রহণ করা অসঙ্গত হবে না। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ পর্যন্ত বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। তারপর তিনি রাধানাথ বিদ্যারত্নের উপর সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশনে প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করতেন। আবার মণ্টেগু সাহেবের মতো বিদেশী ব্যক্তি সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হতেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিবিধানে উৎসাহ প্রদানের জন্য সভার পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হোত। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁর 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য রচনার জন্য সভার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করে সম্মান জানানো হয়। ঐ পুরস্কার-প্রদান-সভায় প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত হন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রী লঙ্ সাহেবের স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে তাঁর বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও বাঙালী-প্রীতি এবং ভারতহিতৈষণার জন্য সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে এই সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। সভ্যদের মধ্যে বিনামূল্যে এই পত্রিকা বিতরণ করা হোত। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' স্থাপিত হয়। এই রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' নাটক, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' নাটক ও 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের বিজ্ঞাপনে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ও নাটক রচনার ইতিবৃত্ত জানা যায়:

> "বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায় দুই তিনশত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয়

হয় নাই। পরে সেক্সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়।....

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসীগণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন।"

কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সভাসমিতি স্থাপনেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৬ বৈশাখ (১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল) শনিবার বাংলা সাহিত্যসেবীদের বছরে একবার একত্রিত করার অভিপ্রায় নিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামে সভা স্থাপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সভার অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উক্ত সভার নামকরণ করেন। সভায় সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, নাট্যাভিনয়, গীতবাদ্য পরিবেশন এবং সাহিত্যসেবীদের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় ও সভান্তে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হোত। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক সমবেত হতেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দে বিদ্বজ্জন সমাগম সভার অনুষ্ঠানের বিবরণী থেকে সভার স্বরূপটি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় :

"গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভা হইয়াছিল। প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিদ্বান ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সাহিত্য ও সঙ্গীতের আমোদ এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। সভাগৃহ কৃত্রিম তরুরাজি, পুষ্পমালা, আলোকাবলি ও সুন্দর আসনে সুশোভিত হইয়াছিল।

প্রথমে বাবু রাজনারায়ণ বসু বাঙলা ভাষার উৎপত্তি এবং বঙ্গকবি ও গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, পরে প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পঠিত হয়। তাহার পর রাজনারায়ণ বাবু কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে এইটুকু পাঠ করেন। অনন্তর হুতোম প্যাঁচা ও নবীন তপস্বিনী হইতেও কিছু কিছু পাঠ করা হয়। তদনন্তর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারত-ভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর।

পরে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা নামে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ও তদপেক্ষা অল্প বয়স্ক আর একটি বালক উভয়ে মিলিয়া সেতার বাজাইলেন। তাহার পর প্রতিভা পিয়ানোতে দুইটি গত বাজাইলেন, পরে ঐ দুটি শিশু ৩।৪টি হিন্দী গান গাইলেন। সে গান হার্মানিয়াম, বেহালা ও তবলার সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তাহার পর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণু বাবুর একটি গানে ঐ বালকটি তবলা সঙ্গত করিল। পরে আর ৪।৫টি গানের সঙ্গে প্রতিভা তবলা সঙ্গত করিলেন।'[১৭]

এই বিদ্বজ্জনসমাগম সভা উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কাল মৃগয়া' গীতিনাট্য দুটি রচিত হয়। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ ফাল্গুন শনিবার বিদ্বজ্জনসমাগম সভায় বাল্মীকি প্রতিভা অভিনীত হয় এবং উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ। কাল মৃগয়া অভিনীত হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শনিবারে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জন সমাগম সভায়। উভয় সভাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে অনুষ্ঠিত হয় এবং গীতিনাট্য দুটিতে রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুর-পরিবারের অন্যান্য বালক-বালিকা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে স্থাপিত দ্বিতীয় সভা 'কলিকাতা সারস্বত সমাজ'। এই সমাজের ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ২ শ্রাবণ (১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ ১৭ জুলাই) প্রথম অধিবেশন হয়। এই সমাজ স্থাপন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বলেছেন :

"এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণতঃ সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।"[১৮]

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলা ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারকে নিয়মবদ্ধ পথে পরিচালিত করা উক্ত সমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সমাজের প্রথম অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ রবীন্দ্রনাথের লেখা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়েছে :

"সারস্বত সমাজ

১২৮৯ সাল শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কী কী কার্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, বানানের উন্নতিসাধন। বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কিনা এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কিনা, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারো কাহারো মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্‌ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামসকল বাংলায় কিরূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে 'ভিক্টো[রিয়া' বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি V অক্ষরের স্থলে অন্তঃস্থ 'ব' সহজেই হইতে পারে। ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংলায় বিস্তর [গোল] যোগ ঘটিয়া থাকে—এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য। দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা যায়—ইংরাজি **isthmus** শব্দ কেহ 'ডমরু-মধ্য' কেহ বা 'যোজক' বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনটাই হয়তো সার্থক হয় নাই।—অতএব এই-সকল শব্দনির্বাচন বা উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন—এই সকল এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে, যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায়সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন—
স্থির হইল, বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য। তৎপরে তিন চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল—সারস্বত সমাজ। সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম নিম্নলিখিত মতে পরিবর্তিত হইল—যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল। [সমাজের] চতুর্থ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—সমাজের মাসিক

অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐকমত্যে [নূ]তন সভ্য গৃহীত হইবে। সভ্যগ্রহণ কার্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবেক।

সমাজের চতুর্বিংশ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল---সভ্যদিগকে বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবেক। যে-সভ্য এককালে ১০০ টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহাকে ওই বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবেক না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন—সভাপতি। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।"[১৯]

(পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে ছিন্ন থাকায় বন্ধনীর মধ্যে আনুমানিক পাঠ দেওয়া হয়েছে।)

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানের সুপরিকল্পিত পন্থা নিরূপণের প্রচেষ্টার মধ্যে সারস্বত সমাজের সুদূরপ্রসারী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই চিন্তাধারার লক্ষ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের পরিশীলিত রূপায়ণ ঘটানো এবং বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যাবহনক্ষম করে তোলা।

নবীন চিন্তার বীজ অবশেষে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' গঠনের মধ্য দিয়ে মহীরুহের আকার নিয়ে আজও সগৌরবে বিরাজমান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গঠনের একটি পশ্চাৎপট আছে। সিবিলিয়ান জন বীমস্ ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমির আদর্শে বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে নিয়মবদ্ধ পথে পরিচালিত করার জন্য একটি সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বহুবিতর্কের সোপান অতিক্রম করে তাঁর প্রস্তাব অবশেষে কার্যে পরিণত হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ২৩ জুলাই বিনয়কৃষ্ণ দেবের গৃহে ঐ প্রস্তাব ক্রমে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি স্থাপনে বঙ্গভাষা ও বাংলা সাহিত্যানুরাগী এল. লিওটার্ড নামে এক ফরাসী ও বাঙালী ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী অগ্রণী হন। অধ্যক্ষ সভার সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে বিনয়কৃষ্ণ দেব ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী।

সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার বিশুদ্ধিসাধন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাংলা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সভায় পঠিত হোত। সভার যাবতীয় কার্য

পরিচালনায় ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য ছিল। সভার নামে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাস থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় বাংলা রচনা অপেক্ষা ইংরেজি রচনার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ক্রমশই বাংলা ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য সভার অধিকাংশ সদস্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে থাকেন। উমেশচন্দ্র বটব্যাল 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার' নামটির পরিবর্তে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' নামকরণের প্রস্তাব করে অ্যাকাডেমিতে একটি পত্র প্রেরণ করেন। অবশেষে সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেবের পৌরোহিত্যে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ অনুষ্ঠিত সভায় বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার নামের পরিবর্তে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' নামকরণ হয় এবং সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও যাবতীয় কার্য বাংলা ভাষায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদ্-এর প্রথম সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত। সহকারী-সভাপতি হন নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সম্পাদক হন এল. লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু বৎসর পূর্তির পূর্বে লিওটার্ড পদত্যাগ করায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দ্বারা সম্পাদক পদের সেই শূন্য আসনের পূরণ হয়। পরিষদ্ পূর্ণ উদ্যমে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা ও উৎকর্ষতা বিধানের জন্য বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ-অভিধান সংকলন, প্রাচীন কাব্য-কবিতার সংগ্রহ ও প্রকাশ, অন্য ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিদেশী শব্দের পরিভাষা সংকলন প্রভৃতি কার্যে ব্রতী হয়। তাছাড়া দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির আলোচনা ও গ্রন্থ প্রকাশ এবং পরিষদের মুখপত্র প্রকাশ প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করে। পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক পদে বৃত হন রজনীকান্ত গুপ্ত। পরিষদ্ বাংলা ভাষা পঠন-পাঠনে সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অচিরেই এই প্রচেষ্টার সুফল ফলে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৩৭।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেই সময় পরিষদের সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সভাপতিত্ব কালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষদের স্থায়ী গৃহনির্মাণের জন্য জমি দান করেন। এই জমিতে নব নির্মিত ভবনে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর পরিষদের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। সেই থেকে পরিষদ্ আজও বাংলা ভাষা-সাহিত্য সেবার সুমহান্ ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

উপচ্ছেদ : বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি-সাধনে ও অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসারে সভাসমিতির ভূমিকা

উনিশ শতকে একদিকে যখন বাঙালী বিদ্বৎসমাজ ক্রমশ বাংলা ভাষা-সাহিত্য

চর্চা ও প্রসারের চেষ্টা করছিলেন তখন বিদেশী বিদ্বজ্জনের মধ্যে যেমন বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতিবোধের সঞ্চার হচ্ছিল তেমনি তাঁদের দ্বারা বাংলা ভাষায় দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রকাশ ছিল বাংলা ভাষাকে সর্বপ্রকার জটিলতা থেকে মুক্ত করে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রসারকল্পে সহজ পাঠোপযোগী মৌলিক ও অনুবাদমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করা। পূর্ববর্তী বাংলা ভাষা-সাহিত্যের জটিলতার লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সংস্কৃত ও ফার্সি-বিড়ম্বিত শব্দের আড়ষ্টতা, ভাবপ্রকাশে গ্রাম্যতাদুষ্ট অপরিচ্ছন্ন শব্দের ব্যবহার। এর ফলে বাংলা ভাষার গতিও যথেষ্ট শ্লথ হয়ে পড়েছিল। এই সব ত্রুটি থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করার জন্য এযুগে বিশেষ প্রচেষ্টা শুরু হয়। তাই বাংলা শব্দের সংস্কার, উপযুক্ত শব্দ সংগ্রহ এবং বিদেশী শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ সন্ধান প্রভৃতি কার্য বাংলা ভাষার উন্নতিকামী বিদ্বৎজন প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

এযুগের সভাসমিতির উদ্যোগের অচিরেই সুফল ফলতে লাগল। সাহিত্যের নানা শাখায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের দ্বারা নবগঠিত বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্বে বাংলা সাহিত্যসেবিগণ সঙ্গত কারণেই তাই বিবেচনা করেছিলেন যে, বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে প্রাগ্রসর সাহিত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে বাংলা ভাষায় উন্নততর ভাষা-সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুসরণ অপরিহার্য। বিচিত্র বিষয়, সমৃদ্ধ ভাব ও পরিবর্তমান উন্নততর রচনাশৈলীর সংস্পর্শে বাংলা ভাষা-সাহিত্য জীর্ণ প্রথানুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে বলেও এযুগের কবি-সাহিত্যিকগণ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাছাড়া চিত্ত-দুয়ার মুক্ত করে ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়ে এবং উন্নতিশীল সাহিত্যের সংস্পর্শে এনে বাঙালীর মানস-মুক্তিকে দ্রুততর করার জন্য উনিশ শতকের সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় অনুবাদ ও অনুসরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাসমিতিগুলি দেশী-বিদেশী ভাষার রচনাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করে জনশিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্যরস-পিপাসা তৃপ্ত করার জন্য যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে তাতে বাংলা সাহিত্যসেবিগণের মনে অনুবাদমূলক রচনা সৃষ্টির প্রেরণা ও সাহস সঞ্চারিত হয় এবং জনমানসেও অনুবাদমূলক সাহিত্য গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

নাটক ॥ বাংলা নাটকের মধ্যে এই অনুবাদ ও অনুসরণের প্রয়াস ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। দেশী-বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণে বাংলা নাটকের যুগান্তর ঘটে। এই অনুবাদ কোথাও আক্ষরিক, কোথাও ভাবানুবাদমূলক। এই অনূদিত নাটকের

মধ্যে পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকেরও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আছে। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বাংলা নাটকের সমৃদ্ধি ও শক্তি অর্জনে বিশেষ সহায়তা করেছে।

বাংলা ভাষায় ইংরেজি নাটকের অনুবাদ ও অভিনয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' পথিকৃত্ত্যের দাবী রাখে। প্রসন্নকুমার বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উৎকর্ষতা বিধানে গঠিত 'গৌড়ীয় সমাজে'র (১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ ১৬ ফেব্রুয়ারি) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারে উইলসনের ইংরেজি অনুবাদ 'বিক্রমোর্বশী' নাটক অবলম্বনে বাংলায় অনূদিত নাটক ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর অভিনীত হয় এবং এই সময় শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সীজারে'র শেষ অঙ্কও মঞ্চস্থ হয়। হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপিয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভিনিস্'-এর গদ্যপদ্যমূলক মর্মানুবাদ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক' (১৮৫২) রচনা করেন। তাঁর শেক্সপিয়রের 'রোমিও জুলিয়েটে'র অনুবাদ 'চারুমুখ চিত্তহরা নাটক' (১৮৬৪)-এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শ্যামাচরণ দাস দত্ত রো-এর 'দি ফেয়ার পেনিট্রেণ্ট' নাটকের অনুবাদ করেন 'অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক' (১২৬৩) নামে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (১৮৬০), 'মালতিমাধব' (১৮৬৭) প্রভৃতি নাটকগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) ও 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রেরণাতেই রচিত হয়। সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' (১২৬৬) এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিক্রমোর্বশী' (১২৭৫) সংস্কৃত মূল নাটকের অনুবাদ। বাণভট্টের গদ্য-আখ্যায়িকা 'কাদম্বরী'র অনুবাদ অবলম্বনে রচিত মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা নাটক' (১২৬৬), নিমাইচাঁদ শীলের 'কাদম্বরী নাটক' (১৮৬৪), কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরী নাটক' (১৮৭৭), গৌরসুন্দর চৌধুরীর 'কাদম্বরী গীতাভিনয়' (১২৮৫) উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ই'রেজি নাটক 'দি ফেট্যাল কিউরিঅসিটি' নাটকের অনুবাদ করেন 'চিত্তবিনোদ' (১৮৫৭) নামে।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে কলকাতায় একাধিক রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও বহু শক্তিশালী নাট্যকারের আবির্ভাবে বাংলা নাটকের গৌরবোজ্জ্বল পর্বের সূচনা হয়। বাংলা অনুবাদ-নাটকও এযুগে যথেষ্ট সংখ্যায় সৃষ্টি হয়। হরলাল রায়ের 'শত্রু সংহার নাটক' (১৮৭৪) 'বেণীসংহার নাটকে'র আখ্যান এবং 'কনকপদ্ম' (১৮৭৪) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক' অবলম্বনে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুনর্বসন্ত' (১৮৯৯) অনুবাদমূলক নাটক না হলেও শেক্সপিয়রের 'এ মিড সামার নাইট্স্ ড্রীম' নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুটি ফরাসী নাটকের অনুসরণে দুটি অনুবাদমূলক প্রহসন রচনা করেন,—মলিয়েরের 'ল বুর্জোয়া জঁতিয়ম' অবলম্বনে 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪)

ও 'মারিয়াম ফোর্সে' অবলম্বনে 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৯০৩)। তিনি একাধিক সংস্কৃত নাটকেরও অনুবাদ করেন, তবে অধিকাংশ নাটকই বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত। কালিদাসের নাটক অবলম্বনে রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৩০৬) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস ॥ উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস পাশ্চাত্য উপন্যাসের গঠনরীতি, কাহিনী ও চরিত্রের অনুকরণ এবং অনুসরণের দ্বারা আত্মশক্তি অর্জনে সক্ষম হয়। তাছাড়া পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুবাদও এযুগে যথেষ্ট হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের পদযাত্রায় উপন্যাসের আংশিক দাবীদার প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এ ডিকেন্সের পিকুউইক্ পেপার্স-এর অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র (১৯১৯ সংবৎ) দুটি আখ্যান 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' কন্টারেব 'রোমান্স অব হিস্টরি-ইণ্ডিয়া'র কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। তবে ভূদেব স্বকীয়তার দ্বারা কাহিনীর পরিণতি দান করেছেন।

এযুগে অসংখ্য অনুবাদমূলক আখ্যায়িকা রচিত হয়। তারাশঙ্কর তর্করত্ন বাণভট্টের কাব্যের ভাবানুবাদ 'কাদম্বরী' (১৮৫৪) এবং জনসনের গ্রন্থের অনুবাদ 'রাসেলাস' (১৮৫৭) রচনা করেন। শেক্সপিয়রের 'টুয়েল্‌ফ্‌থ নাইট' অবলম্বনে কান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত অনুবাদ 'সুশীলা চন্দ্রকেতু' (১৮৭২)। উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র 'গালিভারস্‌ট্রাভেলস্' অনুবাদ করেন 'অপূর্ব দেশ-ভ্রমণ' (১৮৭৬) নামে। বিপিনবিহারী চক্রবর্তী 'অদ্ভুত দিগ্বিজয়' (প্রথম খণ্ড ১৮৮৭) নামে ডন্ কুইকসোর্টের অনুবাদ করেন। রেনলড্‌সের প্রথম অনুবাদ 'লণ্ডন রহস্য' (প্রথম খণ্ড ১৮৭১) রচনা করেন হরিচরণ রায়। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বা 'আমার গুপ্তকথা' (১৮৭১-৭৩) পূর্বোক্ত গ্রন্থের অনুবাদ। বঙ্কিমের বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় স্কটের 'দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর'-এর অনুবাদ 'কমল কুমারী' (দ্বিতীয় সং ১২৯১) ও কলিন্‌সের 'দি ওম্যান ইন হোয়াইট'-এর অনুবাদ 'শুক্লবসনা সুন্দরী' রচনা করেন।

প্রবন্ধ ॥ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের অনুবাদ ও অনুসরণে এযুগের বাংলা প্রবন্ধ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাছাড়া পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক কোঁত, মিল, বেন্থাম প্রমুখের অভিমত এযুগের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকগণের চিন্তার পূর্ণতা সম্পাদনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অক্ষয় দত্তের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫২-৫৩) প্রবন্ধ গ্রন্থটি জর্জ কুম্বের **'The constitution of Man considered in Relation to External Objects'** গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩) গ্রন্থে হোরেস হেম্যান উইলসনের **'Sketch on the Religious sects of the**

Hindus'-এর অনুসরণ ঘটেছে। অবশ্য গ্রন্থটিতে অক্ষয়কুমার নতুন বিষয়ের অবতারণা করে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' (১৮৭৫) ডি কুইন্সি, স্কট ও লী হান্টের অনুসরণ ঘটেছে। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'জগতের বাল্য ইতিহাস' (১৮৭৫) গ্রন্থে এডওয়ার্ড ক্লডের 'Childhood of the World' গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন।

কাব্য-কবিতা ॥ এ যুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় দেশী ও বিদেশী কাব্য-কবিতার ব্যাপক অনুবাদ ও অনুসরণের দ্বারা সমৃদ্ধি ঘটেছে। এক ভাষার কাব্যবস্তুকে অন্য ভাষায় সফল রূপান্তর ঘটানো দীর্ঘ আয়াস ও অনুশীলন-সাপেক্ষ ব্যাপার এবং সাফল্যও সহজ লভ্য নয় জেনেও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন পাশ্চাত্য-ব্যঙ্গকাব্যের অনুবাদ 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮) রচনায় উদ্যোগী হন। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাবের যে-যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> "....এতদ্দেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোপীয় ফল মূল শাক শস্যাদি গ্রহণ স্বদেশীয় রুচি অনুসারে করিতেছেন স্বদেশীয় নিয়মে পাক করিয়া গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে শরীরের মাত্র পোষণ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না ?"

রঙ্গলাল ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'কুমার সম্ভব' কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ করেন। তবে অনুবাদটিতে শিল্পগুণ প্রকটিত হয়নি। কালীকৃষ্ণ দেব এই সময়ে 'হিতসংগ্রহ' (১৭৫৭ শক)-নামে গ্রে সাহেবের ফেব্‌লস্‌-এর কাব্যানুবাদ রচনা করেন। হরিমোহন কর্মকার (১২৬৫ সন) 'কুমার সম্ভবে'র সাত সর্গ অনুবাদ করেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁর অলোকসামান্য কাব্যপ্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যুগান্তর সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভা প্রকাশে আনুকূল্য দান করেছে প্রাচ্য-প্রশ্চাত্যের মহাকাব্য-কারগণের কাব্য-সম্ভার। তিনি তাঁর সেই মাধুকরী বৃত্তির কথা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১) অকপটে স্বীকার করেছেন। এই কাব্যে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার অনুসরণ করেছেন, তবে তাঁর প্রতিভার স্পর্শে তা' মৌলিক ও সফল সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। তিনি 'বীরাঙ্গনাকাব্যে' (১৮৬১) রোমক কবি ওভিদের পত্রকাব্যের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্যের ছন্দ, প্রকরণ ও সনেট-জাতীয় কবিতা রচনায় তিনি পাশ্চাত্য কবিদের অনুসরণ করেছেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও অন্যান্য কবি মধুসূদন-অনুসৃত পাশ্চাত্য কাব্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র বসু মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্যের সাত সর্গের ভাবানুবাদ করেন 'স্বর্গভ্রষ্ট' (১৮৬৯) নামে। তবে রচনা হিসাবে এটি ব্যর্থ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী' (১৮৭০) নামে রচিত গ্রন্থে টেনিসনের

'ইন মেমোরিয়াম'-এর অনুসরণ করেছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতাবলী' (১৮৬৯) নামে রচিত কবিতা সংকলন গ্রন্থে ড্রাইডেন, লঙ্‌ফেলো, পোপ, শেলি ও টেনিসনের কবিতার অনুবাদ বা অনুসরণ করেন যথাক্রমে 'ইন্দ্রের সুধাপান', 'জীবন-সঙ্গীত', 'মদন পারিজাত', 'চাতকপক্ষীর প্রতি', 'নববর্ষ' নামে কবিতায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) রূপককাব্য স্পেন্‌সারের ফেয়ারি কুইন্‌ ও বানিয়ানের পিলগ্রিমস্‌ প্রগ্রেস-এর আদর্শ অনুসরণে লেখা। বলা যেতে পারে আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতার মুক্তি ঘটেছে পাশ্চাত্য কাব্য-কবিতার আদর্শ অনুসরণে। বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে বাংলা কাব্য-কবিতায় রোমান্টিকতার যে বিস্তার ঘটেছে, তার মূলে পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিতাই প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. 'Friend of India'—May 20th, 1841, p. 305.

২. A. F. Salahuddin Ahmed—Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818—1835) p. 22.

৩. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (সং. ১৯৭১) পৃ. ৭৩

৪. British Paramountcy and Indian Reniassance, Prepared under the direction of Dr. K. M. Munshi, President, Bharatiya Vidya Bhavan, Part II, p. 47

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড) পৃ. ৬৯০

৬. 'সমাচার দর্পণ', ১২৭ সংখ্যা শনিবার (২১ অক্টোবর সন ১৮২০) ৬ কার্তিক সন ১২২৭

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড) পৃ. ৯

৮. 'সমাচার দর্পণ' (১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০)—দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড) পৃ. ১২৩।

৯. তদেব (১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩) তদেব, (২য় খণ্ড) পৃ. ১২৪।

১০. যোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলার নব্য সংস্কৃতি, পৃ. ১৬।

১১. 'সমাচার দর্পণ', ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬ (৪ পৌষ ১২৪৩)

১২. ভূদেব মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস, ৩য় ভাগ (২য় সং ১৩৩৫) পৃ. ২৯

১৩. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮০১ শক, ৪৩৫ সংখ্যা—দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ —সাময়িকপত্রে সেকালের সমাজচিত্র (২য় খণ্ড) পৃ. ৪৫৬—৪৫৭

১৪. যোগেশচন্দ্র বাগল—বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কথা—প্রবাসী, ১৩৬১ সন, চৈত্র

১৫. ঐ —বেথুন সোসাইটি (সাহিত্য পরিষদ্‌ সং) পৃ. ১১-১২

১৬. 'ভারতবর্ষ', শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ. ৩৩৪—৩৪১।

১৭. 'সাধারণী', ১২৮২, ৩ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬ মে, রবিবার), ৪ ভাগ, ৫ সংখ্যা, পৃ. ৫৬

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি (১৩৫৪) জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৫৫।

১৯. ঐ ঐ পৃ. ২৭৮—২৮০ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক—পৌষ ১৩৫০) শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ' প্রবন্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে সভাসমিতি ॥

জগৎ ও জীবনের ঘটনা সংঘটনের কারণগুলি দৈবনির্বন্ধ বলে দীর্ঘকাল-পোষিত ধারণার বিরুদ্ধে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীর মনে প্রশ্নমনস্কতা দেখা দিল। এই প্রশ্নমনস্কতার সূত্রেই সমকালীন বাঙালী বিদ্বৎসমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া জাতির জড়ত্বমোচন করতে এবং দেশ ও জাতির সর্বাত্মক অগ্রগতি ঘটাতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-নির্ভর আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্যতা এযুগের বিদ্বৎসমাজের মধ্যে বিশেষভাবে অনুভূত হল। পাশ্চাত্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমিক সাফল্য ও বিজ্ঞান-নির্ভর জনজীবনের অগ্রগতিই এক্ষেত্রে সমকালীন সচেতন দেশবাসীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অপর দিকে আমাদের বিজ্ঞান চর্চার দৈন্য বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো একটি লিখিত মন্তব্যে উল্লেখ করেন, 'It is a common remark that science and Literature are in a progressive state of decay among the natives of India.'[১] লর্ড মিন্টোর এই অভিমতের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটে। কোর্ট অব ডিরেক্টারসের সভ্যগণের প্রচেষ্টায় ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেন্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদপত্র পুনর্গ্রহণের সময় ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার একটি শর্ত আরোপ করে।[২] দেশীয় বিদ্বজ্জনের আগ্রহের সঙ্গে সরকারী উদ্যোগ এবং ভারতহিতৈষী ইউরোপীয়দের তৎপরতা মিলিত হয়ে বাঙালীকে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলার প্রয়াস শুরু হয়। এযুগে দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে বিজ্ঞান অনুশীলন সভাসমিতি এবং বিজ্ঞান চর্চার অনুকূলে অভিমত গঠনমূলক সভাসমিতি স্থাপনের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সভাসমিতি গঠনে উদ্যোগী বিদ্বজ্জন এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির আলোকে দেখলেন যে, দেশ ও জাতির সর্বাত্মক অগ্রগতির পথে বিজ্ঞানচর্চার বিকল্প কিছু নেই।

বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশীদের তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪)-র উদ্যোগে প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূচনা হয়। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল যদিও আমাদের আলোচনার সময়সীমার মধ্যে নয়, তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি এই সোসাইটির কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে চলছে বলে সঙ্গত কারণেই তা বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রাচ্য-বিদ্যায়

সুপণ্ডিত ও তদানীন্তন কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি স্যার জোন্সের আহ্বানে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় অনুরাগী ত্রিশজন ইউরোপীয় সুপ্রিম কোর্টের 'গ্রাণ্ড জুরী রুমে' সম্মিলিত হয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। জোন্স সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে **'Discourses on the Institution of a Society for enquiring in to the History Civil and natural, the Antiquities, Arts, Sciences and Literature of Asia'**-নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্যার জোন্স সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে অনুরোধ করেন, কিন্তু হেস্টিংসের সোসাইটির প্রতি পূর্ণ অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কাজের চাপের জন্য তাঁর পক্ষে ঐ পদ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। তিনি সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য জোন্সের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি জোন্স সভাপতির পদে নির্বাচিত হন।

সোসাইটির নাম পরিবর্তনের একটি ইতিবৃত্তান্ত আছে। সোসাইটির প্রথম নামকরণ হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বিলাতে এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে কলকাতার এই সোসাইটিকে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামে অভিহিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু কলকাতার এই সভা সেই প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে জেমস্ প্রিন্সেপ **'Journal of the Asiatic Society of Bengal'** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকাই ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে সভার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকলে ঐ পত্রিকার নামানুসারেই সোসাইটির নাম পরিবর্তিত হয়ে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠাবধি এই সোসাইটি ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের চর্চায় তৎপরতা গ্রহণ করে। এছাড়া সোসাইটি সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফার্সি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব বহন করতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচ্য-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলী 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' নামে অভিহিত হয়। শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্র থেকে জন ম্যাক-এর ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত **'Principles of Chemistry'** বা কিমিয়া বিদ্যার সার' নামক রসায়ন পুস্তকের সঙ্গে সোসাইটির একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। জন ম্যাক ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে সোসাইটি-গৃহে রসায়ন-বিদ্যা সম্পর্কে দুই প্রস্থ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা ও শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যাপনা কালে প্রদত্ত বক্তৃতার উপর ভিত্তি করেই তিনি রসায়ন-শাস্ত্র বিষয়ক এই গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩] গ্রন্থটিতে ইংরেজি ও তার বাংলা তর্জমা দেওয়া হয়েছে। সোসাইটি ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটির চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ক

আলোচনার যেমন সুযোগ করে দিয়েছিল তেমনি সাম্প্রতিক কালের ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন এই সোসাইটির দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য 'স্কুলবুক সোসাইটি'র (১৮১৭) অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। বিজ্ঞান-বিষয়ক ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন, ইংরেজি ভাষায় রচিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ এবং গ্রন্থগুলি বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচারের জন্য সোসাইটি বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। 'ঢাকা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ ১১ নভেম্বর) ও 'মুর্শিদাবাদ স্কুল সোসাইটি' (১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ ১৬ জুন) স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি গ্রাম বাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে রবার্ট মের 'মে গণিত' (১৮১৭), জন হার্লের 'গণিতাঙ্ক' (১৮১৯), পিয়ার্সের 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮১৯), ফেলিক্স কেরীর শরীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮২১), পিয়ার্সের 'ভূগোল' এবং 'জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন' (১৮২৪), লোসনের সচিত্র পশুবৃত্তান্ত 'পশ্বাবলী' (১৮২৮), ইয়েটস্-এর 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩) উল্লেখযোগ্য। রামমোহন রায় সোসাইটির প্রেরণায় 'জ্যাগ্রাফী' নামে ভূগোল রচনা করেছিলেন বলে সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে (১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর) উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটির মুদ্রণ সংবাদ পরবর্তী রিপোর্টে প্রকাশিত হয় নি। ই. এস. মণ্টেগু বাংলা প্রেসিডেন্সির একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি ভূপ্রাকৃতিক সংস্থান, জলবায়ু ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের উপর নির্ভর করেছিলেন। সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ ১৭ সেপ্টেম্বর) মানচিত্র মুদ্রণের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এই মানচিত্র বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে বাংলা দেশের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত অবগতির যেমন নির্ভরযোগ্য ও সহজ সুযোগের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি ছাত্রদের পক্ষে নিজের দেশকে বিশদভাবে জানবার ও চেনবার সুবিধা হয়। স্কুলবুক সোসাইটির এই উদ্যোগ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার দ্বারোদ্ঘাটন করে।

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে বোটানিক গার্ডেন প্রদত্ত জমির উপর 'এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলিয়ম কেরী এই সোসাইটির সভাপতি মনোনীত হন। দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সমিতি স্থাপিত হয়। সোসাইটির উদ্যোগে ইংরেজিতে প্রচারিত Transaction ও Journal-এ প্রকাশিত কৃষিবিদ্যা-বিষয়ক

প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করার জন্য একটি অনুবাদ সমিতি গঠিত হয়। সোসাইটি কর্তৃক ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তিসি বা মসীনের চাষের উপর লেখা 'Mashnabad' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সোসাইটির উদ্যোগে এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' নামে একটি সাময়িক গ্রন্থের ছটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শিবচন্দ্র দেব এই সাময়িক গ্রন্থে গাছের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করে সোসাইটির ধন্যবাদার্হ হন।[৪] এছাড়া সভার উদ্যোগে কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা, কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হত। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে জনচেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এই সোসাইটির চিন্তাধারার মহত্ব অনস্বীকার্য।

দীর্ঘকাল বন্ধ বিজ্ঞান চর্চার দুয়ার অর্গলমুক্ত হওয়ায় দেশহিতব্রতী বাঙালী বিদ্বৎসমাজও এগিয়ে এলেন দেশবাসীকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে অভিষিক্ত করার জন্য। প্রাচীন, নব্য ও মধ্যপন্থীদের একত্র সম্মিলনে 'এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে' ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজ ভবনে আহূত সান্ধ্য সভায় 'গৌড়ীয় সমাজ' স্থাপিত হল। বাংলা ভাষায় দেশীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাজের প্রচারিত উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।[৫]

চিকিৎসা ও শারীর-বিদ্যা চর্চার জন্য বিদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এদেশে প্রথম সভার নাম 'ক্যালকাটা মেডিকেল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি'। কলিকাতাস্থিত ইউরোপীয় চিকিৎসকরা ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ১ মার্চ শনিবার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে এই সভা স্থাপন করেন। সোসাইটির সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে ড. জেমস্‌হের সাহেব ও ড. অ্যাডাম। সোসাইটির পক্ষ থেকে ড. গ্রান্ট, ড. করবিন প্রমুখের সম্পাদনায় একটি মুখপত্র প্রকাশিত হত। ড. অ্যাডাম সাহেবকে সোসাইটির পক্ষ থেকে চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য মনোনীত করা হয়।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (১৮৩২) একটি ক্ষীণ সংযোগ আছে। এই সংযোগ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা ও পাঠের মাধ্যমে জনগণকে বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত করে তোলার মধ্য দিয়ে। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ, সাতকড়ি দত্তের 'চক্ষুর গড়ন' ও প্রসন্নকুমার মিত্রের 'কর্ণের গড়ন' সম্বন্ধীয় বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া প্রসন্নকুমার মিত্র ১৮৪২

খ্রীস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল 'on the Physiology of Digestion' নামে শরীরতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৬]

এই সময়ে স্পষ্টোচ্চারিত উদ্দেশ্য ঘোষণা করে 'Society for Translating European Sciences' বা 'ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা অনুবাদক সমিতি'র আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞানসেবধি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ৫ মে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখে :

> "এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশ্‌তেহার দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। এই সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপারে ডাক্তার উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে... ।"

এই সভার পক্ষ থেকেই ডবলিউ. এম. উলাস্টন, নবকুমার চক্রবর্তী ও গঙ্গাচরণ সেনের সম্পাদনায় 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' নামে একখানি পাক্ষিক দ্বিভাষী পত্রিকা ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। 'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে বিজ্ঞাপিত হয় যে, লর্ড ব্রোহেম সাহেবের ইংরেজিতে লিখিত গ্রন্থ ড. হোরেস হেমান উইলসনের নির্দেশে অমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক বাংলায় ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। লণ্ডের ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, এই সভার উদ্যোগে বাংলা ভাষায় 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৩৩) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চার ক্রমপ্রসারের ক্ষেত্রে এই সভা একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজন করে।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র (১৮৩৯ খ্রী. ৬ অক্টোবর) বিস্তৃত কর্মসূচীর মধ্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চারও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৭৬৭ শকের সভার সাম্বৎসরিক বিবরণ থেকে জানা যায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়' (১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুন) ছাত্রদের পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বিবরণে পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করার তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে :

> "এই পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত

> শাস্ত্র সকল প্রচারিত হইলে ক্রমশঃ তাঁহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক,....”

অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তত্ত্ববোধিনী সভায় ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার অসারত্ব প্রমাণ করেন :

কৃষকের পরিশ্রম = শস্য

কৃষকের পরিশ্রম + ভগবৎ প্রার্থনা = শস্য

ভগবৎ প্রার্থনা = ০

তাছাড়া অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় (১৮৪৩-১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দ) প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার আবেদনমূলক রচনা স্থান পায়। এই পত্রিকাতেই অক্ষয়কুমারের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (দুই খণ্ডে), 'পদার্থবিদ্যা,' 'ভূগোল' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেশবাসীর মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের জন্য আহ্বান জানিয়ে 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান' নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধটির উল্লেখযোগ্য অংশ-বিশেষ উদ্ধার্য :

> সাধারণ্যে শিক্ষাপ্রচারই দেশের দুরবস্থা দূর করিবার প্রধান উপায়, কিন্তু এই শিক্ষা বুদ্ধিপ্রধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি নানা-বিষয়-ব্যাপিনী হইয়া বাহ্য প্রকৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল আয়ত্ত করিতে পারে এক্ষণে সেই শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষাই বিজ্ঞান-শিক্ষা। ইউরোপের কোন কোন জাতি যে পার্থিব মান-সম্ভ্রমের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চাই তাহার প্রধান কারণ। আমরা অবশ্য অস্বাধীন জাতি, তন্নিবন্ধন অনেক আশা আমাদের চরিতার্থ না হইবার কথা কিন্তু দেশ-হিতকর এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা আমরা এই হীন অস্বাধীন অবস্থাতেও সম্পাদন করিতে পারি ইহাই এই বিজ্ঞানচর্চ্চা। এতদ্ব্যতীত দেশাবচ্ছেদে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে পারে না। এখন নানা স্থানে অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহাতে আজও এমন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যদ্দারা বুদ্ধির একটা প্রকৃত শিক্ষা হয় এবং সেই শিক্ষার বলে লোক স্বাধীন ভাবে জীবিকা-সংস্থান করিতে পারে। বর্ত্তমানে যেরূপ শিক্ষা হইতেছে তদ্দারা কেবল মসিজীবির দলই বাড়িতেছে ; এখন যাহাতে কৃষিজীবি, যন্ত্রজীবি ও শিল্পজীবির দলপুষ্টি হয় এরূপ শিক্ষা আবশ্যক।

সত্য বটে এখন কিছু কিছু বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছে কিন্তু তাহা ইংরাজী ভাষায়। এবং যে যে বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা হয় সর্ব্বসাধারণে ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া তাহার ফল পাইতে পারেন না। আরও একটা কথা এই যে, যে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুশীলন হইতেছে তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক। তাহারা বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু মাত্র আয়ত্ত করিলেন কিন্তু সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিয়া কি পরিমাণে যে স্বদেশের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু বিজ্ঞান যাহাদের জীবিকার উপায় হইবে সেই শ্রমজীবিদের মধ্যে যত দিন ইহার বিশেষ চর্চ্চা না হইতেছে ততদিন ইহা দ্বারা এতদ্দেশের কোন উপকার দর্শিতেছে না। অতএব যে উপায়ে বিজ্ঞান সেই শ্রম-জীবিশ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পায় তজ্জন্য সাধারণের যত্ন ও চেষ্টা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প শাস্ত্র বিজ্ঞান হইতে প্রসূত। বিজ্ঞান ব্যতীত শিল্পের উন্নতি হয় না। এক্ষণে এই বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রন্থের নানা বিভাগ ভূরি পরিমাণে অনুবাদিত হউক। বিজ্ঞান ও শিল্পের নানা বিভাগ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইলে সকল লোকেরই সুবিধা হইতে পারিবে।....আমরা বলি যাঁহারা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহারা দেশীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করুন। আর সেই সমস্ত গ্রন্থ নিম্নতম বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ হউক, তাহা হইলে ক্রমশঃ বিজ্ঞান-তত্ত্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে থাকিবে এবং দেশীয় উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর লোক রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নানা রূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিয়া লইতে পারিবে।....এক্ষণে অনুবাদের বিষয় বিবেচ্য। বিজ্ঞানের অনুবাদে একটু বিশেষ সাবধানতা চাই। বিজ্ঞানের ভাষা যত সহজ সরল হইবে ততই ভাল। এমনকি এদেশীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের এইরূপ ভাষা হওয়া চাই।"[৭]

তত্ত্ববোধিনী সভা বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে জনচেতনা জাগ্রত করার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। বিজ্ঞান চর্চাই যে সৌভাগ্য অর্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা এই সত্যোপলব্ধি জনমানসে সঞ্চারিত করার জন্যই তত্ত্ববোধিনী সভা সচেষ্ট হয়েছিল।

১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ জুন মস্তিষ্কবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার জন্য 'ফ্রেনল-জিক্যাল সোসাইটি' স্থাপিত হয়। সোসাইটির অন্যতম সভ্য রাধাবল্লভ দাস ১৮৫০

খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে 'ইশপর্জিম ও কোমব'-এর ফ্রেনলজি গ্রন্থ ও ফ্রেনলজিক্যাল চার্ট থেকে সারসংগ্রহ করে 'মনস্তত্ত্ব সারসংগ্রহ' (১২৫৬) গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত—গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মনোবিদ্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ডে মনের ইন্দ্রিয়গুলির বিবরণ এবং তৃতীয় খণ্ডে মনের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-পদ্ধতি বিন্যস্ত হয়েছে।

১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের কিছু সংখ্যক নব্য শিক্ষিতের উদ্যোগে সাহিত্য চর্চা ও সামাজিক হিতসাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত 'পারসি-ভিয়ারেন্স সোসাইটিতে' বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা ও পাঠ হত। সোসাইটির সভাপতি ছিলেন মধুসূদন দত্তের সুহৃদ্ গৌরদাস বসাক। বৈষ্ণবচরণ বসাকের গৃহে প্রতি সোমবার সভার প্রথম দিকের অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হত। মেডিকেল কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা এই সভায় যোগদান করায় বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার পরিবেশ গড়ে ওঠে। জয়গোপাল সেনের গৃহে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ থেকে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার সংবাদ জানা যায়।[৮] উক্ত অধিবেশনে সভাপতি গৌরদাস বসাক অর্জিত-বিদ্যাকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত করার আহ্বান জানান।

মহাত্মা বেথুনের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মেডিকেল কলেজ হলে ড. এফ. জে, মৌএট-এর নেতৃত্বে দেশী ও বিদেশী বিদ্বজ্জনের মিলিত উদ্যোগে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় 'বেথুন সোসাইটি' স্থাপিত হয়। সোসাইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়ঃ

> That a Society be established for the consideration and discussion of questions connected with literature and science.'

—এই ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে জানা যায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়। পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের উপর গুরুত্বপূর্ণ ও মনোজ্ঞ আলোচনা হয় এবং এই আলোচনাগুলি বাংলাদেশের বিদ্বৎমহলে বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার করে। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যে ঢাকায় স্থাপিত 'ব্রাঞ্চ বেথুন সোসাইটি' নামে শাখা-সমিতি একই আদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। এই শাখা-সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা কলেজের ছাত্র ও পরবর্তী ডেপুটি রামশঙ্কর সেন মূল সোসাইটিতে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কে 'On the Present State and future prospects of Agriculture in Bengal' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল গুডউইন Civil Engineering and Architecture' ও কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হেনরি উড্রো Electric Telegraph-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সোসাইটির তৃতীয় বর্ষে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ মার্চ

অনুষ্ঠিত সভায় ড. এইচ. এম. গ্রীনবো Phrenology-র উপর বক্তৃতা করেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মাসিক অধিবেশনগুলিতে এইচ. স্টার্লিং Electro-magnetism ও জি. ইভান্স 'On chemistry applied to Agriculture'-সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ নভেম্বর থেকে ড. আলেকজাণ্ডার ডাফের সভাপতিত্বে বৎসরে ছ'মাস সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার জন্য ছ'টি বিভাগ গঠিত হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে তৃতীয় বিভাগটির 'Science and Arts' নামকরণ করা হয়। সভায় বিজ্ঞান-বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ প্রদানের দায়িত্বভার স্মিথ সাহেবের উপর অর্পিত হয়। ১৮৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দের অধিবেশনগুলির মধ্যে আর্চডেকন প্রাট্-এর বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী নিউটনের উপর 'Sir Issack Newton : his discoveries and his character' নামে আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে সভার পঞ্চম অধিবেশনে ড. ম্যাক্‌নামারা 'Heat'-এর উপর একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে পদার্থ-বিদ্যার এই বিশেষ বিষয়টি আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করেন। বেথুন সোসাইটি এই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চায় প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা মিলিত হয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সভা স্থাপন করেন। সভাটি স্থাপনের বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন ছাত্র ও পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন। সভার সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. এইচ. হেলিউর। এই সভার অধিবেশন প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হত। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বেথুন সোসাইটির রিপোর্টে পূর্ব বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণে এই সভার নাম উল্লেখ না করে সভার কার্যক্রমের আলোচনা করা হয়।[৯]

সোসাইটির অধিবেশনে পাদরী লঙ্ ও ইউনিটেরিয়ান পাদরী সি. এইচ. এ. ড্যাল যোগদান করতেন। এছাড়া কেশবচন্দ্রের সহযোগী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ছাত্রেরা উপস্থিত থাকতেন। এই সভা ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯ আগস্ট একটি আবেদন করে 'বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৭ এপ্রিল বড়বাজারবাসী রামমোহন মল্লিকের গৃহে স্থাপিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের পৌত্র প্রসাদদাস মল্লিক। পাদরী লঙ্ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এবং ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দু'দফায় সভার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। পাদরী কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাস থেকে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে সভার সভাপতিত্ব করেন।

বহু বিশিষ্ট ইংরেজ এই সভায় যোগদান করতেন। সভায় বাংলা ও ইংরেজিতে সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-সম্পর্কিত প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান ছাড়াও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা হত। সভায় বিভিন্ন সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালবিহারী দে, বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সভায় কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয় এবং 'How to improve Indian Agriculture and the condition of the Agriculturist'-শীর্ষক বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ও কুঞ্জবিহারী দেবের রচনা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।[১০]

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত প্রয়াস যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে অচিরেই সুসংহত ভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে আধুনিক সভ্যতায় সমৃদ্ধ জীবনোপভোগের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্য বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তান ড. মহেন্দ্রলাল সরকার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় সর্বোচ্চ উপাধি অর্জন করে তিনি দেশ ও জাতির উন্নতি বিধানে যত্নবান হলেন। তাঁর পরিচালনাধীনে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকার ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট সংখ্যায় তিনি ভারতবাসীর বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে লিখিত একটি প্রবন্ধে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' (Indian Association for the Cultivation of science) স্থাপনের প্রস্তাব করেন। অচিরেই ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি এই সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করেন। পরে আরও বিশদভাবে রচিত তাঁর এই সভার অনুষ্ঠানপত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দ ভাদ্র সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানপত্রটি নিম্নরূপ:

"ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা

অনুষ্ঠানপত্র

'জ্ঞানাৎ পরতরো ন হি'

১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতূহল জন্মে। যদ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞান শাস্ত্র কহে।

২। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ও সমাদর ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অনেকগুলির প্রথম

বীজরোপণ প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে ; নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থসকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা স্থাপন করিবার জন্য একটী গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিবিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটী আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

৬। এই সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে কিম্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠাতা
শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই অনুষ্ঠানপত্রের সমর্থনে বঙ্গদর্শনের একই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বাঙালীর পক্ষে বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করে দেশবাসীকে মহেন্দ্রলাল-প্রস্তাবিত সভা স্থাপনে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দানের জন্য ব্যাকুল আবেদন জানান। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমর্থন-জ্ঞাপক প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধার্য :

"২। ...হা অদৃষ্ট। বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। "বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু। মনে করুন, কোথাকার অন্নকষ্টে কোথায় পরিচ্ছদ কষ্ট হইল। ঐন্দ্রজালিক বিজ্ঞান স্বীয় অবমাননার জন্য এইরূপে বৈরিসাধন করিল। এক্ষণে ভুক্তভোগী লোক শিক্ষা গ্রহণ কর।

অনেকে বলেন, ইউরোপীয়রা কেবল বাহুবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। বাহুবলেই বলুন, আর যাহা বলুন, সে কথা কতক দূর সত্য, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাটিও অত্যুক্তি দোষে দূষিত কথনই বলা যাইতে পারা যায় না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন। বিজ্ঞানেই সতত চালনা করিয়াই বিদেশীয় বণিকৃদিগকে ভারততীরে আনয়ন করেন, বিজ্ঞানই নানা যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন—এথনও বিজ্ঞান মহায়স শকট বাহনে, তড়িৎতার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, আয়োগোলক বর্ষণে এই বীবপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদেব প্রভু হইয়াছে। আমবা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমবা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।

৩। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিজ্ঞান অবহেলার জন্য আমরা দিন২ বিদেশীয় জাতিগণের আয়ত্তাধীন হইতেছি; বস্তুবিচারে অক্ষম হইয়া কদন্ন ভোজনে. অপেয় পানে, অপরিশুদ্ধ বায়ু সেবনে দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছি। 'সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ও তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা সভা স্থাপিত হইবে।' আমরা এই প্রস্তাবের কায়মনোবাক্যে অনুমোদন করিতেছি। অনুষ্ঠাতার মঙ্গল হউক, অনুষ্ঠান সফল হউক।"

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে এইভাবে বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চার একটি সুস্থির নীতি ও পথ নির্দিষ্ট হয়। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ এপ্রিল ও ২০ নভেম্বর মহেন্দ্রলাল তাঁর এই সুমহান্ কর্মযজ্ঞের সূচনার জন্য অনুগামীদেব নিয়ে দুটি সভা করেন। অবশেষে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' বা 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কমলকৃষ্ণ

এব, রমেশচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৌলবী আবদুল লতিফ ও ড. মহেন্দ্রলাল সরকার সভার ট্রাস্টি মনোনীত হন। সভা-পরিচালনার নিমিত্ত গঠিত অধ্যক্ষ সভার সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে স্যার রিচার্ড টেম্পল ও ড. মহেন্দ্রলাল সরকার এবং অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন ফাদার ই. লাফোঁ, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ দাস, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র ঘোষাল, কানাইলাল দে, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, রমানাথ লাহা, নীলমণি মিত্র, যদুনাথ ঘোষ, প্রাণনাথ সরস্বতী, কৃষ্ণদাস পাল, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, মৌলবী আবদুল লতিফ, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অন্নদাপ্রসাদ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজেন্দ্র দত্ত, যদুনাথ মল্লিক, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ।

নবগঠিত এই সভায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টেম্পল সাহেবের ব্যক্তিগত পাঁচ শত টাকা সাহায্য দান এবং সরকারের সাহায্যে বৌবাজারে নির্মিত সভার স্থায়ী ভবনের ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ২৯ জুলাই দ্বারোদঘাটন হয়। পরে সভা ঐ ভবনটি ক্রয় করে। সভায় বিস্তৃতভাবে গবেষণার জন্য কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পঁচিশ হাজার টাকা এবং ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা চব্বিশ হাজার টাকা দান করেন। কোচবিহারের মহারাজা ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের বেতনেব জন্য একশত টাকা বেতন হিসাবে নিয়মিত দান করেন। সভায় বিনা বেতনে অধ্যাপনা কার্যে ইউজিন লাফোঁ, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, ড. চুনীলাল বসু, মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ বসু, বনোয়ারীলাল চৌধুরী, ড. অমৃতলাল সরকার, গিরীশচন্দ্র বসু প্রমুখ নিয়মিত যোগদান করতেন। সভায় যে সকল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গবেষণাকার্যে রত ছিলেন তাঁদের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে ড. চুনীলাল বসু, রসায়ন বিষয়ে রসিকলাল দত্ত, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ উল্লেখযোগ্য। ড. মেঘনাদ সাহা ১৮৪৬-'৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে এই সভা যাবতীয় গবেষণা দ্রব্যাদি সহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা বিজ্ঞানচর্চার প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে বাঙালী ও বাংলাদেশের গৌরবময় কীর্তি এবং সম্ভাবনায় ভবিষ্যতের ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপচ্ছেদ : বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রসারে সভাসমিতির প্রভাব

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সভাসমিতির উদ্যোগ-আয়োজন দেশীয়

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে একদিকে যেমন আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল অপরদিকে তেমনি বাংলা সাহিত্যসেবিগণকে বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছিল। বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং নব-নব উদ্ভাবিত বস্তু-সামগ্রীর পরিচয় অভিনব সাহিত্য-বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়ে সমকালীন সাহিত্যিকগণের রচনাকৌশল ও পরিবেশন-নৈপুণ্যের সাহায্যে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে সমভাবে আদৃত হয়। এইভাবে উনিশ শতকে বিজ্ঞান-সাহিত্যের সূচনা হয়। এই শ্রেণীর রচনায় অজানাকে জানার আগ্রহ যেমন পরিতৃপ্ত হয়েছে তেমনি উপরি পাওনা হিসাবে পাঠকের মিলেছে সাহিত্যরস। আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বজটিল বিষয়গুলির আবেদন যেখানে দীক্ষিতজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেখানে সাহিত্যরসের মিশ্রণে সৃষ্ট নতুন যৌগ এই বিজ্ঞান-সাহিত্য সাধারণের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হল। বিজ্ঞান-সাহিত্য সভাসমিতির আবেদনকে পরোক্ষভাবে আরও সম্প্রসারিত করেছে।

এযুগের যে সকল মনস্বীব্যক্তি সমাজহিতৈষণাকে তাঁদের সাহিত্যিক প্রয়াসের সঙ্গে সমন্বিত করেছিলেন অথবা দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নতিবিধান ছিল যাঁদের সাহিত্যিক-এষণার মূল প্রেরণা তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ বিজ্ঞান-সাহিত্যে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত সত্যকেও কিছু কিছু পরিস্ফুট করেছেন। এই শ্রেণীর রচনাগুলির উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা এবং শিক্ষার্থিগণকে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ দেওয়া।

বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি যুক্তিবাদ ও বস্তুধর্মের আলোকে মানব প্রকৃতির তত্ত্ব বিচারে জর্জ কুম্ব-এর 'The constitution of Man considered in Relation to External objects'-গ্রন্থের অনুসরণে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫৩) রচনা করেন। জগৎ-ব্যাপারের অন্তরালে কার্যকারণবদ্ধ বস্তু-সত্তার অবস্থিতির বিশ্লেষণই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। অক্ষয়কুমার তাঁর এই গ্রন্থে জর্জ কুম্বের অনুসরণ করেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নেও অক্ষয়কুমার উদ্যোগী হন। তাঁর 'ভূগোল' (১৮৩১) গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে রচিত হয়। বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর তিনখণ্ডে লিখিত 'চারুপাঠ' (১ম খণ্ড ১৮৫৩, ২য় খণ্ড ১৮৫৩, ৩য় খণ্ড ১৮৫৯) গ্রন্থটি বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। বিভিন্ন ইংরেজি রচনার অনুসরণে লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অক্ষয়কুমার যথেষ্ট মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ

গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীর ও স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অক্ষয় দত্তের বিজ্ঞান-সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা সেযুগে যথেষ্ট সমাদৃত হওয়ায় বহু দেশপ্রাণ-সাহিত্যিক এই জাতীয় রচনায় সাহসী হয়ে এগিয়ে এলেন। বিদ্যাসাগরের মতো অদীক্ষিত ব্যক্তি স্বজাতি ও স্বদেশ হিতৈষণাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানীর জীবন ও আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত বস্তুকে তাঁর পরিবেশন নৈপুণ্যের দ্বারা উপস্থাপিত করলেন। বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাই ছিল তাঁর এই জাতীয় রচনায় ব্রতী হওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' (১৮৫০) গ্রন্থে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন-কাহিনীর সঙ্গে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের জীবনীও স্থান পায়। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের জীবনী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চায় প্রেরণা সঞ্চার করবে—এই বিশ্বাসবোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি এই পরিকল্পনা করেন। 'চেম্বার্স রুডিমেন্ট অব নলেজ' গ্রন্থের অনুসরণে রচিত তাঁর 'বোধদয়' (১৮৫১) গ্রন্থে প্রাণি, উদ্ভিদ, পদার্থ, রসায়ন, ভূগোল ও ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত রচনা স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের রচনায় প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি ও গদ্যের স্বাদুতা বজায় রাখার জন্য অনেক প্রাসঙ্গিক অথচ জটিল তত্ত্বকে তিনি সচেতন ভাবেই পাশ কাটিয়ে গেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে মডেল স্কুলের ছাত্রদের জন্য লিখিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার' (সংবৎ ১৮১৫) গ্রন্থে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে রচনা স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থে কাচ, স্বর্ণ ইত্যাদি বস্তুর আবিষ্কার সংক্রান্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-নির্ভর আলোচনায় ছাত্রদের মনে কৌতূহল সঞ্চারের চেষ্টা আছে।

বাংলা সাহিত্যে খ্যাতকীর্তি বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ ও বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫) গ্রন্থে বিজ্ঞানের জটিল রহস্য পরিবেশন-নৈপুণ্যে কিভাবে সাহিত্যের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন হতে পারে তা' প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের তত্ত্বকঠিন শুষ্কতাকে সাহিত্যরসে জারিত করে উপভোগ্যতা দান করেছেন। বিভিন্ন ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে সংকলিত বিষয়বস্তু তাঁর রচনাসৌকর্যে অপূর্ব সাহিত্যশ্রী মণ্ডিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে জীব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক জটিল রহস্যের সরস বিশ্লেষণমূলক নয়টি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তিনি প্রবন্ধগুলিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিশ্লেষণ করেও নিজস্ব একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞানের কৃতবিদ্য ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বস্তুবিচার তাই অপূর্ব সাহিত্য-বস্তুতে পরিণত

হয়েছে। তাঁর প্রথম জীবনের রচনাবলী 'প্রকৃতি' ('১৮৯৬) বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক হয়েও বিজ্ঞান-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়েও তাঁর সংশয়ী মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই সংশয়ী মনোভাব বিজ্ঞানের রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত নয়, সাহিত্যের শর্তের প্রতি তা' আনুগত্যমূলক। আলোচ্য গ্রন্থে 'জ্ঞানের সীমানা' ও 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধ দুটিতে এই সংশয় প্রকট হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের জটিল জিজ্ঞাসাকে সর্বজনবেদ্য করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যিক প্রয়াসের একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উদ্ধার্য :

> "আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, অতএব অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূমণ্ডলটা যদি কিছু দিনের মধ্যে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাডস্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বনের পরিবর্তে আইরিশ হোমরুল লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।" (প্রলয় : প্রকৃতি)

বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাঙালীর বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টিতে বহু ব্যক্তি প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাই কেবল এই প্রসঙ্গে আলোচিত হল এবং বিজ্ঞানের কৃতি পুরুষ রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানকে সাহিত্য বস্তুতে উন্নীত করায় তা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয় সাহিত্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়ে সাহিত্যের সীমানাকে যে সম্প্রসারিত করেছে, তাতে বিজ্ঞান-বিষয়ক সভাসমিতিগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ বাংলার দেশাত্মবোধ ও রাজনীতিক আন্দোলনে সভাসমিতির ভূমিকা ॥

ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকে বাঙালীর জাতীয় জাগরণের যে সকল লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে তার মধ্যে স্বদেশানুরাগ ও দেশাত্মবোধের স্ফুরণ অন্যতম। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনুদার দৃষ্টিপাত এবং ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ দেশবাসীর অন্তরে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সৃষ্টি করে। সেই আগ্রহ থেকেই স্বদেশানুরাগ ও দেশাত্মবোধ জন্ম নিয়ে পরিশেষে তা' বিদেশী শাসন-শৃঙ্খল থেকে জাতির মুক্তিলাভেচ্ছায় পরিণত হয়। তাছাড়া বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের দেশবাসীর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা ও অবিচার বাঙালীর চিত্তে নবজাগ্রত মর্যাদাবোধকে ক্রমাগত আহত করছিল। সেই আহত মর্যাদাবোধ ক্রমশই বাঙালীকে দেশের প্রতি আত্মনিবিষ্ট করেছে এবং বাঙালীর অন্তরে স্বাধিকারবোধের জন্ম দিয়েছে। এই ভাবেই বিদেশী শাসন থেকে জাতির মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

স্বদেশানুরাগ ও দেশাত্মবোধের সমীকরণ ঘটিয়ে বাঙালীকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে যেসব মাধ্যম সর্বাধিক সক্রিয় হয়েছিল এযুগের সভাসমিতিগুলির ভূমিকা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। সমকালীন সভাসমিতিগুলি জাতীয় জাগরণের সপক্ষে গণচেতনা সৃষ্টিতে ও জনমত গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সভাসমিতিগুলি এই উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা ও বিদেশী শাসকের কাছে সেই অধিকার দাবী করা, দেশবাসীর অন্তরে আত্মশ্লাঘাবোধ জাগ্রত করে হতাশা থেকে মুক্তি ঘটানোর জন্য দেশের সকল বিষয়ের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করা ছিল অন্যতম বিষয়। দেশে স্বাদেশিকতার আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য এই জাতীয় সভাসমিতিগুলি দেশবাসীর অন্তরে দেশীয় আচার-আচরণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়। উনিশ শতকের শেষপাদে এই সভাসমিতিগুলি আরও সম্প্রসারিত ও পরিণত রূপ নিয়ে দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে দেয়।

এই জাতীয় সভাসমিতির মধ্যে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র (১৮২৮) নাম সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ২মে হিন্দু কলেজে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও চতুর্থ শিক্ষক হিসাবে যোগদানের পর তাঁর সভাপতিত্বে অ্যাকাডেমিক

অ্যাসোসিয়েশন নামে এক বিতর্ক-সভা স্থাপনের মধ্য দিয়ে হিন্দু কলেজের পাঠরত ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও স্বদেশ-ভাবনার মুক্তাঙ্গন সূচিত হল। অবশ্য ডিরোজিও ইতিপূর্বে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের আলাপ-আলোচনা ও পরস্পর স্বাধীন মতামত বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়ে নব্যবঙ্গের চিত্তে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্ক সভায় নব্যবঙ্গের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শিবচরণ দেব প্রমুখ যোগদান করতেন এবং সভায় মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে উৎসাহ প্রদান করতেন তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপ্স্ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিল, বাংলাদেশের পরবর্তীকালের ডেপুটি গবর্নর ডবলিউ. ডবলিউ. বার্ড ও বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্নেল বীটসন প্রমুখ। সভার বিতর্ক বিষয়ের মধ্যে 'the nobility of patriotism' বা 'স্বদেশপ্রেমের মহত্ত্ব' ছিল অন্যতম বিষয়।[১] সভার সদস্যদের উদ্যোগে 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশের স্থায়ীভাবে বসবাস', 'বিচার-আদালতে অনাচার-অবিচার' শীর্ষক সভার বিতর্কমূলক রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় মুদ্রিত হওয়ায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়েন এবং অধ্যক্ষ সভার নির্দেশে সহ-সভাপতি ড. হোরেস হ্যেমান উইলসন পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ বন্ধ করে দেন।[২] এই বিধিনিষেধ নব্য-বঙ্গের চিত্তে বন্ধন মুক্তির ইচ্ছাকে নির্বাপিত করতে পারে নি। কারণ, উদ্ভিন্ন যৌবনে নব্যবঙ্গের অন্তরে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে দিয়েছিল পরবর্তীকালে তার সুসংহত প্রকাশ ঘটল এঁদের মধ্যে।

স্বদেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে সমকালীন ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ ক্রমশ সঞ্চারিত হতে থাকে। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গহিত' নামে স্থাপিত ছাত্রসভার একটি বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] কলকাতা থেকে দ্বাদশক্রোশ দূরে অবস্থিত এক চতুষ্পাঠীর কতিপয় ছাত্র এই সভা স্থাপন করেন। সভায় ছাত্রদের প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে যে দুটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে তা' থেকে ছাত্রদের স্বদেশ-চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয় দুটি যথাক্রমে 'অস্মাদাদির দেশের লোকেরা পূর্বাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ দুঃখী হইয়াছে' এবং 'স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্মূল্য হইবার কি কারণ হইয়াছে'। সভায় বক্তৃতার বিষয়গুলি প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে মীমাংসিত হত।

সুসংহত রাজনৈতিক চিন্তার প্রথম সভা 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'। এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের

উন্নতিকল্পে এই সভা স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক সভায় রূপান্তরিত হয়। সভার কর্মাধ্যক্ষগণের পরিচয় ও সভা স্থাপনের ইতিবৃত্তান্ত চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় সভার রাজনৈতিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করাই অভিপ্রেত।

সভার ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতি পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ পূর্ববর্তী অধিবেশনের স্থিরীকৃত 'দুঃখ হইতে সুখ জন্মে কি সুখ হইতে দুঃখ' এই বিষয়ের উপর আলোচনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রামলোচন ঘোষ আলোচ্য বিষয়ে সভার দশম নিয়মের বিরোধী ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে এরূপ বিবেচনা করে আপত্তি জানান এবং ধর্মনীতি ও রাজকার্যাদি বিষয়ে যেখানে দেশের ইষ্টানিষ্টের বিষয় জড়িত সে সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কালীনাথ রায় ও মহেশচন্দ্র সিংহ এই মর্মে নানা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে বক্তৃতা করেন এবং তাঁদের বক্তব্য সভায় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। কালীনাথ রায় তাঁর বক্তৃতার পরিসমাপ্তিতে দেশের পক্ষে অহিতকর রাজসংক্রান্ত বিষয়ের নিবারণের জন্য সভাকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান এবং তার জন্য আদালতে আবেদন করা বা অন্যবিধ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাবও সভায় উপস্থিত সভ্যগণের দ্বারা বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয় এবং সভার সম্পাদক দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন সভার নিয়মাবলীর মধ্যে কালীনাথের প্রস্তাবকে সন্নিবেশিত করেন। এই সভাতেই রামলোচন ঘোষ সরকারের নিষ্করভূমির উপর কর স্থাপনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবের পক্ষে কালীনাথ রায় ও সভাপতির অনুমোদন সকল সভ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়ে স্থির হয় যে, চারজন সভ্য উক্তবিষয়ের যথাযোগ্য উত্তর লিখিত আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপিত করবেন। কিন্তু রামলোচন ঘোষ নিষ্কর ভূমির উপর কর স্থাপনের সরকারী উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করায় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা এ বিষয়ে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি; অবশ্য সভা এখানে থেমে না থেকে সরকারী কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করার জন্য নূতন এক সভা স্থাপন করে সরকারের কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ প্রেরণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে এক অনুষ্ঠানপত্র প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সভার একটি সংবাদ উদ্ধার্য:

> "গত রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমাজের এক অন্তঃপাতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন শ্রীযুত কালীনাথ রায় শ্রীযুত

রামলোচন ঘোষ শ্রীযুত পেয়ারীমোহন বসু শ্রীযুত মহেশচন্দ্র সিংহ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ বসু ইত্যাদি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজারা নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ আরম্ভ করিলেন এতএব এতদ্দেশীয় চারি পাঁচ সহস্র লোকের নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক রাজদ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিবেচনার্থ অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্দিগস্থ এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকসকলকে জ্ঞাত করা যায় যে তাঁহারা এক দিবস কোন স্বতন্ত্র স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক অনুষ্ঠান পত্রও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন।"[৪]

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার এই অধিবেশনে কর সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় মতবিরোধের সূত্রে স্বতন্ত্র স্থানে সভা করার সিদ্ধান্তের ভিতরেই এই সভার আয়ুষ্কালের সমাপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়াও সদস্যদের দলাদলি এই সভার চূড়ান্তভাবে সমাপ্তি ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ২ মার্চ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে এই তথ্য জানা যায়:

"...জিলা নদীয়ার বর্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সম্যক বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্ম সভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমাদিগের অন্তরে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়,.... ।"

ইংরেজ সরকারের নতুন কর সংক্রান্ত বিধি বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার সদস্যদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করায় সরকারী আইন-কানুনের ভালো-মন্দ সামগ্রিক ভাবে বিচারের প্রসঙ্গও এই সভায় আলোচিত হয়। এই সময় বাংলা দেশের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সরকারের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ নীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে

থাকলে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগঠিত করতে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর তাঁরা হিন্দু কলেজে সমবেত হয়ে 'জমিদার সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। সভার নীতি-নিয়ম-নির্ধারণের জন্য রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন ও ভবানীচরণ মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এই সভা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবক্রমে 'ভূম্যধিকারী সভা' নামে অভিহিত হয়। এই সভায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান সহ কতিপয় ইংরেজও যোগদান করেন। থিয়োডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুন্‌শী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সভ্য নিয়ে সভার কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য এই সভা গঠিত হলেও এই সভায় সাধারণ মানুষের প্রতি ইংরেজ সরকারের অবহেলার বিষয়ও আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত অধিবেশনে সভাপতি রাধাকান্ত দেব প্রদত্ত ভাষণে বৃহত্তর জনসাধারণের প্রতি সরকারী অবহেলার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে :

> "পরে রাজা কহিলেন যে ইংলণ্ডীয়েরদের রাজশাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট প্রজারদের হিতার্থে কি কার্য্য করিয়াছেন ক'এক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্যাপ্রযুক্ত উপদ্রুত হইল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উসুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী ভ্রষ্ট হইল ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল।"[৫]

দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ায় এই সভা স্থাপন করে যে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিলেন তা' প্রকৃতবাস্তবে বাংলার মাটিতে স্বদেশচেতনার বীজ রোপণ করল :

> "It gave to the people the first lesson in the art of fighting constitutionally for their rights, and taught them manfully to assert their claims and give expression to their openions. Ostensibly it advocated the rights of the Zamindars, but as their rights are intimately bound up with those of the Ryots, the one can not be separated

from the other. what is truly good for the one, is equally so for the other and what is bad for the Zamindar is also bad for the Ryot."[৬]

ভূম্যধিকারী সভার এই আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সুদূর ইংলণ্ডে ভারতহিতৈষী রামমোহন-সুহৃদ্ উইলিয়ম অ্যাডাম সাহেব ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখ ইংলণ্ডবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর ভূম্যধিকারী সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবক্রমে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ভূম্যধিকারী সভার আন্দোলনকে সুদূর ইংলণ্ডে সম্প্রসারিত করেন। ক্রীতদাস প্রথা-বিরোধী মানবহিতৈষী জর্জ টম্‌সন ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ঐ সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। ভূম্যধিকারী সভার অন্যতম নেতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসেন এবং নব্যবঙ্গের সংগঠন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের স্বদেশ-ভাবনাকে আরও তীব্রতা দান করতেন।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ নব্যবঙ্গের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ইংরেজ-শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এবং প্রতিকারের উপায় অন্বেষণের গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সভায় রাজনৈতিক বিষয়ের পর্যালোচনায় ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে। এই বৎসর এপ্রিল মাস থেকে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ মিলিত ভাবে সভার দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) মাসিক মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে প্রকাশ শুরু করেন। অনতিকালের মধ্যেই এই পত্রিকা পাক্ষিকে পরিণত হয়। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দেই জর্জ টম্‌সন কলকাতায় আসেন এবং দ্বারকানাথের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে নব্যবঙ্গদলের পরিচয় ঘটে। এই বৎসর ১১ই জানুয়ারি জ্ঞানোপার্জিকা সভা এক প্রকাশ্য অধিবেশন করে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সহানুভূতি সম্পন্ন জর্জ টম্‌সনের সঙ্গে নব্যবঙ্গের সম্পর্ক অচিরেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগান-বাড়িতে জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং স্থান সংকুলানের অভাব হওয়ায় ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় সভার অধিবেশন স্থানান্তরিত করা হল। ইতিমধ্যে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজ ভবনে সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায় 'On the Present State of the East India Company's Criminal Judicature, and Police, under the Bengal Presidency' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় উপস্থিত দেশীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধে সরকারী কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনায় বিচলিত রিচার্ডসন তীব্র বিতর্কের অবতারণা করে বলেন যে, তিনি কলেজকে রাজদ্রোহীদের আস্তানায় পরিণত হতে দেবেন না। রিচার্ডসনের এই বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করায় তিনি বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। তবে এই ঘটনার পর থেকে সংস্কৃত কলেজ ভবনে সভার আর কোন অনুষ্ঠান হয় নি।

নব্যবঙ্গের রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং জর্জ টম্‌সনের অনুপ্রেরণা তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সভা স্থাপনে আগ্রহী করে তুলল। জ্ঞানোপার্জিকা সভার সুমহান্ ঐতিহ্যের উপর ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ এপ্রিল এই উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হল। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার ২৫ এপ্রিল ১৮৪৩, ২ খণ্ড, ১২ সংখ্যায় এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ও সভার নিয়মাবলী বিবৃত হয়েছে :

> "২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ফৌজদারী বালাখানার ৩১ নং ভবনে সাধারণ সভা হইয়াছিল, মেষ্টর জর্জ টম্‌সন সভাপতি। সভাপতির কিঞ্চিৎ বক্তৃতানন্তর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা সকল ধার্য হইল।
>
> মেষ্টর জি. টি এফ. স্পিড্ সাহেবের প্রস্তাবে বাবু রামচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় ধার্য হইল যে :
>
> ১। ভারতবর্ষের যদ্রূপ অবস্থা এবং এতদ্দেশের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এবং ইংলণ্ডীয় লোকদিগের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে এই সভার মতে অত্যত্র ব্যক্তিদিগের সাধ্যানুসারে স্বদেশের সদবস্থা ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।
>
> ক্রো সাহেবের প্রস্তাবে বাবু মধুসূদন সেনের পোষকতায় ধার্য হইল যে :
>
> ২। এতৎ সভার মত এই যে পৃথক২ ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্ম্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিস

গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ি রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল, ইহাতে জাতি ধর্ম্ম জন্মভূমি এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবেক না, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবে চন্দ্রশেখর দেবের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে:

৩। এই সভার নাম বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী রহিল ভারতবর্ষের লোকদিগের অবস্থা, ব্যবস্থা এবং দেশের উপায় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সকলের অনুসন্ধান করিয়া তাবৎ ব্যক্তিকে অবগত করান যাইবেক এবং সভ্যেরা আইনানুসারে লোকের মঙ্গল, অবস্থার উৎকৃষ্টতা এবং ভিন্ন শ্রেণিস্থ মনুষ্যের কুশল চেষ্টা করিবেন।

বাবু রামগোপাল ঘোষের প্রস্তাবে শ্যামাচরণ সেনের পোষকতায় ধার্য হইল যে:

৪। এই সভাব সভ্যেরা রাজদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে বাবু রামগোপাল ঘোষেব পোষকতায় স্থির হইল যে:

৫। যে সকল ব্যক্তিরা বয়ঃপ্রাপ্ত অথচ কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা যদি সভার নির্ব্বাহার্থ সাহায্য করেন এবং উপরিলিখিত প্রস্তাব সকল অন্তঃকরণ সহিত গ্রাহ্য করেন তবে এতৎসভার সভ্য হইতে পারিবেন।

মেষ্টর স্পিড্ সাহেবের প্রস্তাবে বাবু প্রাণকৃষ্ণ বাগজীর পোষকতায় ধার্য হইল যে:

৬। নিম্নলিখিত কমিটী উপরিউক্ত প্রস্তাবের মর্ম্মানুসারে সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ এক পত্র, এবং সভার কর্ম্মকারির তালিকা, ও কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া ৪মে বৃহস্পতিবার রাত্রির সাধারণ সভাতে করিবেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র।

অনন্তর সভাপতিকে সভার ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। সভাপতিও সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার জানাইয়া কহিলেন আমার প্রার্থনা এই যে সভার অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, আর আমি এদেশেই থাকি অথবা দেশান্তরেই অবস্থান করি সর্ব্বদা এতদ্দেশের মঙ্গল চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকিব।

যে ২ মহাশয়েরা এই সভার সভ্য হইতে বাসনা করেন আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা কমিটীর নিকট স্ব ২ নাম প্রেরণ করুন, আমরা অনুমান করি যদবধি সভার কর্ম্মকারক নিযুক্ত না হয় তদবধি কমিটী সভা সম্বন্ধীয় পত্রাদি গ্রহণ করিবেন।"[৭]

সভার সভাপতি জর্জ টম্‌সন, সহকারী সভাপতি জি. এফ. র‍্যামফ্রি ও রামগোপাল ঘোষ এবং সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র সর্বসম্মতভাবে নিযুক্ত হন। কর্মসমিতির সদস্য মনোনীত হন জি. এফ. র‍্যামফ্রি, জি. টি. এফ. স্পীড্, এম. ক্রো, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর দেব, ব্রজনাথ ধর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সেন, এবং সাতকড়ি দত্ত। উইলিয়ম থিওবোল্ড ও রামগোপাল ঘোষ যথাক্রমে ১৮৪৪ ও '৪৫ খ্রীস্টাব্দে সভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

এই সভা কোন প্রকার শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের ভূমিকা না নিয়ে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজত্বে দেশবাসীকে আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা ও সরকারের শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী ও কিছু কিছু সংবাদপত্র এই সভা ও তার সদস্যদের সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ শুরু করে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"ইংলিসম্যান, ষ্টার প্রভৃতি সংবাদপত্রে চক্রবর্তী দলের প্রতি গদ্য পদ্যময় অনেক ব্যঙ্গোক্তি প্রচারিত হয়। সাধুশীল তেজস্বীস্বভাব তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নামানুসারেইঐ দলের নামকরণ হয়।"[৮]

সভার সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র সরকারী নীতি-নিয়মের পরিবর্তনের জন্য ইংলণ্ডস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে একদিকে যেমন অবগত করতে লাগলেন অপরদিকে তেমনি সরকারের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রথা ও

অন্য কয়েকটি শাসন-সংস্কার বিষয়ে সফলতা অর্জন সভার এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টার বিশেষ দিক্।

সরকারী কাজে অধিক সংখ্যক দেশীয় ব্যক্তির নিয়োগ ও আদালতে দেশীয় ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে এই সভা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এই ভাবে বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তা ও স্বদেশচেতনার সূচনা করল বটে কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি। সোসাইটির অবসানের কারণগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুরের অসহযোগিতা অন্যতম। সোসাইটির সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্রের জমিদারী প্রথার তীব্র বিরোধিতা ও রায়তগণের পক্ষাবলম্বন ঐ সব সমাজপতিদের বিরাগভাজনের কারণ হয়েছিল। এর ফলে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও ভূম্যধিকারী সমাজ পরস্পর-বিরোধী দুটি সংগঠনে পরিণত হয়। কিন্তু উভয়ের সংযোগ-সেতুর ভূমিকা পালন করেছিলেন জর্জ টম্‌সন। একদিকে তিনি ছিলেন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি অপরদিকে তিনি ছিলেন ভূম্যধিকারী সমাজের ইংলণ্ডস্থ প্রতিনিধি। তথাপি দুটি সংগঠনই এই পর্যায়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

ইতিমধ্যে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের মেয়াদ বিশ বৎসর অন্তর নবীকরণের সময় উপস্থিত হল। এই সময়ে বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ উত্থাপন করা ও সেই মতো শাসন সংস্কারের সুযোগ গ্রহণের জন্য দেশীয় ব্যক্তিগণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সংগঠন গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে দেশবাসীর মনোভাব প্রতিফলিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ১১ সেপ্টেম্বর) 'ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। সভার সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সভা স্থাপনের কিছু দিন পরে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' আরও ব্যাপক উদ্দেশ্যে একটি গণসংগঠন গড়ে তুলল এবং স্বভাবতই ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হল। নবগঠিত সভায় পূর্বের জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ভূম্যধিকারী সভা ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সকল সদস্যকেই দেখা গেল; তবে কোন ইউরোপীয় বর্তমান সভায় অন্তর্ভুক্ত হননি। সভার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব, সহকারী সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্র এবং কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শম্ভুনাথ

পণ্ডিত। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই সভায় দায়িত্বশীল পদে প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যুক্ত ছিলেন।[৯] ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে অ্যাসোসিয়েশনের দুটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একযোগে পদক্ষেপের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন।

এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম কাজ হল ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্য একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করা। এই আবেদনে ভারতে উন্নততর শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন ও ভারতীয়দের রাষ্ট্র-পরিচালন-ব্যবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। অ্যাসোসিয়েশন-প্রদত্ত আবেদনপত্রে দাবীগুলি মীমাংসাসূত্র সহ ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

> "The Memorial consisted of 36 paragraphs covered as many as twenty-one topics. These were : (1) The Home Government (2) The Government of India (3) Relations of Governor-General with his Council (4) The Legislative Council (5) Laws made by the authority of the Executive (6) Plan of the legislative council (7) Powers of the Legislative council and the Supreme Council (8) Control Exercised by Parliament (9) Declaration of non-interference (10) Local Governors (11) Appeals from Governors (12) Economy in the Public Service (13) Civil Service (14) Judicial System (15) Union of the Supreme and Sudder Courts. (16) Courts in the interior (17) The Police Magistracy (18) Monopolies (19) Revenue Officers (20) Education (21) Ecclesiastic Establishment."[১০]

সুদীর্ঘ আবেদনপত্রে বিন্যস্ত বিষয়গুলির মধ্যে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী সংস্কারের দাবীই ছিল স্বাধিকার অর্জনের স্পষ্টোচ্চারিত প্রথম প্রকাশ। প্রস্তাবিত রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদকে আলাদা ভাবে গঠন করার আবেদন জানানো হয়।

এই ব্যবস্থায় বড়লাটের শাসন-পরিষদের দ্বারা ব্যবস্থা-পরিষদ পরিচালনা ও আইন-কানুন তৈরী করার ব্যাপক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ছিল। প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা-পরিষদ্ গঠনে সতেরজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন সরকারী সদস্য ও বারজন ভারতীয় সদস্য বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যায় গ্রহণ করা এবং এই ব্যবস্থা-পরিষদের মাধ্যমে আইন-কানুন প্রণয়ন করার দাবী জানানো হয়। দাবী সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি বটে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব নীতির কিছু পরিবর্তন ঘটে। শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদ পৃথক করা হয় এবং নূতন ব্যবস্থা-পরিষদে চারটি প্রদেশের চারজন সরকার মনোনীত প্রতিনিধি গ্রহণের কথা উল্লেখিত হয়, কিন্তু তাতে ভারতীয় প্রতিনিধি বলে উল্লেখিত হয় নি। তাছাড়া ঐ আবেদনে সনন্দের মেয়াদ কমানোর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে সরকার দশ বছরে পরিণত করে। আবেদনের সাফল্যের মধ্যে বড়লাট-শাসিত বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশের মতো লেফ্‌টেনান্ট গবর্নরের শাসন প্রবর্তন, সিবিলিয়ানের চাকরিতে ইংরেজের একাধিপত্যের পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার লাভের সুযোগ, বিচার-ব্যবস্থায় সমতাবিধানের জন্য সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালতের একীকরণের প্রস্তাব বহুলাংশে মেনে নেওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৬-'৫৭ খ্রীস্টাব্দে সরকার বিচার-বৈষম্য দূরীকরণে উদ্যোগী হলে দেশীয় ইংরেজরা বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করে বাধা দানের চেষ্টা করতে থাকলে অ্যাসোসিয়েশন ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সরকারী উদ্যোগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটায় সরকারের এই উদ্যোগ স্থগিত হলেও ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর ইউরোপীয়দের বিশেষ অধিকার আইনের দ্বারা রহিত করা হয়। এছাড়াও অ্যাসোসিয়েশন ভারতীয়দের স্বার্থের অনুকূলে শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, লবণ-আইন, নীলচাষ, পুলিশী-ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি-নির্ধারণে দীর্ঘকাল যাবৎ প্ররোচনা সৃষ্টি করেছে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এই ব্যাপক উদ্যোগ দেশবাসীকে আপন অধিকার সম্বন্ধে যেমন সচেতন করেছে তেমনি দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়-চেতনা সঞ্চারিত করে দিয়েছে। এই জাতীয়-চেতনারই সম্প্রসারিত রূপ স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধ। সর্বোপরি এই স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধ থেকেই জাতির পরাধীনতা-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে।

এই আকাঙ্ক্ষার প্রথম সোচ্চার প্রকাশ ঘটে 'বেথুন সোসাইটি'র (১৮৫২) এক সভায়। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশনে এইচ. এল. পোয়ার ওয়াইন নামে এক সিবিলিয়ান কর্মচারী 'Bodily Training as an Agent in National

Regeneration'—শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধে শারীর-চর্চাকে জাতীর পুনরুজ্জীবনের উপায় বলে নির্দেশ করেন। প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তৃতায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ-শাসন থেকে ভারতবাসীর মুক্তিকেই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে নির্দেশ করেন :

> "Education, in the highest sense of the term, must be one of natural development to be one of any use to a country. That result, however he thought, was not to be expected in India, so long as the vast superiority of the English race caused itself to be felt by the natives and produced in their minds an overwhelming sense of their own inferiority. The two nations, he thought, must be amicably parted, before anything good or great could be achieved by the people of this Country.',[১১]

সোসাইটির অধিবেশনে প্রদত্ত তারাপ্রসাদের এই দেশাত্মবোধক বক্তৃতাটি জাতীয়-মুক্তির প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এযুগে যেসব পথ সভাসমিতির মাধ্যমে গৃহীত হয় তার মধ্যে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি জাতিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করা ছিল অন্যতম। এই উদ্দেশ্যে সভা স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা করেন রাজনারায়ণ বসু। সমগ্র জাতিকে আচার-আচরণে, কথার-বার্তায় স্বাদেশিকতাবোধে দীক্ষিত করার জন্য তিনি ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে তিনি 'Prospectus of a society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal' নামে একটি অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন। ইংরেজি আদব-কায়দার ব্যাপক প্রসারে উদ্বিগ্ন রাজনারায়ণ এই সভার মাধ্যমে সর্ব বিষয়ে জাতিকে দেশীয় রীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বাধ্যতামূলক এক আচরণবিধি প্রণয়ন করেন। এই সভায় 'গুডমর্নিং' ও 'গুড ইভনিং' শব্দের পরিবর্তে বাংলা 'সুপ্রভাত' ও 'সুরজনী' শব্দ ব্যবহার ও ১ জানুয়ারির পরিবর্তে ১ বৈশাখ উদ্‌যাপন করার বিধান প্রবর্তিত হয়। সভ্যদের এই নিয়ম-নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে বাধ্যতামূলক করার জন্য আর্থিক জরিমানা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী বাংলা ভাষায় কথা বলার সময় কোন

সদস্য অসতর্কতাবশতঃ ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করলে প্রতি শব্দ ব্যবহারের জন্য এক পয়সা হিসাবে অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকতেন। বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলা অভ্যাস করার জন্যই এইরূপ অর্থদণ্ডের প্রচলন করা হয়। রাজনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত এই সভার নীতি-নিয়ম থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেশবাসীর জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে স্বাদেশিকভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়াই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই জাতীয়-ভাবের বীজ দেশবাসীর অন্তরে প্রোথিত হলেই একদিন তা' জাতীয়-মুক্তির মহীরুহে পরিণত হবে—এমন পরিকল্পনার ইঙ্গিত এই সভা বহন করেছে।

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র আদর্শ ও লক্ষ্যের আরও সম্প্রসারিত রূপায়ণ ঘটে ১২৭৩ সনের চৈত্র সংক্রান্তিতে (১৮৬৭) 'চৈত্র মেলা' বা 'হিন্দু মেলা' (চতুর্থ বৎসর থেকে নামান্তরিত) স্থাপনের মধ্য দিয়ে:

> "আমরা যখন সঙ্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্তিকার আলোকে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভার কার্য্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে।"[১২]

ব্যাপক কর্মসূচী ভিত্তিক সাম্বৎসরিক মেলা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য। মেলায় স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধের আদর্শকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার জন্য প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠানসূচীর প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত। হিন্দু মেলার সঙ্গে সভা বা সমিতির আদর্শগত কোন বিরোধ নেই, কারণ এই মেলারও অভিপ্রায় ছিল জনমত গঠন করা। চৈত্র মেলার দ্বিতীয় বর্ষে মনোমোহন বসু প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধের অনুকূলে জনমত গঠনের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

> "কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়-দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই, এবং যেসকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত-সম্ভূত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের এক মাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"[১৩]

মেলার এই উদ্দেশ্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জাতীয় জীবনকে সকল দিক্ থেকে স্বদেশমুখী করে তোলাই ছিল কর্মকর্তাদের লক্ষ্য। হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ ছিলেন নবগোপাল মিত্র এবং বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেলার লক্ষ্য ও আদর্শের অনুকূলে বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে গৃহীত অনুষ্ঠানসূচীতে বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ; কুস্তি, অশ্বচালনা, পাইক খেলা, বাঁশবাজি প্রভৃতি প্রদর্শন; দেশের নানা স্থানের কামার, কুমোর, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, মৃৎশিল্পী, চর্মশিল্পী ও চিত্রশিল্পী-নির্মিত শিল্প-সামগ্রী সহ মহিলাদের চারু ও কারুশিল্প প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য। মেলায় পুষ্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী বৈচিত্র্য সম্পাদন করত। তাছাড়া মেলা-কর্তৃপক্ষের দ্বারা কুশলী শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্মানিত হতেন। মেলার অধিবেশনে পরিবেশিত সংগীত ও পঠিত কবিতা ছিল দেশাত্মবোধে দীপ্ত। দ্বিতীয় বৎসরের মেলায় (১৭৮৯ শকাব্দ ৩০ চৈত্র) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সব ভারত সন্তান, 'একতান মন প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' ইত্যাদি উদ্বোধন সংগীতটিতে ভারত-মহিমার দৃপ্ত প্রকাশ ঘটেছে। এই অধিবেশনে আমেদাবাদ থেকে সদ্য আগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগোপাল মিত্রের অনুরোধে জীবনের প্রথম কবিতা 'জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়সী। / জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান' ইত্যাদি পাঠ করে পরাধীনতা-ক্লিষ্ট জাতির অন্তরে মুক্তির আকুল আহ্বান জানালেন। এই অধিবেশনে অনুরূপ ভাবোদ্দীপক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অক্ষয় চৌধুরী ও শিবনাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী)। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি পার্শী বাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে চতুর্দশবর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে বিখ্যাত দেশাত্মবোধক কবিতা 'হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি, / গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি' ইত্যাদি পাঠ করেন। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এই মেলার একাদশ অনুষ্ঠানে তিনি 'দিল্লীর দরবারে' নামে স্বরচিত দেশাত্মবোধক দ্বিতীয় কবিতা 'দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে, / প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে'—ইত্যাদি আবৃত্তি করেন।

মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন বসু তাঁর বক্তৃতায় স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্ম-বোধের স্তর-পরম্পরা অতিক্রম করে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যেই জাতির সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার যে চরম পরিতৃপ্তি, সেই সত্য পরিস্ফুট করেছেন। এতদিন ধরে বিভিন্ন সভাসমিতি জাতির অন্তরে স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধের স্ফুরণ ঘটিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যে উদ্দেশ্য লালিত করে এসেছে মনোমোহন বসু তাঁর বক্তৃতায় সেই উদ্দেশ্যকেই প্রায় অনাবৃত ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধার্য:

> "স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই

বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটী মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভ ভারত ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলেব নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা যে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহাব অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"[১৪]

একটি জাতিকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি অর্জন করতে গেলে যে সব গুণাবলীব অধিকারী হতে হয় হিন্দুমেলা দেশবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে তার ক্ষুদ্র সংস্করণগুলি উপস্থাপিত করেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁব 'হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র' প্রবন্ধেব একাংশে হিন্দুমেলার কর্মকর্তাদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার কথা বর্ণনা করে অনুরূপ দৃষ্টান্তেব আর একটি নির্দেশ দিয়েছেন:

"তখনও অস্ত্র আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতবাং বন্দুক ছোঁড়া বা তরোয়াল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু মেলাব বিশিষ্ট কর্মকর্তারা পাখী শিকারের ভান কবিয়া বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন।"[১৫]

বাঙালীব চিত্তে স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে হিন্দু মেলা জাতীয় জাগরণের এক নব দিগন্তের উন্মোচন করল।

* হিন্দুমেলার অধিবেশন হত বাৎসরিক। সারা বৎসর ধরে হিন্দু মেলার আদর্শ জনচিত্তে জাগরূক রাখার জন্য হিন্দু মেলার চতুর্থ অধিবেশনের (১৮৭০) পর নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশানাল সোসাইটি' বা 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনগুলিতে দেশবাসীর হিতসাধনমূলক শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা হয়। মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১৬ পৌষ সভার অধিবেশনে মনোমোহন বসুর প্রস্তাবক্রমে গঠিত

সভা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও তার দায়িত্বের কথা বিবৃত হয়েছে।[১৬] সভার যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্বভার প্রথম বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়, দ্বিতীয় বিভাগ শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে মেলায় প্রদর্শনযোগ্য স্বদেশীয় বস্তুর আয়োজনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তৃতীয় বিভাগ ব্যায়াম শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি বিধানে যত্নবান হয়, চতুর্থ বিভাগ কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব চর্চা এবং পঞ্চম বিভাগ সঙ্গীত চর্চা বিষয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সভার চতুর্থ অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা দেশে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই বক্তৃতার সমালোচনা করে লেখেন:

> "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"[১৭]

হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা দেশে স্বদেশচেতনা ও দেশাত্মবোধের যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল তাতে সমকালীন ছাত্র সমাজের মানসভূমিটি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময়ে আনন্দমোহন বসু ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ছাত্রদের নিয়ে 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ছাত্র সভা' স্থাপন করেন। সভার সভাপতি হন আনন্দমোহন নিজে এবং সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র নন্দকিশোর বসু। সামাজিক বিষয়ের আলোচনার জন্যই এই সভা প্রথম স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে সিভিল সার্ভিস থেকে কর্মচ্যুত ও ব্যারিস্টারী পরীক্ষা-দানে বঞ্চিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় উপস্থিত হয়ে বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে মেট্রোপলিটান কলেজে যোগদান করার পর ছাত্র সভার প্রতি আকৃষ্ট হন। ছাত্রসমাজও তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বক্তৃতায় দেশ ও জাতির ইতিহাসের নবমূল্যায়ন করে ছাত্রদের অন্তরে দেশপ্রীতিবোধ সঞ্চারে উদ্যোগী হলেন। হিন্দু কলেজ-হলে আয়োজিত ছাত্র সভার এক অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত 'শিখজাতির অভ্যুদয়' শীর্ষক প্রথম বক্তৃতায় শিখ জাতির উদ্দীপনাময় জীবন, নানক ও গুরু গোবিন্দের বিভেদ-বৈষম্য মুক্ত দৃষ্টি, শিবাজীর মহা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত নূতন তাৎপর্যে ছাত্র সমাজের কাছে উপস্থাপিত হল। সুরেন্দ্রনাথের ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ভবনে প্রদত্ত চৈতন্যদেব সম্পর্কে বক্তৃতা ছাত্রসমাজের কাছে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায়

আদর্শ বহন করে আনল। ছাত্র সমাজের সামনে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরার জন্য ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী ও আয়ার্লণ্ডবাসীর স্বাধীনতা উদ্ধার প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন :

> "...তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্তের ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুগত হইয়া উঠিল।"[১৮]

এই সময় শিশিরকুমার ঘোষ অভিজাত শ্রেণীর একাধিপত্য থেকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রবেশাধিকারযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অগ্রজ হেমন্তকুমার ও অনুজ মতিলাল ঘোষের সহযোগে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে সর্বসাধারণের রাজনৈতিক সভা গঠন করেন এবং এই সভা স্থাপনে বিশিষ্ট সহযোগীদের মধ্যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দুর্গামোহন দাশ প্রমুখ সভার কর্মসমিতিতে যোগদান করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন লীগের সভাপতিত্ব করেন। ইণ্ডিয়ান লীগ রাজনৈতিক সভা হলেও হিন্দু মেলার ভাবাদর্শের অনুসরণে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনও সভার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে বিবেচিত হয়। ইণ্ডিয়ান লীগ স্বল্প স্থায়ী হয়েও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে গেছে। বাংলাদেশের তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের কলকাতা পৌরসভায় জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিরোধিতা করায় ইণ্ডিয়ান লীগ ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে আন্দোলন করে এবং আন্দোলনে সফল হয়ে পরাধীন ভারতে জাতির রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাকেই পরোক্ষ-ভাবে বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপনের দশ মাস পরে আরও ব্যাপক কর্মসূচী ও সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুলাই অ্যালবার্ট হলে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন 'হিন্দু ব্যবস্থাদর্পণ'-প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্মা সরকার। এই সভায় ইণ্ডিয়ান লীগের বিরোধী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর দুই নেতা মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও কৃষ্ণদাস পাল যোগদান করেন। পক্ষান্তরে ইণ্ডিয়ান লীগের রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন সভা

স্থাপনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় কালীচরণের বিরোধিতা নস্যাৎ হয়ে যায়। সভার সম্পাদক হন আনন্দমোহন বসু এবং সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এই সভা রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য শ্রেণী-সম্প্রদায় ও ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। সমগ্র ভারতবাসীকে এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সভা গঠনের মূলে ম্যাৎসিনির ঐক্যবদ্ধ ইতালি গঠনের আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল বলে সুরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন।[১৯]

ভারত সভার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিভিন্ন পথে পরিচালিত হতে লাগল। দেশবাসীর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে একদিকে পার্লামেন্টে আবেদন-নিবেদন চলতে লাগল, অপর দিকে ঐসব বিষয়ের বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে জনমত গঠনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য নেতারা ব্যাপক তৎপরতা শুরু করলেন। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রচারকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে বাংলার বাইরে পর্যন্ত এই প্রচারকার্য সম্প্রসারিত হল। জুরি-ব্যবস্থার প্রবর্তন, মুদ্রণকার্যে স্বাধীনতা, আইনের চক্ষে দেশী-বিদেশীর সমতাবিধান, সরকারী কার্যে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণ প্রভৃতি সর্বভারতীয়-সমস্যার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, অস্ত্র আইন সম্পর্কে সরকারের দেশী ও বিদেশী সম্পর্কে দ্বিবিধ নীতি অনুসরণ প্রভৃতি বিষয়ে এই সভা জনমত গঠনের জন্য প্রচার অভিযান চালাতে লাগল। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪ মার্চ অ্যালবার্ট হলে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারত সভা আয়োজিত সভায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স ২১ বৎসর থেকে ১৯ বৎসর করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এই নতুন আইনে সর্বভারতীয় স্বার্থ জড়িত বলে সুরেন্দ্রনাথ জনমত গঠনের জন্য সমগ্র ভারতে প্রচারকার্যে বেরিয়ে পড়লেন। সমগ্র ভারতবাসীকে একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সুরেন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক পর্যটনের পূর্বদৃষ্টান্ত নেই। ভারত সভার আর একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হল ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মার্চ দেশীয় সংবাদপত্র আইন সংক্রান্ত। এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতসভা ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল ও ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত টাউন হলে দুটি বিশাল জনসভায় তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করে। এই সভা সংবাদপত্র-আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদপত্র পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য গ্লাডস্টোনের কাছে পাঠায়। গ্লাডস্টোন-উত্থাপিত প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলেও বিলাতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌দের অনেকে এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করায় পরবর্তীকালে সরকার দেশীয় সংবাদপত্র-আইনের কিছু পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে গ্লাডস্টোন মন্ত্রীসভা গঠন

করায় সংবাদপত্র-আইন প্রত্যাহৃত হয়। তাছাড়া ভারতসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্দোলনগুলির মধ্যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ভূমিসংক্রান্ত আইনের সংস্কার, প্রতিনিধিমূলক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, সুরাপান নিরোধ, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জাতীয় সভার সর্বোত্তম কীর্তি হল প্রাদেশিক সংগঠনের চিন্তা থেকে সর্বভারতীয় সংগঠন সৃষ্টির প্রয়াস। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর থেকে অ্যালবার্ট হলে তিন দিন ব্যাপী 'জাতীয় জনসভা' (National Conference) আহ্বান করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীকে কারিগরী শিক্ষা, সিভিল সার্ভিসে বেশি সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ, বিচার ও শাসন-ব্যবস্থা পৃথকীকরণ, জনপ্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য-শাসন-বিধি প্রবর্তন, অস্ত্র-আইন বাতিলকরণ বিষয়ে আন্দোলনে ডাক দেওয়া সভার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ভারতসভা এইভাবে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপনের আশু প্রয়োজনের গুরুত্ব পরোক্ষভাবে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিল।

ভারতসভা প্রতিষ্ঠার সময়কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ।[২০] সভার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই সভার সভ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে নবগোপাল মিত্র এই সভায় যোগদান করেন। ঠনঠনের একটি পোড়ো বাড়িতে সভার অধিবেশন হত।

ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডী-ক্যাভুরের নেতৃত্বে ইতালির স্বাধীনতা-আন্দোলন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের বক্তৃতায় প্রচারিত হয়ে যুবসমাজের মধ্যে তাঁদের সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ম্যাৎসিনি এক সময় ইতালির স্বাধীনতা অর্জনে লিপ্ত 'কর্বোনারি' নামে গুপ্ত সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় অনুরূপ আদর্শে বাংলাদেশে যুবকদের মধ্যে গুপ্ত সমিতি গঠনের উৎসাহ দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে স্থাপিত সঞ্জীবনীসভা দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন-কল্পনায় যত বিভোর ছিল কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে তার বিন্দুমাত্র প্রক্ষেপ ঘটাতে উৎসাহী ছিল না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বলেছেন :

> "সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহঃ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।........আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্নমেণ্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর

ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে—ফোর্ট উইলিয়ামের একটি ইস্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।''[২১]

সভার আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ও আচরণবিধির মধ্যে যথেষ্ট গাম্ভীর্য রক্ষা করা হত। মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করা ছিল সভ্যদের প্রধান আচরণবিধি। গুপ্ত ভাষায় সঞ্জীবনী সভার নামকরণ 'হাঞ্চু পামু হাফ্'। বেদমন্ত্রের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হত এবং মৃতপ্রায় ভারতকে জাগ্রত করার প্রতীক স্বরূপ সভায় একটি মড়ার মাথার চক্ষু-কোটরে বাতি জ্বালিয়ে অধিবেশন হত। ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তিক ঐক্য স্থাপনের নিদর্শন হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি পোশাক প্রচলনের চেষ্টা করেন, কিন্তু পোশাকের পরিকল্পনাটি নিতান্ত বিসদৃশ হওয়ায় তা আদৌ সমাদৃত হয় নি। স্বাদেশিকতার প্রাবল্যে এই সভা দিয়াশলাই ও কাপড় প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু উভয় পরিকল্পনাই প্রয়োজনাপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর ও ব্যয়বহুল হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়।

সঞ্জীবনী সভায় এই দেশীয়-ভাবের চর্চা দেশের পরাধীনতা-মুক্তিতে কিছুমাত্র রেখাপাত ঘটাতে সক্ষম না হলেও মুক্তি সন্ধানের আর একটি পথের নির্দেশ করেছে। পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের গুপ্ত সংগঠনগুলি এই আদর্শেরই কার্যকর অনুসরণের মাধ্যমে দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশে সভাসমিতির মাধ্যমে প্রধানতঃ দু'ভাবে জাতীয় জাগরণের চর্চা হয়েছে। এযুগে সভাসমিতিগুলির একশ্রেণী দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশচেতনা ও দেশাত্মবোধ সঞ্চার করে জাতির মানসিকতাকে বিদেশী শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার অনুকূলে রাজনীতি-সচেতন করে তুলেছিল। অপর শ্রেণীর সভা-সমিতি সর্বপ্রকার ছদ্মাবরণ পরিত্যাগ করে জাতিকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যই স্বদেশচেতনা ও দেশাত্মবোধের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে আপন অধিকার অর্জনে প্ররোচিত করেছিল।

উপচ্ছেদ : বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশ

এ যুগের সভাসমিতির অনলস প্রয়াসে নব-সৃষ্ট দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক আবহাওয়া দেশের সর্বস্তরের মানুষকে, বিশেষভাবে শিক্ষাসচেতন জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সেই আবহাওয়ায় লালিত এযুগের নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও কবি তাঁদের রচনায় এই নবলব্ধ চেতনার রূপায়ণে জাতির বিস্মৃত অতীত-ঐতিহ্য এবং ইতিহাস ও ক্ষেত্রবিশেষে কল্পনা-নির্ভর বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। দেশ ও জাতিকে মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য সাহিত্যে কোথাও কোথাও

তেজদৃপ্ত ভাবধর্মী হয়ে উঠেছে। একই উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যে কোথাও বিদেশী শাসকের প্রতি ঘৃণা উৎপাদনের জন্য যেমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তেমনি জাতিকে সর্ব প্রকার জড়তা থেকে মুক্ত করার জন্যও অনুরূপ পন্থা অনুসৃত হয়েছে। এই জাতীয় রচনা দেশবাসীর অন্তরে মুখ্যতঃ প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে রচিত বলে সেখানে যুক্তির চেয়ে হৃদয়াবেগই প্রধান হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি বলা যায় যে, এই চেতনা নতুন ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্যকে আরও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে এবং বাংলা সাহিত্যের পরিধিও তার ফলে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে।

নাটক ॥ বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় জাগরণের পরিণত পর্যায়ে। ইতিপূর্বে দেশে সভাসমিতিগুলির উদ্যোগে স্বদেশচেতনা ও দেশাত্মবোধের একটি বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। এযুগের এক শ্রেণীর নাটক দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের চেতনাকে জাগ্রত করে পরাধীনতা থেকে মুক্তির বাসনা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

এ প্রসঙ্গে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র রূপক নাট্য 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। হিন্দুমেলার জন্য রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গান দুটির মর্মসত্যই এই রূপক নাট্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। 'ভারত মাতার' একটি সংগীতে পরাধীন ভারত-বাসীর করুণচিত্র তুলে ধরা হয়েছে ;

দেখ গো ভারত-মাতা তোমারি সন্তান,
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হত-জ্ঞান।
সবে বল-বীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।
মরি এ দশা তোমার, সহিতে না পারি আর,
অপার জলধি-পার চলিলাম ছাড়ি স্থান।

সূত্রধরের বক্তব্যে এই নাট্যের উদ্দেশ্যবাদিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> "ভারতভূমির ও ভারত-সন্তানগণের বর্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই 'ভারত মাতার' উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত সুধীমণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারত মাতার দুঃখ দূর করতে একদিনও যত্ন পান, তাহা হলেই আমার ও গ্রন্থকর্তার শ্রম সফল।"

কিরণচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'ভারত যবন' (১৮৭৪) এর ভাববস্তুও পূর্ববর্তী রচনার অনুরূপ। মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র নাটক' (১৮৭৩)-এর কাহিনী পৌরাণিক হওয়া

সত্ত্বেও নাট্যকার স্বদেশচেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর হিন্দুমেলার জন্য রচিত গান 'দিনের দিন, সবে দীন হয়ে পরাধীন। /অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ'-নাটকটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের শোষণ ব্যবস্থার নিষ্করুণ রূপটি নাটকে সংযোজিত গানের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে :

> দে কর, দে কর, রব নিরন্তর ; করের দায়ে অঙ্গ জরজর।
> সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকর, শোণিত শোষণ করে শত কর,—ইত্যাদি।

হরলাল রায় তাঁর হেমলতা নাটকে' (১২৮১) পরাধীনতার গ্লানিকে গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলে পরোক্ষভাবে দেশবাসীকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমান আক্রমণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এযুগের কিছু নাটকে দেশাত্মবোধের স্ফুরণ ঘটেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুরূপভাবে ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত নাটকে উচ্চকণ্ঠ-স্বদেশ-প্রেমকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর 'পুরুবিক্রম নাটকে' (১৮৭৪) সেকেন্দার শাহের পাঞ্জাব আক্রমণের বিরুদ্ধে পুরু ও কুল্লপর্বতের স্বাধীন অবিবাহিতা রানী ঐলবিলার সংগ্রামের বর্ণনায় সংলাপ ও দৃশ্যবিন্যাসে সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটকে' (১৮৮৫) দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নাটকটিতে সংযোজিত 'স্বাধীনতা রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি!' ইত্যাদি কবিতাটিতে তিনি পরাধীন ভারতের করুণ বর্ণনা করে দেশবাসীকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর 'অশ্রুমতী নাটকে'র (১৮৭৯) বিষয়বস্তু প্রতাপ সিংহের কন্যা অশ্রুমতীর প্রতি যুবরাজ সেলিমের প্রণয় ও তার জন্য দ্বন্দ্ব। নাটকটিতে দেশপ্রেমের আভাস আছে কিন্তু তা তীব্রতা পায়নি। তাঁর 'স্বপ্নময়ী নাটকে' (১৮৮২), প্রণয়াবেগ দেশপ্রেমের সঙ্গে মিশে গেছে।

বিপিনবিহারী ঘোষালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' (১৮৭৪) নাটকের বিষয়বস্তু সুলতান গিয়াসুদ্দীন ও রাজা গণেশের সংঘর্ষের বৃত্তান্ত। হরিমোহন ভট্টাচার্যের 'সমরে কামিনী নাটকটি' (১৮৭৫) মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে রানী কমলাদেবীর শৌর্য প্রকাশের বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত। এই নাটকটি হিন্দুমেলায় অভিনীত হওয়ার জন্য রচিত হয় এবং কিরণচন্দ্রের 'ভারতমাতা' নাটকের অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রনাথের হিন্দুমেলার জন্য রচিত গান দুটি এই নাটকেও সংযুক্ত হয়েছে। মহেন্দ্রলাল বসুর 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী' (১৮৮৫) নাটকটিতে সত্যেন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গান দুটি ছাড়াও

রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' কবিতাটিও সংগীত হিসাবে স্থান পেয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' (১৮৮১) নাটকটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পূর্বেই নাটকটি অভিনীত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। এই নাটকে ভাটের মুখে সংযোজিত গানে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। ভাটের একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধার্য:

ভাঙ্গিল স্বপন, পরাধীন জন,
এবে অধীনতা-দুখরাশি।
দেশ-অনুরাগে, বীর ধীর জাগে
জাগে জন্মভূমি-সুখ-প্রয়াসী। —ইত্যাদি

উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭৪) নাটকে নায়ক শিক্ষিত শরৎকুমারের দেশোদ্ধার ব্রতের সঙ্গে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ ও প্রেম-পরিণয় যুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। নাটকের শেষে একটি সংগীতে দেশোদ্ধার-ব্রতে নর-নারীকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে:

নরনারী পরস্পরে, ভারত-উদ্ধার তরে
উদ্যোগী হও যত্নভরে, হও না তায় শিথিল। —ইত্যাদি

উপন্যাস ॥ সভাসমিতির লক্ষ্য ও আদর্শে পরিপুষ্ট একশ্রেণীর উপন্যাস দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশচেতনা ও স্বাধীনতার সত্যোপলব্ধি জাগ্রত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই জাতীয় উপন্যাসের সংখ্যাগত স্বল্পতা থাকলেও সেই স্বল্প সংখ্যক উপন্যাসই মুক্তিকামী দেশবাসীর অন্তরে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম জাতিকে স্বদেশব্রতের মহান্ দীক্ষা দেন। বঙ্কিম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বদেশের ঐশ্বর্যময়ী রূপদর্শন, জাতির অতীত গৌরবের স্মৃতিচারণ, হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ব্যাকুলতা এবং সর্বোপরি পরাধীনতা-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও তার জন্য সংগ্রামকে প্রতিফলিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য তাঁর 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) উপন্যাসটি। মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের পটভূমিতে কাহিনীটি রচিত হলেও বঙ্কিম প্রচ্ছন্নভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ সংগঠিত করতে প্ররোচনা সৃষ্টি করেছেন। আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুক্তিমন্ত্রের মর্যাদা পেয়েছিল। 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৮৪) উপন্যাসটি গার্হস্থ্য-কাহিনী হলেও বাঙালীর বীরত্ব প্রকাশের এক দুর্লভ মুহূর্ত বঙ্কিম এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন। ১৮৬৯

খ্রীস্টাব্দে রচিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিম পশুপতির উক্তির মধ্য দিয়ে স্বদেশ-প্রেমের একটি ক্ষীণ আভাস সৃষ্টি করেছেন :

> "আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা। আমার উদ্ধার করিও। আমি জীবনস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না।"

রমেশচন্দ্র দত্ত আওরংজেব ও শিবাজীর সংঘর্ষের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) উপন্যাসে স্বদেশ-প্রীতির সুরটি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রবন্ধ ॥ বাংলা প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেই প্রথম স্বদেশ-সাধনা, দেশপ্রেম ও পরাধীনতা-মুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) গ্রন্থে 'আমার দুর্গোৎসব' শীর্ষক একাদশ অধ্যায়ে কমলাকান্তের জবানীতে জন্মভূমিকে গভীর দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মাতৃত্বে বরণ করেছেন এবং পরাধীন মাতৃভূমির জন্য তাঁর শোকবিহ্বল চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে :

> " চিনিলাম, এই আমার জননী-জন্মভূমি-এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী-অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে-কালগর্ভে নিহীতা। রত্ন-মণ্ডিত দশ ভুজ-দশ দিক্-দশ দিকে প্রসারিত ; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে শক্তিশোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব "

বঙ্কিম 'বিবিধ প্রবন্ধের' (১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ ১৮৯২) ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধে বাঙালীর অন্তরে দেশপ্রীতি, স্বাদেশিকতা ও জাতীয় গৌরব এবং মর্যাদাবোধ সঞ্চারিত করার জন্য জাতির অতীত-ঐতিহ্য অনুসন্ধানের জন্য ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে তাঁর সেই ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে :

> "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নইলে, বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। ....যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল—অসার, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল আদর গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না। —চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

জাতীয় জাগরণের জীয়ন-কাঠি জাতির ইতিহাসের মধ্যেই রক্ষিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই কোথাও বাঙালী তথা ভারতবাসীর ইতিহাস সম্পর্কে বিদেশী ঐতিহাসিক-দের বিভ্রান্তিকর প্রচার সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন, কোথাও জাতির ইতিহাসের

নষ্টকোষ্ঠী থেকে দেশ ও দেশবাসীর অতীত অনুসন্ধানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর এ সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'ভারতকলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ (১২৮০), আশ্বিন সংখ্যায় 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধে দেশপ্রেমের দৃষ্টিতে মহাবিদ্যার রূপ বর্ণনার মধ্যে ইংরেজ-শাসনে হৃতশ্রী বঙ্গজননীর রূপ পরিস্ফুট করেছেন :

> "উদ্ধত ইংরাজ শাসনকর্তা। একবার স্থিরচিত্তে ধ্যান কর। একবার চারদিকে চাহিয়া দেখ। দেখ দেখি সোনার পুরী কি হইয়াছে। ভুবনেশ্বরী এখন পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন। কাঙ্গালিনীকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় না?... এখনও আমার জাগ্রত স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই, আমার এখনও আশা হইতেছে যে ভারতমাতা আবার বগলা মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন।"

অক্ষয়চন্দ্রের এই দেশমাতৃকা দর্শনের সঙ্গে কমলাকান্তের জন্মভূমির রূপ দর্শনের কোন পার্থক্য নেই। পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য অক্ষয়চন্দ্র এরূপ পরোক্ষ আবেদন জানিয়েছেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ভারতকাহিনী' (১৮৮৩) ও 'বীর মহিমা' (১৮৮৬) প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। জাতির অন্তরে দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য তিনি 'ভারত কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন' প্রবন্ধের একস্থানে ভারতের অতীত ও বর্তমানের যে তুলনামূলক বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেশবাসীর প্রতি প্রকৃত ইতিহাস রচনারও আবেদন জানানো হয়েছে :

> "যে ভারত এক সময়ে জগতের শিক্ষা-ভূমি ছিল, সেই ভারত এখন একটী সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যের দ্বারে লালায়িত। এইরূপ এক সময়ে ভিক্ষা-দান অন্য সময়ে ভিক্ষা-প্রার্থী, এক সময়ে লোকারণ্যের হৃদয়োদ্দীপক কোলাহলপূর্ণ, অন্য সময়ে বিকট শ্মশানের মূর্ত্তির প্রতিরূপ—ভারতের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিবার উপায় নাই। ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই।

'আর্যদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পাশ্চাত্য দেশপ্রেমিকদের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে তাঁদের আদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরোক্ষ আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত' (১২৮৬),

'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০), 'ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত' (১৮৮৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত বর্ণনার এক স্থানে তিনি দেশবাসীকে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জন্মভূমির মুক্তির জন্য বলি প্রদত্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন :

> "যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্মবলি-প্রদান সর্ব্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিবেন, তখন দেবী-প্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আপনিই মুক্ত হইবে।"

কাব্য-কবিতা ॥ এযুগের বাংলা কাব্য-কবিতা দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেম ও বিদেশী শাসনমুক্তির প্রেরণা-সঞ্চারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কবিতায় দেশপ্রেমের বাণী প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় দেশের পরাধীনতাজনিত দুরবস্থার চিত্র যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি দেশমাতৃকার দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বানও ধ্বনিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি দেশের সকল কিছুর প্রতি মমত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়ার জন্যও দেশবাসীর কাছে ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছেন। দেশবাসীর একাংশের পাশ্চাত্য-প্রীতির প্রাবল্যে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ায় তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে লিখেছেন :

> জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি,
> ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে ?
> তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত,
> মিছে কেন মর ভার বয়ে ?
> পূর্ব্বেকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
> অনাচারে অবিরত রত।

ঈশ্বর গুপ্ত দেশ ও জাতির সর্বপ্রকার মুক্তি ও উন্নতির জন্য দেশ-বাৎসল্য ও জাতি-বাৎসল্যে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন :

> ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে,
> প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
> কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
> বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

জন্মভূমিকে জননীর দৃষ্টিতে দেখবার এবং তার দুর্দশা মোচনের আবেদনও তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে :

জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?

আর তাঁর কবিতায় শৌর্য-বীর্যহীন বাঙালীর বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ-বাণ বাঙালীকে মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে :

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হবো
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যে ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাণা ভীমসিংহের রৌদ্ররসের চড়া সুরে বাঁধা উৎসাহবাণীর মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রথম পরাধীনতার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন :

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায় ॥

পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজশক্তি উত্থানের কাহিনীতে জাতির অন্তরে দেশপ্রেম সঞ্চারের প্রয়াস লক্ষণীয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১) দেশবৈরী রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাবণ-ইন্দ্রজিতের সংগ্রাম-বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর অন্তরে পরাধীনতা-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেই পরোক্ষভাবে জাগ্রত করেছেন। তিনি রাবণের উক্তির মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের চরমবাণী উচ্চারণ করেছেন :

জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বীরবাহু কাব্যে' (১৮৬৪) ভারতের অতীত-গৌরবের বর্ণনার ছলে পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানিময় চিত্রকে পৌরাণিক পটে স্থাপন করে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশ-প্রেম প্রজ্বলিত করতে চেয়েছেন :

আর কি সেদিন হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারবাসীর মন, নানা রসে তুষিত ॥
যবে দেব অবতংস, রঘু কুরু পাণ্ডু বংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস, ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর,
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত ॥ —(ভূমিকা)

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্যে'র (১ম খণ্ড ১৮৭৫, ২য় খণ্ড ১৮৭৭) প্রথম খণ্ডের প্রথম সর্গে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের প্রতি দেব-সেনাপতি স্কন্দের ধিক্কার-বর্ষণের মধ্য দিয়ে পরাধীন দেশবাসীকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যই যেন পরোক্ষভাবে উত্তেজিত করা হয়েছে :

ধিক্ দেব। ঘৃণা শূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য, সুধা স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।

দুর্গাচন্দ্র সন্যালের 'মহামোগল কাব্যে'র দ্বিতীয় খণ্ড 'শিবাজী পর্ব্ব' (১৮৭৬) ও তৃতীয় খণ্ড 'জয়সিংহ পর্ব্ব' (১৮৭৭)-এ শিবাজী ও জয়সিংহের বীরত্ব, নির্ভিকতা, স্বদেশবাৎসল্যের চিত্র অঙ্কন করে পরাধীন দেশবাসীর সামনে আদর্শ স্থাপিত হয়েছে।

বাঙালীর শৌর্য-বীর্য অবলম্বন করে নবীনচন্দ্র এই সময়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৭) রচনা করেন। শ্যামাচরণ শ্রীমানী তাঁর 'সিংহল বিজয়' (১৮৭৫) কাব্যে বঙ্গ রাজকুমারের লঙ্কাদ্বীপ অধিকারের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রীতি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

এছাড়া এযুগের বহু স্বল্পখ্যাত কবি ইতিহাস ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে দেশপ্রেম ও মুক্তি সংগ্রামের দৃষ্টান্তমূলক বহু কাব্য-কবিতা রচনা করেন। জাতির অন্তরে স্বদেশচেতনা, দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন সঞ্চারে এই সব গ্রন্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Thomas Edwards—Henry Derozio (1884) p. 32.

২. 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১ সেপ্টেম্বর ১৮৪৩—দ্রষ্টব্য : যোগেশচন্দ্র বাগল—'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' (১৯৫৮) পৃ. ১২

৩. 'সমাচার দর্পণ', ১৭ জুলাই ১৮৩০ (৩ শ্রাবণ ১২৩৭)—দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড (দ্বিতীয় সং ১৩৪৮) পৃ. ১২১

৪. তদেব, ৭ জানুয়ারি ১৮৩৭ - দ্রষ্টব্য : তদেব, পৃ. ৪০৪-৪০৫

৫. তদেব, ২৪ মার্চ ১৮৩৮—দ্রষ্টব্য : তদেব, পৃ. ৪০৭

৬. Raja Rajendralal Mitra's Speech, edited by Jogeshwar Mitter (1892). p. 25.

৭. বিনয় ঘোষ—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড

৮. ভূদেব মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস, ৩য় ভাগ (২য় সং ১৩৩৫) পৃ. ৪১ (পাদটীকা অংশ)

৯. মন্মথনাথ ঘোষ—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১১৮-১২১

১০. Bimanbehari Mazumder—Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917), First Edition, p. 40.

১১. The Proceedings and Transaction of the Bethun Society from Nov. 1859 to April 20th 1869, p. CXXii—দ্রষ্টব্য : যোগেশচন্দ্র বাগল—জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (১৩৫৩) পৃ. ১৪০-৪১।

১২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (৩য় সংস্করণ ১৩৫৯) পৃ. ১২২

১৩. যোগেশচন্দ্র বাগল—হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত

১৪. তদেব, পৃ. ১০-১১

১৫. 'বঙ্গবাণী', অগ্রহায়ণ ১৩২৯, দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি (১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ) পৃ. ২৭৪

১৬. যোগেশচন্দ্র বাগল—হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৬৫

১৭. বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী (পরিষৎ সংস্করণ, ২য় খণ্ড), 'বিবিধ', পৃ. ৩২৯-৩০

১৮. বিপিনচন্দ্র পাল—চরিত কথা (১৩৩৬), 'সুরেন্দ্রনাথ', পৃ. ৪৯

১৯. যোগেশচন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত (১৩৬৭) পৃ. ১১৫

২০. রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি (১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ,) পৃ. ৯৮

পরিশিষ্ট—ক

শ্রীশ্রী দুর্গা।

জয়তি।

মহমহিম শ্রীযুত লার্ড কেবিণ্ডিস বেন্টিঙ্ক গবরনর

জেনরল বাহাদুর সমীপেষু।

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা নিবাসি কএক জন লোক হিন্দুরদিগের ব্যবস্থা ও বোধ নিবেদন করিবার ভার লইয়া ঐ সকল ব্যবস্থা ও বোধের বিপরীত নিবেদন করিয়াছেন এবং আপনি কৌন্সলের বৈঠকে এমত মিথ্যা কথায় সতী হওনের ব্যবস্থা নিবারণ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে উদ্যত আছেন এ নিমিত্তে আমরা স্বাক্ষর করিয়া সম্ভ্রমপূর্ব্বক এই নিবেদন পত্র প্রদান করিতেছি হিন্দুধর্ম্ম কর্ম্মের উপর হস্ত-নিঃক্ষেপ করণে তন্নিবারণে ব্যগ্রতা করিতেছি এবং অতিশয় ভীত হইয়াছি।

কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে যে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুলোক শ্রদ্ধা ভক্তিতে শাস্ত্র ব্যবসায় করণে দৃঢ় আছেন তাঁহারদিগের মান্য যে সকল ধারা ও প্রকার হইবেক তাহাতে সরকারের বিশেষ মনোযোগের আবশ্যকতা নিমিত্ত এমত বিষয় প্রস্তাব করিবার কারণ আমরা স্বাক্ষরকরি বঙ্গদেশ নিবাসিরা অতি সম্ভ্রমপূর্ব্বক নিকটস্থ হইতে প্রার্থনা করি।

অনেক কালাবধি হিন্দুশাস্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং প্রাচীনতাপ্রযুক্ত তদ্ধর্ম্মিলোকের মনে তাহার প্রভাব দৃঢ় প্রবেশ করিয়াছে। কোন পক্ষে কেহ ক্বচিৎ স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রথমতঃ বিজয়ি যবনেরা ধর্ম্মচ্যুত করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু কাহারও চেষ্টা বৈধর্ম্মের প্রবল শক্তি রোধ করিতে অধিক সফল হয় নাহি।

হিন্দুধর্ম্ম অন্যসকল ব্যবহার্য্য ধর্ম্ম ও বিধি ন্যায় নির্দ্ধারিত আছে এবং অতি প্রাচীনতা প্রযুক্ত অন্য ধর্ম্মের সহিত সমান রূপে পবিত্র। প্রাচীন ব্যবহার ও বিধি প্রমাণে হিন্দুবিধবারা আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বামির ও আপনার উপকার নিমিত্ত আপনার শরীর দগ্ধ করে ইহাকেই সতী হওয়া কাহে ইহা কেবল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম নহে বরং সেই স্ত্রীর অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে এবং আমরাও নিবেদন করিতেছি যে এমত প্রবল আত্মনাশক ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক হওয়া কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যায় এবং অসহ্য নহে বরং ইহায় চেষ্টা নিষ্ফল হইবেক।

ভারতবর্ষে জয়ি যবনদিগের প্রথম অধিকারে এবং যে পর্য্যন্ত এদেশ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার হইয়াছে কেহ সতী হওনের ব্যবহার প্রতিরোধের চেষ্টা করেন নাই সেই কালাবধি প্রায় একশত বৎসর হইল বাঙ্গালা ও

বেহার ও উড়িষ্যাতে ইঙ্গরাজের অধিকার হইয়াছে কোন গবরনর জেনরল কিম্বা কৌন্‌সল এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম ও ব্যবহারে হাত দেন নাই এবং আমরা নিবেদন করিতেছি যে বিলাতের পারলিমেণ্টের নানা অজ্ঞানুসারে যাঁহার ক্ষমতা ক্রমে স্বয়ং কোম্পানি এদেশে স্থাপিত হইয়াছেন আমারদিগেরা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ও ব্যবহার ও ধারা যেমন অনেক কালাবধি প্রচলিত হইয়াছে দৃঢ়রূপে রক্ষা পাইয়াছে।

আমরা শুনিয়া চমৎকৃত এবং দুঃখিত হইলাম যেহেতু সতী হওনের ব্যবহার অশাস্ত্র কহিয়া তন্নিবারণের চেষ্টা হইতেছে এ বিষয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে। এ বিধি সেই সকল হিন্দুর দ্বারা প্রচার হইয়াছে যাহারা তাহারদিগের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া ইউরোপীয় লোকের সমতি ব্যাহারে নিষিদ্ধ আহার পান দ্বারা আপনারদিগকে নষ্ট করিয়াছে এবং সতী ব্যবহারের বিষয়ে কোন শাস্ত্র নাই ইহা কহিয়া তোমাকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এমত কহিয়াছে যে সকল জ্ঞানবান ও সুশিক্ষিত হিন্দুরা এই কথা কহিতে প্রস্তুত আছেন যে শাস্ত্র মূলরূপে নির্দ্ধারিত এবং সকল হিন্দুর যাহা মান্য সেই সকল শাস্ত্র দ্বারা সতী হওনের বিষয়ে বিধি না থাকাতে এ ব্যবহার উঠিয়া যাউক।

কিন্তু আমরা নিবেদন করিতেছি যে এমত সূক্ষ্ম প্রশ্নে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করা উচিত আর আমরা ভরসা করি যে আপনি কৌন্‌সলের বৈঠকে ঐ সকল লোকের কথা গ্রাহ্য করিবেন না যাহারা কোন ধর্ম্ম রাখে না এবং আপন পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম স্মরণে যত্ন করে না। আর যদি আপনি কৌন্‌সলের বৈঠকে সকল লোকের ধর্ম্ম সুধরায়িবার এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা কি নিষেধ কি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য এই সূক্ষ্ম ও কঠিন ভার আপনি লও তবে যথার্থ অনুসন্ধান ও হিন্দু ধর্ম্মপরায়ণ বিখ্যাত লোকেরদিগের সহিত গাঢ় বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদিগের যে শাস্ত্রে এমত বিধি আছে সেই সকল শাস্ত্রের ও বিদ্যার মত গ্রহণ করিয়া ভার লওয়া কর্ত্তব্য আর যদি এমন অনুসন্ধানে মত হয় তবে আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি কৌন্‌সলের বৈঠকে আমারদিগের বাক্য যথার্থ পাইবেন এবং জানিবেন যে বর্ত্তমান ধারা আমারদিগের মান্য শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ আক্রমণের চিহ্ন বোধে কোম্পানির অধিকার সময়ে ভয় ও ভীতি বোধ হইবেক।

আমরা আরো নিবেদন করি যে পূর্ব্বে ইহার অনুসন্ধান কোন২ অতি পণ্ডিত ও ধর্ম্মিষ্ঠ কোম্পানির কর্ম্মচারি সাহেবেরা করিয়াছেন যাঁহারদিগকে তাঁহারদিগের অধীন হিন্দুরা অদ্যাবধি মর্য্যাদা পূর্ব্বক স্মরণ করিতেছেন আর পূর্ব্ব গবরনর জেনরল শ্রীলশ্রী ওয়ারন হেষ্টিংস বাহাদুর মেং নথোনিয়ল স্মিথ সাহেবের প্রার্থনা ক্রমে যিনি তখন কোর্ট অফ ডাইরেকটরের চারমেন ছিলেন এবং অনেক হিন্দু শাস্ত্রে বিলক্ষণ বিজ্ঞ ছিলেন তিনি

এই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে সতীর বিষয়ে শাস্ত্র যথার্থ বটে এবং এই প্রকার আরো অনুসন্ধান মেং উইলকিন্‌স সাহেব করিয়াছিলেন যিনি এই কর্ম্মে প্রেরিত হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত হিন্দুরদিগের শাস্ত্র ও ব্যবহার জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে বারাণসে ছিলেন আর তাঁহার ব্যবস্থা ঐ ওয়ারন হেষ্টিংস সাহেবের ব্যবস্থার তুল্য ছিল এবং এই ব্যবস্থা মেং জনাথন ডঙ্কিন সাহেব মান্য করিয়াছিলেন যাঁহারা উৎসুক্য ও উত্তম বিচার বারাণসে এবং হিন্দুস্থানের অন্য২ খণ্ডে হিন্দুরা কৃতজ্ঞতার সহিত দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্মরণ করিবেক।

লার্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে কোন২ খ্রীষ্টিয়ান মিসিনরি যাহারা প্রথমে এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল গুপ্তভাবে কিছু মিথ্যা ও অত্যুক্তি বৃত্তান্ত সতীর বিষয়ে লিখিয়া কৌন্‌সলে অর্পণ করিয়াছিল এবং প্রথম এই কথা কহিয়াছিল যে এ বিষয় অশাস্ত্রপূর্ব্ব উক্ত শ্রীশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল কৌন্‌সলের বৈঠকে মেং ডঙ্কিন সাহেবের সহায়তাতে অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয় যথার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং আমারদিগকে পূর্ব্বমত ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়াতে তুষ্ট ছিলেন শ্রীশ্রী লার্ড ময়রা ও আমহের্ষ্ট সাহেবের সময়ে অনেক ইউরোপীয় মিসিনরি যাঁহারা হিন্দুদিগকে ও অন্য লোককে ধর্ম্মচ্যুত করাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই সতীর ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই মিথ্যা বড় প্রাগল্‌ভ্যে করিয়া কহিয়াছিলেন যে হিন্দুরদিগের স্ত্রীদিগকে বলক্রমে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করে ইহাতে সরকারের মনোযোগ হইয়াছিল এবং মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এই আজ্ঞা হইয়াছিল যে সতী যাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক চিতারোহণ করে এমত ধারা নির্দ্ধারিত করিবেন এবং তাহারদিগকে কোন কথা লওয়াইতে ও বল করিতে না পারে পূর্ব্বে সরকারের কর্ম্মকারি সাহেব লোকেরা সাধারণ ঐক্যমতে এই রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে সতীর বিষয়ে যত প্রকরণ আমারদিগের গোচর হইয়াছে তাহাতে বিধবারা আহ্লাদপূর্ব্বক স্ব স্ব স্বামির মৃত শরীরের সহিত জলচ্চিতারোহণ করিয়াছে ইহাতে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল-বাহাদুর সম্মত হইয়াছিলেন এবং আর কেহ এ বিষয়ে হাত দেন নাই। উপযুক্ত ধারা যাহা প্রচলিত হইতেছে ইহাতে মানসসিদ্ধ হয় নাই এবং এই প্রমাণ হইয়াছে যে ধর্ম্মবিষয়ে কোন ক্রমে হাত দেওয়া অতি অনীতি।

বাঙ্গালাতে অতি অল্প দিনের মধ্যে সতীর সংখ্যার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল ইহার কারণ নির্দ্ধারিত জানিবার জন্য সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা হইয়াছিল সেথান হইতে ইহার কোন সন্তোষজনক কারণ নিরূপিত হইতে পারে নাই। যদ্যপি বৃদ্ধ সাহেব লোকের নিকট এমত ঘটনা হইতে পারে তথাপি এ বিষয়েও রাজ্যাধিপের মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে সতীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে দেশীয় প্রজাবর্গের মনোযোগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

সতীর বিষয়ে প্রসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা যাহা আমরা পশ্চাৎ কৌন্‌সলে নিবেদন করিব

তাহাতে বুঝিবেন যে মৃত স্বামির সহিত বিধবারদিগের সহগমন নিবারণ করিতে ধর্ম্মের উপর আঘাত করা ও সতীত্ব নষ্ট করা ব্যতিরেকে আর কোন ভদ্রতা প্রাপণ হইতে পারে না। লার্ড ক্লেব সাহেবের সময়ে তাঁহার দেওয়ান ৺মহারাজ নবকৃষ্ণ এক বিধবাকে সহগমন করিতে বারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এই কহিয়া যে তোমার স্বামির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্তা হইয়াছে। পরে যখন সে কেবল মিথ্যা বিড়ম্বনা জানিতে পারিল তখন তাহাকে নির্বাহযোগ্য ধন দিতে চাহিলেন কিন্তু কিছুতে সম্মতা হইল না সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল ইহাতে লার্ড ক্লেব সাহেব আজ্ঞা করিলেন যে হিন্দুর-দিগের ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তনিক্ষেপ করা উচিত নহে।

সে যাহা হউক আপনি কৌন্সলের বৈঠকে দেখিবেন যে তোমার পূর্ব্বের দেশাধিপতিরা অনেক কাল ভারতবর্ষে থাকিয়া হিন্দুরদিগের শাস্ত্র ও ব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং কখন এমত বিধান করেন নাই যে যদ্দ্বারা ধর্মপরায়ণ ও বিবেকি হিন্দুলোক অতি-দুরবস্থাপ্রাপ্ত হয় কিম্বা কোন ক্রমে দেশাধিপতির প্রতি হিন্দুরদিগের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ও আজ্ঞা মান্য না হয় ও ধর্ম্মের বিধি উল্লঙ্ঘন করে।

আমরা ইহা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে এই প্রার্থনা করি যে শ্রীশ্রীযুত প্রথম জর্জ বাদশাহের রাজ্যাবধি এ পর্য্যন্ত পারলিমেণ্ট হইতে যে সকল আইন প্রচার হইয়াছে এবং যাহা সেই কালাবধি দৃঢ়রূপে রক্ষা পাইয়াছে তাহাতে পক্ষপাত বিনা আপনি মনোযোগ করেন তাহার সার এবং আভাস এই যে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে হিন্দু প্রজারদিগের ধর্ম্ম ও ব্যবহারে হাত না দেয়।

এই সকল আইন সত্যজ্ঞানির মনে অনুভব হইয়াছে আর যে সকল লোক আমার-দিগের শাস্ত্র ও ভাষা ও ব্যবহার সুন্দর জ্ঞাত আছেন তাঁহারা ইহা সহ্য করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত জনেরদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানবান রাজকার্য্যের ভার নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারা আমারদিগের ধর্ম কখন অতিক্রম হয় নাহি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎকালে ভূতকালের ন্যায় তাহা অলঙ্ঘ্যরূপে রক্ষা পাইবেক যেহেতু সে সকল ভারি জামিন ও সনন্দের ন্যায় আমরা আপন হাকিম হইতে পাইয়াছি যাহার উপর আমারদিগের ধনপ্রাণাপেক্ষা আমারদিগের অতি পবিত্র ধর্ম্মের নির্ভর। আর আমরা সত্য কহিতেছি যে আপনি কৌন্সলের বৈঠকে এই আবশ্যক বিষয় মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে ভাবনা ও ভয়ের সহিত যে চিন্তা আমারদিগের ও কোম্পানি বাহাদুরের সমস্ত শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দু প্রজাবর্গের মনে হইয়াছে তাহা পরি-ত্যাগ হইবেক আর আপনকার সদ্বিবেচনা দ্বারা এই মত আর কোন বিষয়ে আক্রমণ হইতে আমরা চিরকাল রক্ষা পাইব ইতি *।আরজী সমাপ্ত।*।

আরজীর সঙ্গে যে ব্যবস্থা পত্র দেওয়া যায়।

অথ মহামরণ মীমাংসা অর্থ।

স্বামীর পরলোক হইলে যে স্ত্রী চিতারোহণ করে সে স্ত্রী অরুন্ধতীর তুল্যা স্বর্গে পূজ্যা হয়॥

যে স্ত্রী সহগমন করে সে স্ত্রী মনুষ্য শরীরে যে সাড়ে তিন কোটী লোম আছে তৎ সংখ্যক বৎসর পতির সহিত স্বর্গ ভোগ করে।

সর্পগ্রাহি ব্যক্তি যেরূপ গর্ত্ত হইতে সর্পকে বলক্রমে উদ্ধার করে তদ্রূপ সতী স্ত্রী পতিকে গ্রহণ করিয়া তৎসহ পরম সুখে স্বর্গভোগ করে॥

যে স্ত্রী ভর্ত্তৃ সহগমন করে সে মাতৃকুল ও পিতৃকুল এবং যে কুলে ঐ কন্যা দত্তা হয় অর্থাৎ ভর্ত্তৃকুল এই তিনকুল পবিত্র করে॥

সেই পতিপরায়ণা অথচ উৎকৃষ্টা এবং উৎসাহযুক্তা স্ত্রী পতির সহিত চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত স্বর্গে ক্রীড়া করে॥

ব্রহ্মহন্তা কিম্বা কৃতঘ্ন অথবা মিত্রহন্তা যে মনুষ্য হয় তাহার স্বাধ্বী স্ত্রী চিতারোহণ করিলে তাহাকেও উদ্ধার করে এই অঙ্গিরস মুনি কহিয়াছেন।

স্বাধ্বী স্ত্রীরদিগের স্বামির সহিত মৃত্যু হইলে অগ্নিতে প্রবেশ বিনা আর অন্য কোন ধর্ম্ম নাই ইত্যাদি অঙ্গিরার বচন সকল।

এবং স্বামীর পরলোক হইলে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক অথবা পতির সহিত অনুগমন করিবেক ইতি শুদ্ধিতত্ত্বাদি গ্রন্থধৃত বিষ্ণুসূত্র।

ব্রহ্মচর্য্যই বা করুক অগ্নিতেই বা প্রবেশ করুক এই নির্ণয়সিন্ধুধৃত মনুবচন॥

যদ্যপি কোন নারী দৈবক্রমে পতির অনুগমন করিতে না পারে তথাপি সে নারী নিজ সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবেক নতুবা তাহার নরক প্রাপ্তি হয় এবং সতীত্বের বিপরীতাচরণ করিলে তাঁহার পতি ও পিতা ও মাতা ও ভ্রাতৃবর্গ সকলেই নরকগামী হন॥

এই কাশীখণ্ড বচনে কলিতে স্ত্রীরদিগের সহগমন অনুগমন ভিন্ন আর গতি নাই ইতি নির্ণয় সিন্ধুধৃত বচন॥

এবং স্ত্রী লোকেরদের যে চিতারোহণ সে আপনার ও স্বামির সর্ব্ব পাপনাশক ও নরক নিবারক এবং অনেক স্বর্গের ফলদায়ক ও মুক্তি বিধায়ক হয়॥

ইতি নির্ণয় সিন্ধু গৃহ্যকারিকোক্ত বচন॥

ইত্যাদি নানা দেশীয় নানাবিধ গ্রন্থে ধৃত নানা মুনিবচন সমূহের দ্বারা পতির পরলোকানন্তর সাধ্বী স্ত্রীর সহগমন কর্ত্তব্য। যদ্যপি সহগমন করিতে না পারে তবে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন কর্ত্তব্য ইহা নিণয় হইল।

এই বিষয়ে নাস্তিক মতের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তহেতুক পাষাণ্ড ধর্ম্মাসক্ত কোন ব্যক্তি যথার্থ শাস্ত্রার্থের অবধারণ করিতে না পারাতে পরম বুদ্ধিমৎ মুনিগণেরদিগের বচন সমূহের যথার্থ মীমাংসার বিপরীতার্থ ব্যাখ্যা করে। যথা পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুসূত্রে ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম গ্রহণ হেতুক পাঠক্রমে তাহার প্রাধান্যপ্রযুক্ত বিধবা স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন কর্ত্তব্য। তাহাতে অক্ষমা হইলে চিতারোহণ কর্ত্তব্য। অপর ব্রহ্মচর্য্যেরও ক্রমেতে চিত্তশুদ্ধিসাধনতা হেতুক পরম্পরা-ক্রমে পরম পুরুষার্থ যে মুক্তি তাহার প্রযোজক হওয়াতে অনিত্য অথচ অল্পসুখস্বরূপ স্বর্গের কারণীভূত যে সহমরণ তদপেক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যের প্রশস্ততা হেতুক বিধবার সর্ব্বথাই ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। অপর অন্য অন্য স্মৃতি অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বেদমূলকত্বহেতুক মনুর স্মৃতির বলবত্তা নিমিত্ত সহমরণের মনুসংহিতাতে তাহার কথন থাকিলেও মনুর অর্থের বিপরীত যে অপ্রশস্ত এই শাস্ত্রেতে তাহার অপ্রাশস্ত্যনিমিত্ত তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা নাই কিন্তু স্বাধ্বী স্ত্রীরদিগের অত্যুত্তম ধর্ম্মাভিলাষিণী হইয়া স্ত্রী নিজ মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারির ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষান্তা অর্থাৎ মানস ব্যভিচারাদি রহিতা হইয়া থাকিবেক। ইহা মনু কর্ত্তৃক উক্ত। এবং ভর্ত্তার মরণানন্তর ব্রহ্মচর্য্য করিবেক অথবা ভর্ত্তার সহিত জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেক এই বিষ্ণু-সূত্র এবং অন্য২ স্মৃতিতে ব্রহ্মচর্য্যবিহিত হইয়াছে অতএব ব্রহ্মচর্য্যই আচরণ করিবেক। এই কল্পত্রয়ক্রমে দোষা যাইতেছে।

যথা নাদ্য। যে হেতুক যে স্ত্রী ভর্ত্তার অনুগমন না করিতে পারে ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কাশীখণ্ডের বচনের অর্থ আলোচনা করিয়া বিষ্ণুসূত্রেতে উক্ত পাঠক্রমের অপেক্ষায় অর্থ-ক্রমের বলবত্ত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রথম যে সহমরণ তাহার নানা শাস্ত্র বোধিত নানা প্রকার পাপযুক্ত পতির ও আপনার পবিত্রতা এবং পিতা মাতা ভর্ত্তা এই তিন কুলের উদ্ধার এবং চিরকাল ব্যাপক স্বর্গ ভোগানন্তর মুক্তিস্বরূপ অনুপম বিবিধ ফলসাধনহেতুক পতির মরণান্তর পত্নীর প্রথমেই অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে সহগমণ শাস্ত্রবোধিত হইয়াছে কোনরূপে দৈবপ্রতিবন্ধকে যদ্যপি চিতারোহণ করিতে না পারে তবে তাহা হইতে অধমকল্প হেতুক অপ্রশস্ত যে ব্রহ্মচর্য্য তাহা অবলম্বন করিবেক এমত শাস্ত্র থাকিলেও সহমরণে শক্তা যে স্ত্রী সে কাশীখণ্ডাদিতে উক্ত যে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গীভূত শীল অর্থাৎ তাহার অভাব নিমিত্তক আপনার অধঃপতন ও পতির ও পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃবর্গের নরক পতনাদিরূপ অত্যন্ত অনিষ্ট এবং ভয়ে ভীতা যে স্ত্রী তাহার ব্রহ্মচর্য্য অকর্ত্তব্য।

এবং দ্বিতীয়ও নহে। চিত্তশুদ্ধ্যাদিজনন দ্বারা অতি পরম্পরাতে ব্রহ্মচর্য্য মোক্ষের উপায় হইলেও অল্পক্লেশও অল্প কালসাধ্য এবং পূর্ব্বোক্ত বিবিধ স্বর্গভোগাদির অব্যবহিত পরক্ষণেই মুক্তির কারণ যে সহমরণ তাহাতে অসমর্থা যে স্ত্রী তাহার ব্রহ্মচর্য্য অকর্ত্তব্য যেহেতুক ব্রহ্মচর্য্য বহুকাল ও বহুক্লেশ সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অনিষ্ট হওয়াতে অকর্ত্তব্যত্বরূপেই শাস্ত্রে বোধিত হইয়াছে।

এবা তৃতীয়ও নহে। যেহেতুক সহমরণ মন্বর্থবিরুদ্ধ নহে এবং পূর্ব্বোক্ত কাশীখণ্ডীয় বচনানুসারে আর্থিকক্রমহেতুক অবশ্য কর্ত্তব্যত্বরূপে শাস্ত্রে বোধিত হইয়াছে। এবং শেষকল্প যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার কাঙ্‌ক্ষন্তী তমনুত্তমমিত্যন্ত মনু বচন প্রতিপাদিত কাম্যত্বহেতুক সহমরণে অসমর্থা যে স্ত্রী তাহার ঐ ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তব্য।

যদ্যপি সহমরণের বিধি মনুসংহিতাতে নাই তথাপি বিরুদ্ধ নহে। যেহেতুক দুর্গোৎসব দোলযাত্রা দীপান্বিতাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্ম ইহাও মনুকর্ত্তৃক ধৃত নহে অতএব মনুর বিপরীতত্বহেতুক এই সকল কর্ম্মও কেহ না করুক। যদি বল না করিলে ক্ষতি নাই তাহা হইলে নানা দিগ্দেশীয় বেদ পুরাণ মতালম্বি নানা পণ্ডিতবর্গের তত্তৎ কর্ম্মবোধক শাস্ত্রেতে অপ্রামাণ্য হেতুক সেই২ কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি না হওয়াতে মনুভিন্ন তাবৎ শাস্ত্রের উচ্ছেদ হইতে পারে। এবং আমারদিগের দেশের মধ্যে যবন ও নাস্তিক ভিন্ন কেহ শাস্ত্রের বৈকল্য স্বীকার করেন না যাহাতে পাষণ্ডমতের প্রাবল্যের আশঙ্কা হইবেক।

তবে অন্য স্মৃতিতে উক্ত যে সহমরণ দুর্গোৎসবাদি তাহা মনুস্মৃতিতে অনুক্ত হইলেও মনু কর্ত্তৃক নিষেধ নাই এ প্রযুক্ত অবিরুদ্ধ যেহেতুক নিষিদ্ধ কর্ম্ম স্বমতের বিপরীত হয় না সুতরাং সহমরণ মনুর বিরুদ্ধ নহে। তুষ্যতু দুর্জ্জনইতি ন্যায় ক্রমে সহমরণ মনুর অকথিত্ব-প্রযুক্ত মনুবিরুদ্ধত্ব স্বীকার করিলেও ক্ষতি নাই। তথাহি গৌড়দেশীয় অনেক ছাপার পুস্তকে অনবধানতাপ্রযুক্ত সহমরণবিধায়ক বচন ছাপা করে নাই।

এই বচনদ্বারা সহমরণ মনুকথিতত্বরূপে অবধারিত হইল। এবং অনিষিদ্ধ অনুমত হয় এই যে দত্তক চন্দ্রিকাদি গ্রন্থ লিখিত ন্যায় তদনুসারে ও মনুর বিপরীত হইল না। এবং এই নারী বিধবা নহে ইত্যাদি ঋগ্বেদে কথিত সহমরণের মন্ত্রদ্বারা বোধিত যে বেদ সম্মত সহমরণ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতার ব্যাঘাত নাই। যেহেতুক শ্রুতি এবং স্মৃতি এ উভয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে শ্রুতির প্রাধান্যপ্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্য। আত্মহত্যা পাপভয়ে সহমরণ কর্ত্তব্য নহে ইহা কথন অযোগ্য যেহেতুক ব্রহ্মপুরাণে এমত কথিত আছে যে ঋগ্বেদে কথনপ্রযুক্ত সাধ্বী স্ত্রীর সহমরণে আত্মহত্যার পাপ হয় না।

অতএব ব্রহ্মচর্য্যাপেক্ষায় অতি প্রাশস্ত্যরূপে সহমরণ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্বশাস্ত্র মীমাংসা পণ্ডিতেরদের সম্মতা ইতি।

ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অনুমত্যনুসারে কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল শকাব্দ ১৭৫২ সন ১২৩৭ ॥ * ॥ * ॥ * ॥

আরজীর উত্তর

শ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি হিন্দুরদিগের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদিগের আত্মঘাত

বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামির মরণানন্তর তাঁহারদিগের ব্রহ্মাচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ বটে এবং যে সকল শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মান্য তত্তদ্গ্রন্থে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত মুখ্যকল্প রূপে উক্ত হইয়াছে এবং আরো লিখিত আছে যে ঐ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ যে কালকে হিন্দুলোকেরা বর্ত্তমান কালাপেক্ষা উত্তমরূপে গণনা করেন পূর্ব্বকালে যে ঐ ব্যবহার ছিল আমারদিগের তদ্বিষয়ক বোধ আছে কিন্তু যে পণ্ডিতেরদিগের স্থানে প্রার্থনাকারিরা সহমরণ বিষয়ে এক্ষণে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন সে পণ্ডিতেরদিগের ঐ পূর্ব্বকালীন ব্রহ্ম-চর্য্য ব্রতরূপ ব্যবহার বিষয়ক বোধ থাকাতেও আমারদিগের সন্তোষ জন্মিয়াছে।

অতএব হিন্দুবদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির এমত দুরবস্থা হয় নাই যে গবরনমেণ্টের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয় কি আপনারদিগের শাস্ত্রের ব্যবস্থোল্লঙ্ঘন করিতে হয় যেহেতুক বিধবারদিগের ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করাতে এককালে গবরনমেণ্টেব আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং স্বধর্ম্মের মুখ্য কল্প ও প্রতিপালন করা হয় এবং ইহাতেও হিন্দুবদিগেব উৎকৃষ্ট পূর্ব্বকালীন সদ্ব্যবহারের আদর্শ ও বর্ত্তমান লোকেরদিগের দর্শায়ন হয়।

ধর্ম্মের বিষয়ে হিন্দুরদিগের যাদৃচ্ছিকানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে কিছু ব্যাঘাত জন্মাইবেন না। এবং ও যথার্থের সহিত যে সকল অনুষ্ঠান অবিরুদ্ধ হয় এমত পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যবহৃতানুষ্ঠানে তাঁহারদিগেব কিছু প্রতিবন্ধকতা হইবে না ইহা প্রার্থনা-কারিদিগেব স্থানে পুনরুক্তিকরণেব কোন আবশ্যক নাই কিন্তু সেই সকল ব্যবহারের মধ্যে কতিপয় ব্যবহার শ্রীশ্রীযুতেব পূর্ব্বপদস্থেরা মনুষ্যেরদিগের জীবন সংরক্ষণার্থে এবং সম্বন্ধের পারিপাট্য করণার্থে সময়ক্রমে তাহা রহিত করণের আবশ্যক বুঝিয়াছেন সেকাল ব্যবহারেব এক্ষণে স্মরণ আবশ্যক নাই প্রাণরক্ষার উপায় মাত্র রহিত এমত শৈশবকালে যে মাতার স্তন্য দ্বারা যে পুত্র আপনার প্রাণরক্ষা করেন সেই পুত্র যে সেই মাতার আত্মঘাত বিষয়ে সচেষ্ট হন এরূপ ব্যবহারকে পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতীয় লোকেরা অনুমতির বহির্ভূত করিতে একবাক্য হয়।

শ্রীশ্রীযুত অতি সম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিরদিগের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগ-পূর্ব্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যেং বিবেচনাপূর্ব্বক রহিত করণের আবশ্যক দেখিয়াছেন তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রার্থনাকারিরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত আইন পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ড রাজার কৌন্সলে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথা প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন।

১৪ জানেওয়ারি ১৮৩০ সাল।

ডবলিউ সি বেণ্টিঙ্ক।
W. C. BENTINCK.

পরিশিষ্ট—খ

ভূমিকা

বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র প্রচার করিয়া কোন পণ্ডিতাভিমানী এক ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করত বৃটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামক সমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন অভিপ্রায় তদ্দারা তাহা গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হয় কিন্তু ঐ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুত উইলিয়ম থিওবৌল্ড সাহেব ঐ ব্যবস্থার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য নিশ্চয় করণার্থ স্বীয়াভিপ্রায়িক লিপি সম্বলিত ঐ ব্যবস্থা পত্র ধর্ম্মসভায় প্রেরণ করেন অনন্তর ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তদুত্তর ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত হইয়া উক্ত সম্পাদকের নিকট পাঠান গিয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থ তদবিকল সংস্কৃত এবং তদীয় ভাবার্থ সমাজের অনুজ্ঞানুসারে প্রকাশ করা গেল যদ্যপিও বিশিষ্ট শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠগণের বিলক্ষণ বিজ্ঞান আছে যে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র নাই তথাপি অজ্ঞ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ব্যবস্থাভাসে মনশ্চাঞ্চল্য না জন্মে তজ্জন্য এই প্রাড়ম্বর সুতরাং করিতে হইল ইতি—

ধর্ম্মসংসৎপতি শ্রীল রাধাকান্তনৃপাজ্ঞয়া।

ব্যবস্থা ব্যাহৃতা সাধ্বী শ্রীরামজয় শর্ম্মণা ॥

ধর্ম্মসভা পণ্ডিতাধ্যক্ষাণাম্।

শ্রীরামজয় শর্ম্মণাম্।	শ্রীকান্তিচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মণাম্।	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণাম্।	শ্রীগুরুপ্রসাদ শর্ম্মণাম্।
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্।	শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টানাং।
শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণাম্।	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মণাম্।
শ্রীরামমাণিক্য শর্ম্মণাম্।	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

উক্ত ব্যবস্থার ভাবার্থ।

নাস্তিক এবং ম্লেচ্ছ ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি সকল জাতীয়া সধবা স্ত্রীদিগের কেবল স্বামি ভক্ত হওয়াই পরম ধর্ম্ম ইহা মন্বাদি কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে এবং পতিকে পরিত্যাগ করিলে পাতিত্যও জন্মে। অপর বিধবাদিগের সহমরণ অথবা ব্রহ্মচর্য্য এই দুইমাত্র পরম ধর্ম্ম তন্মধ্যে নিত্যফলদায়ক ব্রহ্মচর্য্য আর অনিত্য ফলদায়ক সহগমণ এই প্রকার তারতম্যে ব্যবস্থা কহিয়াছেন।

ইহার প্রমাণ।

মনু কহেন, স্ত্রীদিগের স্বতন্ত্র যজ্ঞ নাই ব্রত নাই উপবাস নাই পতিকে যে শুশ্রূষা করা তদ্দ্বারাই স্বর্গ হয়। শঙ্খ কহেন, ভর্ত্তার আজ্ঞা হইলে স্ত্রীলোক ব্রতাদি পুনঃ পুনর্বার

করিতে পারে ইহাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। কাত্যায়ন কহেন, স্ত্রীলোক স্বামিশুশ্রূষা দ্বারাই সকল কামনা সিদ্ধ করে। দেবল কহেন, স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম এই যে স্বামিশুশ্রূষা এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করা ও তৎপূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করা। শঙ্খ অপর কহেন, ব্রত কিম্বা উপবাস অথবা নানাবিধ ধর্ম্ম করিলে স্ত্রীলোকের স্বর্গ হয় না কিন্তু পতিসেবাতেই তাহা হয়। কাশীখণ্ডে ব্যক্ত হয়, স্বামী যদি নপুংসক অথবা দুবরস্থাপন বা ব্যাধিযুক্ত বা বৃদ্ধ বা দরিদ্র হয় তথাচ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক না। বিবাহ সময়ে কন্যাকে ব্রাহ্মণেরা এই কথা কহিবেন যে ভর্ত্তার জীবনে বা মরণে সহচরী হইবা। পারস্কর কহেন, যে স্ত্রী ইচ্ছা পূর্ব্বক অথবা ক্রোধবশত কিম্বা অন্য কোন কারণে পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে অবলম্বন করে সে পতিতা হয়। ব্রাহ্মণাদিরা তাহাকে কি দৈব কি পৈত্র কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। পতিসত্ত্বে বা মরণান্তে যে স্ত্রী অন্য পুরুষ আশ্রয় করে সে পশু তুল্যা তাহাকে পরিত্যাগ অথবা বধকরা কর্ত্তব্য। এজন্য মনু কহেন, ক্ষুদ্র দুঃসঙ্গ হইতেও স্ত্রীদিগকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক যেহেতু উপেক্ষা করিলে স্ত্রীলোক উভয় কুলের শোক বিধান করে। বিষ্ণু কহেন, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য্যা অথবা সহগমণ করিবেক। এই স্থলে মিতাক্ষরা ব্যাখ্যা করেন, ব্রহ্মচর্য্যাই প্রধান যেহেতু তাদ্দ্বারা অক্ষয় ফল জন্মে আর সহগমণ কাম্য প্রযুক্ত তদপেক্ষা অপ্রধান। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ব্যক্ত হয়, বিধবা স্ত্রীদিগের ব্রহ্মচর্য্য নিত্য কর্ত্তব্য। অপস্তম্ব কহেন, বৈধব্য হইলে স্ত্রীলোক ভর্ত্তার কিম্বা পিতার অথবা আত্মীয় ব্যক্তির আলয়ে থাকিয়া সংযত কৃত্যা হইয়া আচার পূতা থাকিবেক এবং দিবা রাত্রি ভর্ত্তৃশোকাকুলা থাকিয়া ব্রতোপবাস দ্বারা শরীর ক্ষীণ করত আয়ুঃশেষ হইলে পতিলোকে গমন করে। নারদ কহেন, বৈধব্য হইলে বিহিত পুষ্প মূল ফল দ্বারা দেহোচিত সময় যাপন করিবেক অন্যপুরুষের নাম গ্রহণও করিবেক না। ব্যাস কহেন, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পতিব্রতা স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যা করিবেন। ব্রহ্মচর্য্যাপদে মৈথুনাদি পরিত্যাগ ইহা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থ কর্ত্তারা সপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাশীখণ্ডে ব্যক্ত হয়, স্ত্রীলোক যদি দৈবাধীন কোন প্রকারে সহগমণ করিতে না পারে তবে শীলরক্ষা কবিবেক কিন্তু যদি সেই শীলভঙ্গ হয় তবে অধঃপতন হইবেক। ইত্যাদি বাক্য কহিয়া বিধবা স্ত্রীর বৈধব্য পালন স্বরূপ শীলরক্ষাই নিত্যধর্ম্ম কহিয়াছেন। এই নিমিত্ত কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যা করাই বিধবা স্ত্রীর ধর্ম্ম ইহা মহাপ্রামাণিক স্মৃতি চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছেন।

অতএব সধবা এবং বিধবার যে কোন প্রকারে পূর্ব্বপতি ব্যতীত অন্য পুরুষাশ্রয় করা অত্যন্ত কুকর্ম্ম ইহাই যথার্থ। পূর্বোক্ত দুই প্রকার অনন্দিত স্ত্রীধর্ম্ম ব্যতীত পুরুষান্তরাশ্রয় করা বেদে এবং আগম ও স্মৃতি কিম্বা পুরাণাদিতে উপলব্ধি হয় না এই হেতুক স্বকপোল কল্পিত এবং হেতুর ন্যায় বাক্য দ্বারা যোজিত স্ত্রীগণের যে পুনর্বার

বিবাহ তাহাকে যে সৎ স্ত্রীধর্ম্ম কহা তাহা পণ্ডিতেরা গ্রাহ্য করেন না। দেখ অন্য-পুরুষাশ্রয়রূপ যে পুনর্ভবন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ তাহা সধবা বিধবা উভয়ের প্রতি সম্ভব হইতেছে তন্মধ্যে সধবাগণের স্ত্রীধর্ম্ম প্রকরণ পূর্ব্বোক্ত এবং পরে বক্ষ্যমাণ নানা মুনি রচনাদ্বারা কথিত হয় যে পতিমাত্র অবলম্বন করিবেক আর পতিত্যাগ করিয়া অন্যপুরুষাবলম্বনে পতিতা হয় এবং দৈবপিতৃকর্ম্মে অনধিকারিণী ও ত্যাগ অথবা বধযোগ্য হয় কুলকে অধম বা বিনাশ করে এবং সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না এই সকল বাক্য-দ্বারা সাধুজনবিগর্হিত অথচ স্ত্রীধর্ম্ম প্রকরণে অকথিত যে পুনর্ব্বার বিবাহ তাহা সতের অনুষ্ঠেয় সদ্ধর্ম্ম নয় ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যেমত বেশ্যা ও তস্কর ধর্ম্ম শাস্ত্রে উল্লেখিত হইলেও অগ্রাহ্য। বিধবাদিগেরও স্ত্রীধর্ম্মমধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই নিত্যানুষ্ঠেয় কহিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের উপদেশ দিয়াছেন ও পতিমরণোত্তর অন্য পুরুষের নাম গ্রহণ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন ইহাতে সধবার ন্যায় বিধবাদিগেরও অন্য পুরুষাবলম্বনে পাতিত্য ও দৈব পৈত্রাদি কর্ম্মানধিকারিতা ও বিবাহাসিদ্ধি ও কুলকে অধম বা বিনাশ করা এবং সদাচারের বিরুদ্ধাচারিণী হওয়া ইত্যাদি দোষ প্রযুক্ত বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ ও বেশ্যা-ধর্ম্মের ন্যায় সাধুরদিগের অগ্রাহ্য বোধ হইতেছে।

যদি বল স্ত্রীলোকের পুনর্বার বিবাহ শাস্ত্রে কহিয়াছেন প্রযুক্ত তাহা কেন অসদ্ধর্ম্ম এবং কেনই বা অনুষ্ঠেয় নয়। উত্তর, যে কর্ম্ম বেদবোধিত অভিলষিত সিদ্ধি ফলক হয় তাহারি নাম ধর্ম্ম এজন্য মনু প্রভৃতি মীমাংসকেরা কহেন শ্রেয়ঃ সাধন ধর্ম্ম। যদি কেবল বেদে উল্লেখ থাকিলেই সেই কর্ম্মের ধর্ম্মসংজ্ঞা হয় তবে অভিকার কর্ম্ম বেশ্যা-বৃত্তি এসকল কর্ম্ম বেদে উল্লেখিত আছে হহীরাও ধর্ম্ম হইতে পারে। যদি ইষ্টাপত্তি কর তবে শ্রেয়ঃসাধন ধর্ম্ম বেদবোধিত অভিলষিত সিদ্ধি ফলক ধর্ম্ম ইত্যাদি প্রকারে মুনিগণ-কর্তৃক উক্ত ধর্ম্মলক্ষণের ব্যাঘাত হউক। প্রকৃত বিষয়ে অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহ নানা অনিষ্টের মূল এজন্য কথিত ধর্ম্ম লক্ষণ তাহার নাই অতএব বিদ্বানেরা তাহার আদর করেন না।

যদি বল পূর্ব্বে এই কর্ম্ম কোন২ সাধুকর্তৃক আচারিত হয় এজন্য সেই সদাচার দ্বারা বেদমূলক অনুমান হইতেছে তাহার ব্যাঘাত কেন হইবেক। উত্তর, নানা বচনের বিরোধ হয় এবং সদাচার বেদানুমাপক নয় অতএব মীমাংসাকার কহিয়াছেন বিশ্বামিত্র চণ্ডালান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন এই সদাচার দ্বারা শ্রুতির অনুমান হইতে পারে না। অতএব সধবা বিধবার পুনর্ব্বিবাহে বর্জ্য শব্দ প্রয়োগ প্রযুক্ত তাহা পর্য্যুদস্ত ফলত বিবাহ সিদ্ধ হয় না অথচ দোষ শ্রবণ প্রযুক্ত প্রবজ্যপ্রতিসিদ্ধ অর্থাৎ পাপজনক। যাজ্ঞবল্ক্য এবং কাশ্যপ কহিয়াছেন অবিনষ্ট ব্রহ্মচর্য্য হইয়া অনন্যপূর্ব্বিকা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।

সপ্তপ্রকার পুনর্ভূ যাহাদিগের বিবাহ করিলে কুল অধম হয় তাহা পরিত্যাগ করিবেক বিশেষত বাগদত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুক মঙ্গলা উদক স্পর্শিতা, পানিগৃহীতিকা, অগ্নিপরিগতা এবং পুনর্ভূপ্রসূতা ইহার অগ্নির ন্যায় কুলদগ্ধ করে। ভস্মাৎ বর্জ্যপদ প্রয়োগাধীন পুনর্ব্বিবাহে ভার্য্যাত্ব সিদ্ধি হয় না ইহাতে সেই স্ত্রী পত্নী নয় কিন্তু অবরুদ্ধা স্ত্রী বিশেষ এইজন্য তাহাকে দৈব পিতৃকর্ম্মে অনধিকারিণী কহিয়াছেন। আর কুল অধম হয় কুলদাহ করে ইত্যাদি দোষ শ্রবণ হেতুক পুনর্ব্বিবাহ। প্রসজ্য প্রতিষিদ্ধ ফলত অধর্ম্ম জনক ইহাও বুঝা যায়। অতএব স্মৃতি চন্দ্রিকাতেও স্বৈরিণীর ন্যায় আচরণ নিষেধের নিমিত্ত কহিয়াছেন যে স্ত্রীলোক পান অশন দিবানিদ্রা ইত্যাদি করিবেক না ইহার দ্বারাও বোধ হয় যে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনশ্চ বিবাহ নিষিদ্ধ কর্ম্ম। অপর অনন্যপূর্ব্বা তাহাকে কহা যায় যে স্ত্রী দান কিম্বা উপভোগ দ্বারা পুরুষান্তর কর্তৃক পরিগৃহীতা নয়। অন্যপূর্ব্বা দুই প্রকার পুনর্ভূ আর স্বৈরিণী, এই পুনর্ভূও দুই প্রকার ক্ষতা অক্ষতা, তন্মধ্যে বিবাহ সংস্কারের পূর্ব্বেই পুরুষ সংসর্গ দুষ্টাকে ক্ষতা কহা যায়, আর যাহার পুনশ্চ বিবাহ সংস্কার হয় তাহার নাম অক্ষতা, পরন্তু যে স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইচ্ছাক্রমে সবর্ণ পুরুষান্তর আশ্রয় করে তাহার নাম স্বৈরিণী এই সকল অন্যপূর্ব্বার বিবাহ পর্যুদস্ত ইহা মিতাক্ষরা কহেন ইহাতে পুরুষ সংসর্গ দূষিতাই হউক আর পুনঃসংস্কার দূষিতাই হউক স্ত্রী লোকের পুনর্ব্বিবাহ দুষ্টকর্ম্ম সাধুধর্ম্ম নয় ইহা ব্যক্ত হইতেছে। অতএব বিবেকটীকাতে পারস্কর বচন যথা কুলটা স্বৈরিণী পরপূর্ব্বা, এসকল স্ত্রী পতিতা হয় তজ্জন্য সে আচার পরিত্যাগ করিবেক। এই বচনে পুনর্ব্বিবাহিতার পাতিত্য কহিয়া সে ধর্ম্মাচরণ নিষেধ করেন। অপর একবার মাত্র কন্যার দান হয় মনু এই কথা কহিয়া বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ করেন অতএব সাধুরা বেশ্যাধর্ম্মের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সে ধর্ম্মের পোষকতা করেন না। অতএব স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এ মনু বচন ব্যাখ্যায় কহেন কন্যার একবার মাত্র যে দান তাহা পাণিগ্রহণ সংস্কারযুক্ত কন্যা স্থলে ফলত ঐ বচন বাগ্দান বিষয়ক নয় যেহেতু বাগ্দান করিলে সে কন্যাতে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হয় না। এজন্য বাগদানান্তর সম্ভব। অতএব অনেকের উদ্দেশে বাগ্দান হইলে কাহাকে কন্যা দিবেক এই ব্যবস্থা বিষয়ক কাত্যায়ন বচন তাঁহারাই পাঠ করেন। ইহার বিস্তার উদ্বাহতত্ত্বে আছে। অতএব মনু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ স্পষ্টত নিষেধ করেন যথা কোন বিবাহ বিষয়ক মন্ত্রে নিয়োগ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর আশ্রয় করার কীর্ত্তন করেন নাই এবং বিবাহ বিধিতে ও বিধবার পুনর্ব্বিবাহ উক্ত হয় নাই বিধবার বিবাহ পশুধর্ম্মতুল্য ইহা বিদ্বানেরা নিন্দিত কহেন, বেন রাজার রাজ্য সময়ে এই কর্ম্ম চলিত হয় সেই রাজা পূর্ব্বে সকল পৃথিবী ভোগ করত কামে উপহত চিত্ত হইয়া বর্ণসঙ্কর করিয়াছেন তদবধি যে ব্যক্তি বিধবা স্ত্রীকে সন্তানার্থ অন্যপুরুষে নিযুক্তা করে সাধুরা তাহাকে নিন্দা করেন।

যদ্বিবল উক্ত বচনের স্থল এই যে যেখানে বাগ্‌দান হইয়া বরের মৃত্যু হইলে সেই কন্যার সন্তানার্থ তাহার দেবর ঐ কন্যাতে উপগত হইবেক এই প্রকার নিয়োগাঙ্গীভূত বিবাহ সেই স্থলেই ঐ নিষেধ। উত্তর, সে বিষয়ের এ স্থলে প্রসক্তি হয় না তজ্জন্য তাহার নিষেধও হইতে পারে না। যেহেতু মনু কহেন ঐ প্রকার নিয়োগ নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির পর ঐ কন্যা দেবরকে গুরুজ্ঞান করিবেন আর দেবর তাঁহাকে বধূজ্ঞান করিবেন অতএব এ স্থলে প্রসক্তি হয় না তজ্জন্য তাহার নিষেধও হইতে পারে না যেহেতু মনু কহেন এ প্রকার নিয়োগ নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির পর ঐ কন্যা ও দেবর পূর্ব্বসম্পর্ক যুক্ত হইবেক ফলত কন্যা দেবরকে গুরুজ্ঞান করিবেন আর দেবর তাঁহাকে বধূজ্ঞান করিবেন অতএব এস্থলে বিবাহ প্রসক্তি কখনই হইতে পারে না কেননা উভয়ের বিবাহানন্তর সন্তান হইলে পূর্ব্বসম্বন্ধানুসারি ব্যবহার হয় না অতএব উক্ত নিয়োগ-ধর্ম্ম নিষেধাধীন তদঙ্গ বিবাহের নিষেধ হইয়াছে একারণ পুনর্ব্বার বিবাহ নিষেধ করা বিফল হয়। পরন্তু উক্ত বচনে দুই নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে ফলত তাদৃশ নিয়োগ অকর্ত্তব্য এবং বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠেয় নয় এই বিধিদ্বয়ের কারণ এই যে বৈবাহিক কোন মন্ত্রে নিয়োগ ধর্ম্ম কহেন নাই এজন্য নিয়োগ ধর্ম্ম নিষিদ্ধ আর কোন বিবাহবিধিতে বিধবার বিবাহ কহেন নাই এজন্য বিধবার বিবাহও নিষিদ্ধ ইহা ঐ বচনস্থ কীর্ত্তন ও কথন এই দুই ক্রিয়া-দ্বারা দুই বিধি স্পষ্টঃবোধ হইতেছে।

অপর বৃহন্নারদীয় পুরাণে ও আদিত্য পুরাণে কলিযুগে বিধবার বিবাহ নিষেধ স্পষ্ট আছে যথা দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন ও দত্তকন্যার পুনশ্চ দান ইত্যাদি উপক্রম করিয়া কহিয়াছেন যে এই সকল কর্ম্ম কলির আদিতে মহাত্মা মুনিগণ লোক রক্ষার্থ ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিবর্ত্ত করিয়াছেন আর সাধুদিগের আচারও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয় ইতি। যদিবল ঐ নিষেধ সাধুরা স্থির করিয়াছেন অতএব তাহা বেদমূলক নয়। উত্তর, ইহা উপরিগত বুদ্ধির কথা ফলত প্রবিষ্ট হইয়া বিবেচনা করিলে একোটির অবতার হয় না যেহেতু বচনার্থ এই যে মহাত্মা মুনিগণ বেদোক্ত যুগধর্ম্ম ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন এই অর্থদ্বারা স্পষ্টত বেদমূলক বোধ হইতেছে। যদিবল পণ্ডিতেরাই নিষিদ্ধ করিয়াছেন যে নিষেধ বেদে নাই। উত্তর, বচনান্তরে আছে কোন২ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বতন কর্ম্মে গৌণকাল কহেন এবং বচনান্তরে আছে বিবাহ শুদ্ধি সকলেই বলেন ইত্যাদি বচনোক্তি বিষয় আপনকার কথানুসারে বেদমূলক হইতে পারে না এবং উক্ত পুরাণের অপ্রামাণ্যও হয় যেহেতু তদুক্ত বিষয় যদি বেদমূলক না হইল তবে তাহারও বেদমূলকত্ব থাকে না বেদমূলকত্ব প্রযুক্তিই পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য ইহা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় মীমাংসা শাস্ত্রে জৈমিনি সূত্রে ব্যক্ত আছে। বিশেষত উক্ত বচনে লোক রক্ষার্থ বলিয়া জানাইতেছেন যে অন্য যুগে বহুতর পুণ্যযুক্ত তেজস্বি ব্যক্তিরা যদিও অবিহিত কর্ম্ম করেন তথাচ তদ্দ্বারা লোকক্ষয় হয় না সে পাপ

তাঁহারদের পুণ্য দ্বারাই ক্ষয় পায় কিন্তু কলিতে সকল ব্যক্তিই অল্প পুণ্যযুক্ত তাঁহারদের কৃত অশুভ কর্ম্ম দ্বারা লোক ক্ষয় হইতে পারে এজন্য লোকরক্ষার্থ নিবর্ত্ত করিয়াছেন। কলিযুগে মুনিদিগের বাক্যদ্বারা বিধবাদিগের বিবাহ যে বেদমতে নিষিদ্ধ তাহার প্রতি সদাচার প্রমাণও আবশ্যক হয় কেননা মিতাক্ষরাধৃত বচনে কহে লোকে যে কর্ম্মকে দ্বেষ করে তাহা করিলে স্বর্গ হয় না এজন্য তাহা আচরণ করিবেক না এই নিমিত্ত ঐ বচনে সদাচারেরও প্রামাণ্য কহিতেছেন যে নিবার্ত্তিত কার্য্যে সাধুরদিগের আচারও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয় অতএব বিধবা বিবাহ নিষেধে বেদ এবং সদাচার উভয় প্রমাণ আছে এই অর্থ উক্ত বচনস্থ চকার ও অপরিকার দ্বারা বোধ হইতেছে নতুবা তাহা দেওয়া ব্যর্থ হয়। এবং হোলাকাধিকরণ ন্যায় বশত এস্থলে সদাচার দ্বারা বেদ অনুমান করিতে হয় যেমত স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নানা কর্ম্মে বেদ অনুমান করা যায়।

অতএব মদনপারিজাত ধৃত সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থের নানা বচনে উপলব্ধি হইতেছে যে সর্ব্বত্র যুগধর্ম্ম যে প্রকার কথিত আছে তাহা গ্রহণ করিবেক এই কথার পর দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন ও বানপ্রস্থাশ্রম এবং দত্তা ক্ষতা কন্যার অন্য ব্যক্তিতে পুনর্দান ইত্যাদি ধর্ম্ম কলিযুগে বর্জনীয় পণ্ডিতেরা কহেন এই বচনে যথোচিত শব্দে বেদে যে প্রকার কথিত এই অর্থই বোধ হইতেছে অতএব এ নিষেধ যে বেদমূলক তাহা অপহ্নব করা যাইতে পারে না। তস্মাৎ কোন্ যুগের কিং ধর্ম্ম এই অপেক্ষায় দেবর দ্বারা সন্তানোৎপত্তি ইত্যাদি কহিয়াছেন। পরন্তু এই বচনে ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই নিষেধ প্রত্যক্ষ বেদমূলক নয় বলিয়া যদি শঙ্কা করে তন্নিবারণার্থ বর্জ্যশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন সদাচার প্রমাণ করেন নাই অতএব মনুবচন ও কুল্লূকভট্ট কৃত তদ্ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হয় বেণরাজার অধিকার কালাবধি যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ না জানিয়া দেবরাদিতে মৃতভর্ত্তৃকাদি স্ত্রীকে সন্তানোৎপাদনার্থ নিয়োগ করে তাহাকে সাধুরা নিন্দা করেন ইতি। মৃত ভর্ত্তৃকাদি এই আদিশব্দে দত্তা পুনর্ভূ-স্বৈরিণী বিশেষান্তর স্ত্রীদিগেরও গ্রহণ কেননা বিরোধ নাই। পরন্তু শাস্ত্রার্থজ্ঞানরূপ হেতু কহাতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ না দেওয়া শাস্ত্রার্থজ্ঞানমূলক কহা হইল ইহাতে তৎকর্ত্তৃক ঐ নিষেধ বেদমূলক বলা হইয়াছে। এবং ঐ ব্যাখ্যায় ইহাও বোধগম্য হইতেছে যে যাঁহারা বিধবার বিবাহাদি স্ত্রীধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দেন তাঁহারদিগের শাস্ত্রার্থজ্ঞান নাই। অপর বার্হস্পত্য বচনে কথিত হয় যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে মনুষ্যেরা তপস্বী ও দানশীল হয় কিন্তু বিধাতা কলিযুগের মনুষ্যেরদিগের শক্তিহানি করেন এই নিমিত্ত ঋষিগণ যে-সকল পুত্র করণে ব্যবস্থা দিয়াছেন কলিযুগের মনুষ্যেরা শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত এক্ষণে তাহা করিতে পারে না এই বচনার্থে পৌনর্ভব পুত্রকরণ নিষেধ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ইহাতে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ যে বেদমূলক তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরন্তু মনুও সংক্ষেপ বিধিবাক্য দ্বারা ঐ কর্ম্মকে নিবৃত্ত করত স্পষ্টত বেদমূলক কহেন যথা সত্যযুগে একপ্রকার

ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগের প্রকারান্তর, দ্বাপর যুগে তদ্ভিন্নরূপ, কলিতে অপর প্রকার, যুগের হ্রাসানুসারে ধর্ম্মব্যবস্থা। এই বচনার্থে একযুগের বিশেষ ধর্ম্ম অন্যযুগের আচরণীয় নয় এই বিধি কহিতেছেন। তত্তদ্‌যুগের মনুষ্যেরা তপস্যা দান তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা মহাশক্তিশালি মুনি প্রযুক্ত বিধিনিষেধাতীত এ নিমিত্ত তাঁহারদিগের নিন্দিতা চরণেও ক্ষতি নাই কিন্তু এক্ষণকার মনুষ্যেরা তাদৃশ তপস্যাদিযুক্ত নহে ইহাতে ইহারদিগের যে নিন্দিতাচরণ তাহাতে মহা অনিষ্টই ঘটে ইহা দেখিবার যোগ্য।

যদি বল পূর্ব্বকালের সাধুরা যে সকল নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহাতে যেমত প্রামাণ্য হইতেছে সেই প্রকার যদি এক্ষণকার সাধুরা বিধবার বিবাহ ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করেন তবে তাহার প্রামাণ্য না হয় কেন। উত্তর, একথা বিদ্বানেরদিগের গ্রাহ্য নয় কেননা, বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থা শাস্ত্রার্থ জ্ঞানমূলক নয় ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, আর কলিতে সাধুশব্দ প্রতিপাদ্য ব্যক্তিই সম্ভবে না দেখ মনু কহেন বিদ্বান্ সৎ দ্বেষরাগরহিত ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মকে সেবা ও হৃদয়ে চিন্তা করেন তাহা বুদ্ধিগোচর কর, মেধাতিথি গ্রন্থ কর্ত্তা এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লেখেন বিদ্বান্‌শব্দে শাস্ত্রসংস্কৃতমতি হইয়া প্রমাণ ও প্রমেয়ের স্বরূপাভিজ্ঞানে কুশল এমত ব্যক্তি বেদার্থজ্ঞই হয় অন্যে হয় না, দ্বেষরাগপদে লোভাদিও কহিতে হয় অর্থাৎ রাগ দ্বেষ লোভ মোহাদিশূন্য, সতের এই দুই বিশেষণ যেহেতু বিদ্বান্ ও রাগ দ্বেষাদিদোষ রহিত সেইহেতু সৎ, কেননা এমত ব্যক্তিকেই সাধু কহা যায়। উক্ত বচনে নিত্য শব্দ আছে তদ্দ্বারা ধর্ম্মকে অনাদি বুঝা যাইতেছে। মূর্খ দুঃশীলাদি ব্যক্তিরা যে ধর্ম্ম স্থাপন করে তাহা কিছুকাল লোকে ব্যবহৃত হইলেও তাহার পর বিনাশ পায় সহস্র যুগ পর্য্যন্ত থাকে না ইতি। ইহাতে সাধুর লক্ষণ এই উপলব্ধি হইতেছে যে রাগ দ্বেষ লোভ মোহ প্রমাদাদি দোষ রহিত হইয়া যে ব্যক্তি বেদার্থ জ্ঞান কুশল হন তিনিই সাধু।

এইহেতু পরশুরামপ্রকাশ নামক গ্রন্থ ও আচারোল্লাসে ও প্রবোধময়ূখে স্পষ্ট কথিত আছে যে সৎ অর্থাৎ শিষ্ট তাহার লক্ষণ বৌধায়ন কহেন শিষ্ট সেই সকল ব্যক্তি যাঁহারা মাৎসর্য্যশূন্য অহঙ্কাররহিত কুৎসিৎ দ্রব্য ভোজন করেন না লোভী নহেন সাক্ষাদেদ্বার্থ জ্ঞানযুক্ত এবং দম্ভ দর্প মোহ ক্রোধাদি বর্জিত সেই শিষ্টের যে আচার তাহাই সদাচার ইহা হারীত কহিয়াছেন, সাধুরা দোষরহিত সৎশব্দে সাধু সেই সাধুর যে আচার তাহারই নাম সদাচার ইতি।

অতএব অন্য২ মুনিরা ইদানীন্তন অর্থাৎ কলিযুগের মনুষ্যকে শক্তিহীন কহিয়াছেন। ধর্ম্মলক্ষণ প্রতিপাদক মনুবচনে সাধুসেবিত ও অনাদিপ্রবৃত্তরূপে ধর্ম্ম কথিত হন ইহাতে

অসাধু সেবিত এবং অধুনাকৃত প্রযুক্ত বিধবার বিবাহ যে অধর্ম্ম ইহা স্পষ্ট কহা হইয়াছে তৎপ্রমাণ এই যে নিয়োগ এবং বিধবা বিবাহ উপক্রম করিয়া মনু কহেন, ইহা পশুধর্ম্ম ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহাকে নিন্দিত করিয়াছেন এই ধর্ম্ম বেণরাজার রাজ্য শাসনাবধি মনুষ্য সম্বন্ধে চলিত হয়। কুল্লূকভট্ট এই বচনের ব্যাখ্যা করেন যেহেতু ইহা পশুসম্বন্ধী ধর্ম্ম এই নিমিত্ত মনুষ্যসম্বন্ধে বিদ্বানেরা ইহা নিন্দিত কহেন অধার্ম্মিক বেণ নামক রাজা রাজ্য করিতে প্রবর্ত্ত্য হইলে এই ধর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া খ্যাত হয় এজন্য বেণরাজাবধি প্রচলিত হওন প্রযুক্ত ইহা অনাদি ধর্ম্ম নয় ইহার আদি থাকিল এপ্রযুক্ত নিন্দনীয় ইতি। অতএব বিধবার বিবাহ অধার্ম্মিক বেণরাজকর্ত্তৃক প্রবর্ত্ত্যমান প্রযুক্ত আদিমান্ এবং বিদ্বানের-দিগের নিন্দনীয় হেতুক সর্ব্বদাই হেয়। বিধবার পুনর্বিবাহ বেণরাজাবধি চলিত প্রযুক্ত বেদদ্বারা প্রচলিত নহে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে অতএব ইহা বেদমূলক নয়।

যদি বল বিধবার বিবাহ যদি বেণরাজাই চলিত করিয়া থাকেন তবে তাহা কি প্রকারে শাস্ত্রবোধিত হওয়া সঙ্গত হইবেক। উত্তর, অসাধু ব্যক্তিরা শাস্ত্রোক্ত অসদ্ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম জ্ঞানে গ্রহণ করে, দেখ শাস্ত্রে অসদ্ধর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্ম উভয়েরি উপদেশ করেন তাহার কারণ এই যে একের অনুষ্ঠান ও অন্যের জানা মাত্র কেননা সদাচার সিদ্ধি নিমিত্ত অসদ্ধর্ম্ম জ্ঞানের আবশ্যক হয় তাহাতে অধার্ম্মিকেরা অসদ্ধর্ম্মই অনুষ্ঠানার্থ পরিগ্রহ করে তাহার দৃষ্টান্ত এই যে বেণ রাজা শাস্ত্রোক্ত অসদ্ধর্ম্ম যে বিধবার বিবাহ তাহাই পরিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বিবেকটীকাতে কাত্যায়ন বচনে ব্যক্ত আছে যে পূর্ব্বে ঋষি সকল ধর্ম্মের জ্ঞানার্থ ধর্ম্মাভাস নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তাহা অনুষ্ঠেয় নয় ইতি।

মনু ইহা স্পষ্ট কহেন যে যেদেশে যেকুল ও জাতীয় ধার্ম্মিক অথচ সাধু দ্বিজাতি কর্ত্তৃক যাহা আচরিত হইয়াছে তাহা সেই দেশ সেই কুল ও জাতীয়েরা অবাধে আচরণ করিবেক। আর যদি বল ব্রহ্মচর্য্যা করিতে অসমর্থা বিধবারদিগের নানা দোষ দৃষ্ট হইতেছে এজন্য তাহারদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। উত্তর, ইহাও অত্যন্ত হাস্যাস্পদের বিষয় যেমন শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন পঙ্কদ্বারা পঙ্কজল ক্ষালন করা এবং সুরাদ্বারা সুরাযুক্ত দ্রব্য পবিত্র করা, অপর বৃশ্চিকভয়ে পলায়ন করিয়া কালসর্প মুখে পতিত হওয়া ইহাও সেই প্রকার কেননা বিধবার পুনর্বিবাহে বহুতর দোষ ঘটনা হয় (ইহার আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই।)

অতএব যেহেতু উক্ত লিখন সন্দর্ভে বোধ হইতেছে স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহে পাতিত্য জন্মে, ও দৈবপিতৃকর্ম্মে অধিকার থাকে না, বধার্হা হয়, বিবাহ সিদ্ধ হয় না, কুল অধম হয়, কুল বিনাশ পায়, সাধুদিগের অনাচরণীয় কর্ম্ম করা হয়, এবং তাহা অনাদি ধর্ম্ম নয়, ও বিদ্বানেরদিগের অনাদরণীয়, এজন্য তাহা সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি সর্ব্বকুলের বিরুদ্ধও বেশ্যার ন্যায় ধর্ম্ম সেই হেতুক সাধুগণ স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ বিষয়ে কখন পোষকতা করিবেন না এই ব্যবস্থাই অতিসাধু ও সৎসম্মত ইতি।

সমাপ্তা।

পরিশিষ্ট—গ

REPORT OF THE OOTTERPARRAH HITOKORRY SHOVA, FOR THE YEAR 1863-64.

To

The President of the "HITOKORRY SHOVA"

Sir,

I have the honour to submit for the information of the members, the Report of the Transactions of the Shova from 5th April 1863 to 4th April 1864.

The Hitokorry Shova was established at ootterparrah on the 5th April 1863.

The great object of the shova is to educate the poor, to help the needy, to cloth the naked, to give medicines to the sick, to support the poor widows and orphans, to promote the cause of temperance as a branch of the Bengal Temperance Society, and to ameliorate the social, moral and intellectual conditions of the members themselves and of their fellow inhabitants of ootterparrah and its vicinity.

The Shova originally held its meetings at the Ootterparrah Govt. Vernacular School premises. At the request of Baboo Jogin chunder Mookerjea, the meetings were afterwards held for a time at the Female School premises until the 19th July 1863, when circumstances obliged the members to seek for another gathering place. At this juncture Baboo Bejoykissen Mookerjea, one of the Zemindars of Ootterparrah, generously intimated to the Shova his wish to place a room in his house at its disposal where its meetings could be held. The Shova, assured of the permanency of the accommodation, availed itself of the invitation and since the 19th July 1863, it has held its ordinary meetings at the house of the Baboo.

A few young men of Ootterparrah were the earliest members and supporters of the Hitokorry Shova, but as time rolled on and its object was promulguted to the public, numerous persons lent their co-operation to it, and either by monthly subscriptions or donations engaged to further its ends and purposes.

The following are the names of the office-bearers and members of the Hitokorry Shova :

OFFICE BEARERS.

Baboo Bejoykissen Mookerjea...... President.
,, Pearymohun Banerjea.... ...Vice-President.
,, Hurryhur chatterjea ......Secretary,
,, Koroonamoy Banerjea . ....Asst. Secretary.
,, Promodachurn Banerjea........Treasurer.
,, Monmoth chatterjea ......Auditor.

MEMBERS.

Baboo Boycuntnauth Roy.
,, Rakhaldoss Roy.
,, Kissorymohun Banerjea.
,, Raymohun Banerjea.
,, Kallydhone Chatterjea.
,, Preonauth Banerjea.
,, Jogendronanth Mookerjea.
,, Nilmoney Banerjea.
,, Hem chunder Mookerjea.
Pundit Ramsoday Bhuttacharjea.
,, Sumbhoochunder Bhuttacharjea.
Baboo Tarucknauth Singh.
,, Bhuggobutty churn Banerjea.
,, Aubinash chunder Banerjea.
,, Hurry Hur Mookerjea.. .....Zeminder.
,, Hurromohun Mookerjea .. ....Zeminder.
Nabinkissen Mookerjea........M. A.
,, Noleinkissen Mookerjea........M.A.,B L
,, Callydoss Chatterjea. .... L.L.
,, Bamachurn Banerjea...... B.A.L L.

With a view to systematize the action of the Hitokorry Shova, the following gentlemen were appointed to superintend its expenditures under the different heads :—

Baboo Monmoth Chatterjea.. ....for education.
,, Kissorymohun Banerjea.. .....Ditto.
,, Koroonamoy Banerjea... . .for Widows & orphans.
,, Promodachurn Banerjea.. .....for Pecuniary aid & c.

When the prospectus of the Bengal Temperance Society in-

augurated at calcutta by Baboo Peary churn Sircar reached Ootterparrah Hitokorry Shova erewhile most painfully witnessing the beneful effects produced in this Town by the use of intoxicating liquors, roused itself to action and co-operated with the main Society in their object to arrest the progress of the growing evil.

The following are the objects of the Ootterparrah Temperance Fraternity as a branch of the Hitokorry Shova.

This fraternity has been organized for the purposes of enlisting the friends of temperance in its cause, of persuading the friends, relatives, dependants of the members and public generally to abstain from the use of all wines, and of distributing printed sheets or pamphlets in English, Bengalee and Oordoo with which the main society shall from time to time supply the Fraternity.

To further the cause of temperance, the Ootterparrah Fraternity have resolved to transmit periodical donations to the main Society and convene a meeting on the 3rd Sunday of every month to converce on all matters calculated to promote the cause of temperance at Ootterparrah and its vicinity.

The following is the acknowledgement of a donation forwarded to the main Society on the 14th March, 1864.

To

Baboo Koroonamoy Banerjea,

Secy. to the O. T. Society.

Many thanks for your report of the proceedings of the last meeting of the Hitokorry Shova.

The best thanks of friends of temperance are due to the members of the Hitokorry Shova for taking up the cause of temperance which will no doubt flourish under the co-operation of sincere friends in different parts of the country.

The donation of 5Rs. is very thankfully received

yours Sincerely,
Peary churn Sircar,
Secy. Bengal T.Society.

18th March 1864.

পরিশিষ্ট—ঘ

THE FIRST REPORT
OF THE
BENGAL TEMPERANCE SOCIETY.

The rapid strides with which the monstrous vice of intemperance has, for about half a century, been spreading itself over our country, and the horrible instances of crime, poverty, disease, and death that have all along followed its track, could not fail, years ago, to move every feeling heart to wish for the adoption of some measures to arrest its progress. But the monster,—born, as it was believed, of civilization,—nourished as it was observed, in the bosom of enlightened nations,—and recommended to us, as it appeared, by the practice of our rulers themselves,—seemed to defy all opposition, and, for a time, the boldest of its opponents had only to mourn in silence over calamities that he could hope neither to avert nor to alleviate. It was, not long, however, before the great facts that—"Ardent Sprits are Evil Sprits,"—that "Alcohol is a poison potent and pernicious"—that 'No cause of diseases is half so prolific as alcohol,"—reached our shores along with the learning and literature of the West. Povidence sent us also living friends over tempestuous seas and across wide oceans to teach us the same truths ;—and, lastly, to bring them house to us in the most pointed manner, verified them, to our sorrow, in the career of many promising friends and dear relatives. The conviction that the use of spirituous liquors, notwithstanding the respectability it had acquired, was baneful in the extreme, began every day to grow stronger and stronger in unprejudiced minds ; and the desire for eradicating or preventing the evil became daily more and more general. A temperance movement was made in Calcutta, by the Rev. C. H. A. Dall, in 1856. He succeeded in enlisting about 800 members. Three other Abstinence Societies have been formed in this neighbourhood during the last two years;—one at Cooley Bazar, presided over by the Rev. Mr. Pyne, the second in central Calcutta, under the presidency of the Rev. E. Strrow ;

and the third, at Barrackpore, among soldiers in the Cantonment. There have also occasionally arisen more or less permanent societies among scattered and moving regiments of European troops. There was no general agitation, however, and nothing attempted by our countrymen for and among themselves, so far as we know, till the 15th of November 1863 on that day some of them met, and agreed to the following resolutions thus forming the constitution and bye-laws of the "Bengal Temperance Society."

1. 'Where as the use of intoxicating liquors is most fearfully spreading over this country, and causing crime, poverty, disease and degradation, to an alarming extent; and whereas chemical analysis, physiological facts, the testimony of hundreds of medical men of the highest reputation, as well as the experience of nations, have proved beyond question, that intoxicating beverages of any sort are not at all necessary either in health or in sickness,—as food or condiment, as refreshment or luxury,—as a support in labor to the body or mind,—as a means of averting disease or prolonging life, but are on the contrary, the most prolific source of crime, misery, diseases, and death: and whereas alcohol is a powerful poison, and is injurious even when taken in small doses; and whereas it is seen in all countries, and especially in this, that the moderate use of ardent spirits in many cases, is but the first step to down right and brutal intoxication: Therefore it is necessary to form an association under the name of the Bengal Temperance Society to enlisl and concentrate the exertious of all well-wishers of this country, towards the practice and promotion of abstinence from all kinds of spirituous liquors, and to express and demonstrate the evil effects of drinking.

2. That this society shall consist of all persons above 15 years of age. who shall conform to its rules, and signify their wish to be enrolled as members.

3. That printed sheets of pamphlets containing extracts, translations or original productions in the English, Bengali, and urdu languages, demonstrative or illustrative of the evil effects of drinking, be distributed gratis, or at very low prices, among all classes of people.

4. That Fraternities, among friends of temperance living near each other, be organised in different parts of calcutta, and also

in the mofussil, to meet weekly, or semi-monthly, at places most convenient to such persons, for the purposes of conversing on matters connected with the general interests of society and on the progress of this temperance movement in particular, each fraternity having a Secretary (whose address shall be Communicated to this Society) to manage its business, to receive from the parent society printed sheets or pamphlets for distribution, to send us in return the names and declarations of members in his locality, to report the proceedings of that Fraternity's meetings, and to forward extracts compilations, translations, or original productions, together with all pecuniary aid, that may be contributed by the members of that fraternity.

5. That blank books with a prospectus embodying the objects and plans of this Society, be circulated for the signature of persons willing to join this society, and that those who enlist themselves as members be requested to sign the following declaration within a month after such enlistment :

> I do hereby solemnly promise to abstain from the use of all wines and intoxicating liquors whatever, except under medical direction.

6 That the members of this society, exercise all their influence, severally and jointly, to persuade their friends, relatives, dependants and others, to abstain from the use of all wines and spirituous liquors.

7. That Babu Peary Churn Sircar be appointed Secretary to this Society, and Babus Nilmony chuckerbutty and Hurrow Lall Roy B A. Assistant Secretaries, to manage the funds, and to conduct all the business of the Soeiety in consultation with Babu Dinno Nath Dhur, Rajendra Nath Bose, and Prosonno Coomar Gupta.

8 That Pandits Rajbullb Shurma and Mohes chunder chatterjea, Mowluvee Syud Zainuddeen Hosein, and Babus Hurrow Lall Roy B. A., Bereshur Mitter M. A,, Peary Churn Sircar, Dinnonath Dhur, Nilmony Chuckerbutty, and Muddun Mohun Mookerjee form a committee for the selection translation, and publication of tracts, and other papers for distribution.

9, That funds for meeting the expenses of publication & c. be raised not by any regular subscription, but from voluntary

gifts, monthly, quarterly, or annual, to be forwarded by the donors to the secretary of the main society, or to that of any of the Fraternities,

10. That this Society shall act in communication with the Fraternities, and shall meet half yearly, or oftener, together with as many representatives of fraternities in and out of Calcutta, as practicable to deliberate on the general plan of operations, and other matters connected with the society."

The operation of the Society fairly commenced with the beginning of the presant year, as the university Examinations in December occupied the attention of most of the members soon after their first meeting. The friends of Temperance in and near Calcutta set about in earnest to organize Fraternities in accordence with the 4th Resolution ; and during the seven months under report, that is from January 1864 to the end of July 1864, seventy-two fraternities have been formed ; within an extent of Country that may be said to be bounded by Lahore on the West ; by chittagong the East ; by Rungpore on the North , and by Cuttack on the South , inclusive of portions of Rohilkhand, and the Nagpore Division of the certral Provinces.

The Subjoined Table of Fraternities will afford a fair idea of the large field already opend to workers in this cause of truth :

FRATERNITIES OF BENGAL TEMPERANCE SOCIETY.

LOCALITY.	NAME OF SECRETARY	OFFICIAL DESIGNATION OF THE SECRETARY.
Amrita-Bazar	Babu Hemanta Coomar Ghose	Head Master Amrita. B. School
Areadaha,	— Uma Churn Mittra .	Book keeper, Messrs. Weinhold Brothers.
Arrah....	— Kadar Nath Mookerjee	3rd. Master Arrah School.
Azimghur, ...	—Koonja Beharee Loll . .	Hd. clerk collectorate. Arrah.

Bagnapara,....	—Charoo chunder Chatterjee....	Hd. Master Bagnapara.s.
Baitool,....	—Omer chand Dutt....	Hd. Clerk Commissioner s.
Baloor,....	—Shib chunder Chattergee ...	Pleader Judge's Court Hughly.
Bansbaria,....	—Juggeshur Ghose	Hd. Master Hooghly B.S.
Baraset,....	—Khetter Mohun Chatterjee	Do. Baraset School
Bareilly,....	—Keshub chunder Mookerjee	President Brahmo Somaj,
Barrackpore, ...	—Chunder coomar Moitree	Hd. Master Barrackpore S.
Barranagore ...	—Soshee Puddo Banerjee	Clerk civil Pay Master's office.
Beerbhoom .	—Nobin chunder Doss ..	Hd. Master Beerbhoom S.
Barhampore, ...	—Dinno nath Gangooly....	Pleader Judge's Court.
Bhagulpore, ...	—Gopal chunder Sircar....	Do. Do.
Bhowanipore,1	—Unnoda Prosad Banerjee ...	Pleader High court.
——No.2	—Seetul chunder Mookerjee	Arst. Secy. Brahmo Somaj.
Boalia.....	Roy Moothoora Nath Banerjee	Deputy Collector.
Bogra.....	Babu Kristo Coomar Sen	Hd. Master Bogra S.
Biddobatee, ...	Prancally Ghose ...	Secy. Brahmo Somaj.
Burdwan,....	Treelochun Singha	Clerk Collector's office.
Burrisal,....	Gour Narain Roy	Hd. Master Burrisal School.

CALCUTTA

Jorasanko,...	Roy Hurrow chunder Ghose	2nd Judge Small Cause Court.
Brahmo Somaj ...	Babu Protap Chunder Mozoomdar....	Secretary Brahmo Somaj
Ahereetola, 1....	—Khetter Gopal Laha...	Secretary Sajjun Somaj.
Ahereetola, 2....	—Gopal Lall Seal ...	Student Presidency College.

Ahereetola,3	—Omerta Loll Dey ...	Secy, Ahereetola Conre-rsa Zione.
Coomartoolee, ...	—Bhobani Churn Mittree	Zemindar.
Comboolatolla	—Greesh Chunder Mittra	Student.
Bahir Simla, ...	—Gobind Chunder Ghose	Secy. Brahmo Intimate A.
Simla, .	—Greesh Chunder Ghose	Hd. Native Assistant Mily And General.
Maniktolla, .	—Rajendra Nath Bosd ..	Do. Dallus Carruthers.
Puttuldanga, .	—Gobind chunder Seal B.A ...	Student Presidency College.
Pattooria-ghatta....	—Bissorunjun Mookerjee ...	Land-holder.
Chorebagan	—Ishur chunder Shaha ...	Teacher Hindu School.
Colootolla,....	—Nobin chunder Borral ...	Student Presidency College.
Colootolla B. School ..	—Okhey coomar Chowdory...	Secy. Juvenile Association.
Mehdi Bagan, .	Hon'ble Azeemuddeen Hosein khan....	Member Lient. Govr's Council.
Taltolla No.1.	Babu Abinash chunder Banerjee	Student Presidency College.
Taltolla No. 2, ...	Moulovee Kubeiruddee	Secy. Calcutta Madrassa.
Lall Bazar....	Babu Luckhee Narain Laheree....	Supd't. Hindu Hostel....
Shampooker	—Dwarka Nath Ghose....	
Shambazar ..	—Gopee Nath Soor	Clerk Royal Bank.
Choadang....	Babu kadar Nath Dutt	Head Clerk Small Cause. Court.
Chittagong...	„ Juggut Bundhoo Gooho .	Teacher Chittagong School.

Chunder-nagore 1	Dinno Nath Dhur	Head Master Chundernagore S.
Do—2	„ Radha Benud Kerr ...	Clerk E.B. Railway.
Comillah ..	„ Hurry Mohun Ghottok...	Teacher Comilla School.
Cuttack....	„ Nemy Churn Newgy	Sheristadar Fouzdaree.
Dacca...	Roy Gunga Churn Shome	Principal Sudder Ameen.
Dinajpore ..	Babu Cally Churn chatterjee ...	Head Master Dinjpore School.
Gour Nagore....	—Kylas chunder Mittra....	Do. Gournagore School.
Goverdanga ...	—Umbica Churn Chatterjee ...	Do. Goverdanga Do.
Hallishahur.	—Grish Chunder Roy	Clerk Messrs Ernest haussen & Co.
Hooghly	—Bulloram Mullick B.A.	Teacher Hindu School.
Hooshunga-bad	—Bhuggobutty Churn Dutt ..	
Howra .	—Saroda prosad Catterjee ...	Student Presidency College.
Kandee	—Saroda prosod Gangooly ...	Teacher kandee School.
Konenagore....	—Kanti Chunder Bhadoory	Head Master Konenagore S.
Kissennagore .	—Jodoo nath Roy	Zemindar.
Lahore	—Soshee Bhoosun Bose	Secy. Brahmo Somaj.
Magoora	—Preo Sunker Ghose .	Head Master Mogoora School.
Medinpore .	—Rajnarain Bose ...	Head Master Mednipore do.
Noakhali ...	—Sreenath Ghose ..	Teacher Noakhali School
OOtterpara ...	—Koroona Moty Banerjee	Student Presidence College,

Palara	—Russick Lall Ghose	
Panihatti	—Nemy Churn Bose ..	Student Presidency College.
Patna	—Bhuggobutty churn chatterjee	Head Clerk Commr's office.
Rungpore	—Prabuttv churn Roy B.A	Head Master Rungpore School.
Shibpore	—Poorno Chunder Mitter . .	Student Presidency College.
Sursoona (Behala)	—Saroda Prosad Bose	Secy. Behala Scientific Assoc.
Takee	—Rajmohun Roy Chowdry ...	Zemindar.

The names of the Secretaries will show, that respectable gentlemen in all parts of the country have not only joined the movement, but taken the lead , and also that School Masters whose example and influence must be highly efficacious in the formation of the morals and character of youth, have shown themselves zealous advocates of this reform, by taking an active part in its management. It is still more gratifying here to be able to add, that the senior students of several schools and colleges, are now eager to take the pledge of abstinence, and the many of them are enthusiastic in promoting this good cause.

Twenty-five years ago, in the Calcutta colleges, there were few students who did not believe the drinking of English wines to be part of an English Education, a proof of civilization, and a passport to civilized society. There were few, indeed, who did not verily believe, that to intimate our enlightened rulers as closely as possible, we must not only read their Bacon and Shakespeare, but must also dress, eat and drink like them , must copy their manners and look down upon every thing Bengalee. Happily, however, that time is gone by. Students now, and it may be emphatically said to those of the Presidency College, are mostly of a very different turn of mind. The Cultivation of the Bengalee language—the Education of Bengalee females,—the study of the Brahmo religion,—and declaring abrod the poisonous effects of alcohol,—are their principal

occupations beyond the College walls. From what is already done, great results may be expected. If this temperance movement can be sustained with zeal and energy, by even a few individuals in every important village or town for a few years the rising generation will surely be saved. Though we may not have the glory of reclaiming many old offenders, we shall have the satisfaction of seeing a fresh generation coming up to take their places strong against temptation, and free from the curse.

Most of these fraternities are working zealously and communicating their proceedings to the main Society. It would not be uninteresting or out of place to subjoin a few extracts from some of their reports, so as to give an idea of the work as it is going on.

Extract from Babu Dinnonath Gangooly's Report of the Berhampore Fraternity. Dated 2nd February, 1864.

> "I have not the slightest doubt that our endeavours will be attended with good and beneficial results ; one of the old sinners I have reclaimed, for up to this day I fine him true to his resolution. Our progress indeed will be slow, for it requires time ; but that will be no cause to discourage us in our exertions.

From Babu Kadar Nath Dutt's Report of the Burdwan Fraternity. Dated 24th February, 1864.

> "I see there has been a sensation in Burdwan. Those who are known as great drunkards have taken a wrong view of the subject, and are preaching to many the "uselessnss" of the declaration. The temperance brothers, on the other hand, have by such treatment, naturally taken a firm stand, in the cause of temperance, and are preaching to the dunkards as well as to others the usefulness such a movement. Light, I am sure, will gain victory over darkness ; and those who are standing against truth, will soon be silenced."

From Babu Saroda Prosad Gangooly's Report of the Kandee Fraternity. Dated 19th March, 1864.

> "Four candidates presented themselves for admission (as members)—of these one is a pleader. This man

who known here as a notorious drunkard. Two students of the second class of our school live with him in the same house, and he has been induced chiefly by their exhortations to give up drinking, and join our Fraternity.'"

This has been inserted particularly for the perusal of our young friends who are still students. If the two boys of the 2nd class of a village school could bring back from sin a man grown up in it, what vast amount of good lies in the power of all the students of our colleges and schools. Let all our young friends imitate their brethren at kandee, and our country will cease to mourn over the distresses of her children. This extract proves also, that no one, however weak he may be, should consider himself too in significant an agent to work in the cause of truth Truth has its own force, and requires only to be proposed, no matter by whom.

From Babu Nabin Chundra Borral's Report of the Colootola Fraternity. Dated 20th May, 1864.

"In my last report, I made mention of the sensation which our cause has created in Hooghly, and in this I have to say, that the same "One word about feeling is still alive in the mindes of many.'

"One word about the members,—the constituent elements of the Fraternity. They have been sincerely and zealously discharging their duties—both young and old – and I rejoice to find that their signing the forms of declaration has imposed upon them a serious obilgation, which they endeavour to act out when they come to deal with it practically."

From Babu Sosheepuddo Banerjee's Report of the Barranagore Fraternity. Dated 16th June, 1864.

"Not withstanding the opposition of the few who have not as yet joined us, and who rather try to undermine the cause of temperance, I see our fraternity has done much good to our village by bringing back 20 intelligent young men from the paths of intemparance and vice."

The following letter was received from the mofussil in June last,

from a young man of good parts, engaged as a teacher in one of the Government Colleges, and who had been remonstrated with for his drinking habits :—

—18 June, 1864

My dear—

I am really very sorry for my conduct as regards drinking. I am fully convinced of my guilt, and have almost left of the habit. I shall be prepared within a fortnight to sign the temperance pledge, and enlist myself as a member of the Bengal Temperance Society, I shall therefore fill it a very great favour if you would kindly send me a form of the pledge at your early convenience. I earnestly hope you will kindly forgive me for what is passed.

I remain & c.

Soon after the receipt of this above letter, a pledge was forwarded to the writer, and he returned it by Post duly signed. It has been ascertained by reports from another member residing at the same station, that our repentant friend has been true to his promise. O ! that others had an equal amount of moral courage to cast off their evil habits, and to begin at once a letter life.

Extract from Babu Hurrow Lall Roy's Report of the Patna Fraternity. Dated the 19th July, 1864,

"The temperance fraternity of Patna, though not very active, has succeeded in reclaiming some very hard drinkers."

In accordance with the 3rd Resolution, 4000 copies of a pamphlet in English on the "Effect of Ardent Spirits," taken mostly from Mr. Jonathan kittredge's address at a meeting in Lyme, New Hampshire, and 4000 copies of same in Bengalee, have been published by the Society, and distributed gratuitously, among all cl sses of people through the Secretaries of fraternities. Two other pamphlets have also been distributed—one a discourse entiled সুরা-পান কি ভয়ঙ্কর (How dreadful is drinking wine)—read before the Mangoora Fraternities by its Secretary,. Babu Preosunker Ghose, and published at his own expense, the other, an address delivered

before the Hallishahar Fraternity by Babu Unnoda Prosad Chatterjea—(on the present miserable state of Hallishahar and the necessity for a temperance fraternity there)—হালিসহরের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং তথায় সুরাপান নিবারণী সভার আবশ্যকতা This was published by the Hallishahar Fraternity. Five hundred copies of both the pamphlets were presented to this Society for gratuitous distribution. There are in Press, for similar purposes, three other discourses in Bengalee, on the evil effects of drinking, read before the Cuttak Fraternity by its President, Roy Hurrow Chunder Ghose.

The Society now consists of nearly three thousand members, who have subscribed to the pledge, and forwarded it to the main Society to be filed and registered. Besides these there is a number of respectable gentlemen, who though they are total abstainers, and fully approve of the objects of the movements, have not subscribed to any declaration, partly because they think it unnecessary, and partly from an aversion to sign anything like an oath or solemn promise.

Several other gentlemen, again, have not put down their names to the pledge form certain verbal objections to the form: for instance, the last two words viz. medical direction, were objected to by some, who represented that in many villeges in the interior, there was no recognized medical practitioner whose prescription could be called "medical direction" in the proper sense of the word, and under whose direction, therefore, a subscriber to the pledge could not conscientiously take any medicine containing spirit. About the middle of March therefore, the clause for bonafide medicinal purposes—was substituted, and the following was the altered form of the pledge:

TEMPERANCE PLEDGE

I do hereby solemnly promise to abstain from the use of all wines and intoxicating liquors whatever, except for bonafide purposes.

Residence .... }
Date .... }

Again, in April last it was found that several members in Calcutta as well as in the Mofussil had refused to give their names to the

pledge, on the sole ground that the word abstain implied a previous habit of drinking, which such as have been abstainers through life, would not like to be understood of them from their subscription to such a declaration. The form of the pledge was accordingly left to be decide in a general meeting held agreeably to resolution 10, in the Presidency College Theatre on the 24th May, 1864, The following are the proceedings of the meeting :—

> "At the first general meeting of the Bengal Temperance Society, held in the Presidency College Theatre on the 24th May, 1864 attended by the members of all the Calcutta Fraternities, and likewise by those of the Patna, Bhagulpore, Kishennagore, Hoogly, Hallishahor, Chundernagore, Barrackpore, Burranagore, Konenagore, Ootterpara, Salkea, Shibpore Behala and Bhownipore Fraternities, and by respectable Hindoo, Brahmo, Mahomedan, and Christian gentlemen :
>
> "Proposed by Baboo Peary Churan Sircar, and carried unanimously that the Rev. Mr.Dall be chosen to preside over this meeting. Proposed by the Mr. Rev. Dall, that Baboo Peary Churn Sircar, Secretary to this Society, be elected Secretary for this day's business also ;—and, on his call, the following gentlemen were nominated to act as Business Committee of this meeting :—Pundit Eshwar Chunder Biddyashagore, Hon'ble Azeemuddeen Hossein Khan, Hon'ble Shumboo Nauth Pundit, Baboo Gresh Chunder Ghose, and Baboo Keshub Chunder sen. Carried unanimously.

The President then open the business of the meeting, and made over to the committee the various resolutions as they were handed in by gentlemen present. While the committee were putting the resolutions into order, the Secretary was desired to read proceedings of the last meeting, and to report the progress already made by the Society.

> "The Secretary first read the following letter from Raja Radhacant Bahadoor, expressing his regret that ill-health prevented his attendance, and intimeting his full

approbation of the movement, and his readiness to give it his most cordial support, —

Sukchara Garden, 23rd May 1864.

"BABOO PEARY CHURN SIRCAR,
Secretary To the Bengal Temperance Society,

"Sir,

"Thanks for your invitation on the 24th instant. I deeply regret the present state of my health, for the benifit of which, I am now living at my country seat, will not permit me to attend the meeting to-morrow morning.

"I heartly approve of the noble object of the Society, which has been installed at the time and place when and where it is most needed. Writers in all ages and countries have dwelt upon the baneful consequences of addition to spirituous liquors. Some government of old had provided several penalties against drinking; and the spectacle of wretchedness, misery, and crime, traceable to this cause, is familiar to all ! but I observe with heat-rending pain the rampancy of this vice amongst our countrymen, especially among educated youths in the metropolis of India, who disregarding the salutary injunctions of our religion, untutored by experience, and the writings of celebrated physicions such as carpenter and others, and prone more to imitate the reprobate habits than the virtues of our conquerors, fall early victims to misery, disease, pain and death. I therefore hail with joy the inauguration of a Society, in this city, which aims at the disruption of one of the most fertile sources of crime, corruption and wretchedness, in our country. I shall take the deepest interest in its progress, and give my cordial concurrence to all measures it may adopt for the eradication of this dreadful vice, and the reclaiming of those who have succumbed to its influence.

I remain,
Yours obedient servant,
RADHAKANTA

"The proceedings of the last meeting, (which organised the society), were then read by the Secretary and were approved.

"As moderate drinking is fashionable or is regarded harmless

by many, who consider excess alone to be vicious or injurious, Babu Greesh Chunder Ghose in a earnest address proposed the following resolution against modarate drinking:—"Resolved: That we deprecate as injurious, and wholly disapprove of the custom of moderate drinking, especially in a climate like ours. We risk nothing in the assertion that the first physicians in the world sustain us in this position. A leading English physiologist Dr Wm. B. Carpenter, maintains that alcohol killing in larg doses, is not healthy in small ones. Continual small doses, he says, lead to gradual and fixed disease; and alcoholic mischief is always traceable in the disease of old moderate drinkers. It is beyond questions, that even in cold climates, alcohol gives no health, no abiding strength, and "augments no capacity of the healthy human system." We rejoice to know that the advocacy of these views has been grately extended among scientific observers during the last ten years; and yet full fifteen years ago, upwards of 2,000 gentlemen of the medical profession in England,—from the court physician and leading metropolitian Surgeons, who are conversant with the wants of the upper ranks of Society, to the country practitioner who is familiar with the requirements of the artizan in his workshop and labourer in the field.—endorsed the position which we now take, and declared—"That total and universal abstinence from alcoholic beverages of all sorts, would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race."

"It was seconded by Babu Boly Chand Dutt; and the President advocated the proposition, and strongly supported it by citing authorities of medical men and physiologists of the highest reputation in Great Britain. It was carried unanimously."

"The Hon'ble Syud Azeemuddeen Hosein Khan moved the second resolution as follows:—

"Resolved: That we need the direct and express sanction and approval of old and respectable gentlemen, who we know, take a deep interest in our movement, and are ready to give it the great weight of their personal Influence. We cannot in all cases except aged men who have never used intoxicating drinks, to sign a promise that they will not use them. We therefore believe it highly proper and expedient to seek to extend the influence of

such as have never through a long life been any thing but abstainers, by opening in each of our fraternities a Record Book, containing a simple declaration which might secure to us their names.

"It was seconded by Babu Gopal chunder Sircar, and carried unanimously.

'Babu Keshub chunder Sen, moved the next resolution, and ably pointed out its necessity and advantages :—

"Resolved : That while we would leave free and untrammelled the action and plans of individual fraternities every where, we hold ourselves free to tender others, as we would they should offer us, every kindly hint and suggestion that may in any wise increase their and our efficiency. For the present, we suggest three things: first, that each fraternity should organize working committees, both of visitation to seek out such as may be judiciously moved to aid the cause, and such as most need its help ; a committee of publications ; and a committee of finance and economical management. Our second suggestion is, that if possible, every man who joins a Temperance Fraternity should be induced to give his name to one or other of its working sections or committees, so as to turn the whole hive into workers, each according to his preference and ability. Our third suggestion is, that the meetings of a town or village be held as often as twice or once a month, and in as many parts of the village or town as is practicable. In New England, for example, where every town builds its own school houses, temperance meetings, with addresses and music, circulate regularly from one school house to another, always open and free to all. Only by freequent changes in the place of meeting does it seem possible to reach the entire population.

"It was second by the Babu Rajkrishna Banerjee, and carried unanimously.

"Babu Keshub chunder Sen, with a touching appeal to the religious feelings of his hearers, moved for the alteration of the pledge, by the insertion of a clause containing an invocation of the blessing of God and proposed the following form :—

"I will drink nothing that will intoxicate ; nor give ii willingly to others ; except for bonafide medicinal purposes ; And may God bless this act to my own good, and good of the community.

"Rev. Mr. Macdonald in seconding the motion, warmly sympathized with us, and expressing his hope, that men of all classes and creeds would join us, proposed as an amendment that an additional exceptional clause, vig. except in the Christian sacrament be inserted in the pledge, that Europeans, East Indians, and Native Christians may have no objections to subscribe to it. Rev. Mr. Payne, President of the Cooly Bazar Abstinence Society, also zealously supported the motion.

"Babu Nobin chunder Borral proposed another amendment, to the effect, that other intoxicating drugs such as Ganja, Churus, & c, be included in the pledge as things to be abstained from.

"Mr.H. Woodrow, Inspector of Schools, Central Bengal, suggesting that the considerat on of the form of the pledge had better be left to a select committee, proposed that this subject be reffered to the Business Committee. Mr. Woodrow s proposition was warded as follows :—

"Resolved : That the question of pledges be reffered for consideration to the Business Committee already appointed, with power to add to their number, and that their recommendations be considered at a future meeting.

"It was crried unanimously. Mr. Woodrow also suggested that several forms of the pledge be announced, so as to meet the wishes of all classes of subscribers.

"The meeting then broke up with votes of thanks to the chair, and to the secretary ; and with an understanding that it should assemble again at an early period, of which public notice would be given."

The Business Committee, before deliberating on the subject reffered to them, added the following gentlemen to their number : Viz. Rev. C. H. A. Dall, Roy Hurrow Chunder Ghose, and Rev. K. S. Macdonald. The Committee then meet on the 18th June, 1864, in the Presidency College Library, and agreed to the following Resolution :—

"Resolved : That as it is impossible to fix upon any one special form of the pledge or Declaration, which will meet the wants of all classes of the community, we accept as affiliated to us, all frater-

nities or associations that unite with us in the great fact of abstinence from all intoxicating drinks, while we earnestly recommend the adoption of one or another of the following forms, namely :

1st Form :

"I do hereby solemnly declare that I will not drink any thing that can intoxicate, nor encourage its use as as a drink in any shape.

2nd From :

"I do hereby solemnly declare that I will not drink any thing that can intoxicate ; nor encourage its use as a drink in any shape ; except for bonafide medicinal purposes.

3rd Form :

"I will not drink any thing that can intoxicate, nor encourage its use as a drink in any shape, except for bonafide medicinal purposes. And may God bless this act to my own good, and the good of many.

4th Form :

'I do hereby solemnly declare that I will not drink any thing that can intoxicate ; nor encourage its use as a drink in any shape ; except far bonafide medicinal purposes, or in the Christian Sacrament. And may God bless this act to my own good, and the good of many.

While thus presenting a four-fold declaration, the committee also agreed to the fact, that those who have already subscribed to the forms hitherto used by the society, could not have their membership questioned, in consequence of their having signed a pledge or declaration different from the one now proposed. The broad principle of affiliation, announced in the committee's resolution, fully recognised their position and precluded necessity of a separate resolution to that effect

With reference to the amendment proposed by Babu Nobin Chunder Borral in the first general meeting—that Opium, Ganga, Churrus & c. be included in the pledge, as things to be abstained from, the committee were unanimously of opinion that the promotion of abstinence from intoxicating drugs should from the subject of a distinct movement.

A General meeting was again called in the Presidency College Theatre on the 23rd July, 1864, to receive the Report of the Business Committee on the form of the pledge; following are the proceedings of this meeting :—

"At a general meeting of the Bengal Temperance Society held in the Presidency College Theatre on the 23rd July, 1864 :—

"Proposed by Babu Mudden Mohun Mookerjea, seconded by Babu Nilmoney Chuckerbutty, and carried unanimously, that Rev. Mr. Macdonald be asked to preside.

"At the request of the meeting the reverend gentlemen than took the chair.

"The proccedings of the last meeting, held on the 24th May 1864, were read by the Secretary, and adopted by the meeting.

"The Secretary then intimated, that the Business Committee appointed in the last meeting, had added to their number, Roy Hurrow Chunder Ghose, Rev. K. S. Macdonald, and Rev C. H. A. Dall, and that the committee, thus constituted, had met on the 18th June 1864, in the Presidency College Library, to deliberate on the form of the pledge. The proceedings of this meeting of the Business Committee were read, and their adoption moved.

"The pledge forms recommended by the committee elicited much discussion, and the wisdom of having more than one form was questioned.

"Rev. Mr. Payne proposed that the form hitherto used by the Society be retained with the addition of the following clauses :—

"May God bless this act ;" and the following note—"It is understood that this engagement does not interfere with religious rites." He remarked that it would not be judicious to change a form to which more than 2,000 members had already subscribed.

"He was seconded by Babu Dino Nath Dhur.

"Babu Keshub Chunder Sen objected to Rev. Mr. Payne's proposition, on the ground that even with the additions suggested, the Society's form would be defective, as it could not restrain a subscriber from encouraging the use of alcohol, by dealing in it himself, or by giving it to his guests.

"Babu Nobin chunder Borral proposed an amendment to the Business Committee's recommendation, to the effect, that the

drinking of Siddhee by Hindus on the last day of the Doorga Pooja, should form an exceptional case.

"Rev. Mr. Dall moved the adoption of the Business committe's recommendation, with the omission of the fourth form, and the addition of the words "or when required in a religious rite" to the third form after the words "medicinal purposes."

Rev. Mr, Payne's motion was put to the vote and lost ; and Mr. Dall's motion was carried by a large majority.

"The Secretary then read a paper from the Sulkea Fraternity, suggesting, that the Bengal Government be requested to appoint a commission to inquire into the vast amount of drunkenness among the people here, a similar measure having been lately adopted by the Bombay Government.

"The Secretary also read an Extract from a Report of the Cuttack Fraternity suggestining, that Government be requested to close small liquor shops established within the last three years, and yielding small revenue to Government.

"Moved by the Rev. Mr. Dall and carried, that the papers, just read by the Secretary, be reffered to the Business Committee, and also that the present Business Committee be requested to act until another be appointed.

"The following Resolution was next proposed by the Secretary and carried unanimously:—

"Resolved : that votes of thanks be tendered to Babu Mohesh Chunder Chatterjee of the Chorebagan Fraternity, for rendering into Bengalee the English tract published by this Society ; to Babu Preosunker Ghose of the Magoora Fraternity for his Bengalee Discourse named সুরা পান কি ভয়ংকর—(How dreadful is drinking)—Which he has published at his own expense ;—to Roy Horrow Chunder Ghose, of the Cuttack Fraternity, of his Bengalee Discourses, which he is also publishing at his own expense ; to Babu Unnoda Prosad Chatterjea of Halishahar, for his Bengalee tract entitled হালিসহরের বিবরণ, &c. (Description of Halishar &c) which has been published by the Halishahar Fraternity ;—and also to all the fraternities and individual members that have forwarded their contributions to the general fund.

"The meeting then broke up with thanks to the President, to Rev. Mr. Dall. and to Rev. M. Payne for the valuable assistance received from them."

Thus the declaration forms adopted in the last general meeting of the Society, and earnestly recommended for adoption by its Fraternity are the following :—

DECLARATION :

I do hereby solemnly declare that I will not drink any thing that can intoxicate ; nor encourage its use as a drink in any shape.

Residence... }
Date.... ... . }

I do hereby solemnly declare that I will not drink anything that can intoxicate ; nor encourage its use as a drink in any shape, except for bonafide medicinal purposes.

Residence .... }
Date . ... . }

Any gentleman wishing to be a member of this Society, may subscribe his name to one or other of the above forms, copies of which shall remain with the Secretaries of all Fraternities.

PEARY CHURN SIRCAR
Secretary Bengal Temperance Society.

পরিশিষ্ট—ঙ

FIRST REPORT OF THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE

This Committee was formed in 1851 to "publish translations of such works as are not included in the design of the Tract or Christian knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies on the other hand and likewise to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal."

In accordance with this fundamental rule the following translations and compilations have been under taken.

The Life of Robinson Crusoe
Lamb's Tales from Shakespeare.
Macaulay's life of Clive.
Irving's life of Columbus.
Life of Peter the Great.
Selections from the Percy Anecdotes.
Life of Sevajee and the Rise of the Mahratta Power.
An Annual Register
Selections from the Native Press

And the following have been sanctioned when funds shall be available :—

A Description of Rejpootana
Hajji Baba.
The Lost Sences (Sight and Hearing)
Sketches of Turkish History
Davis's China.
History of Remarkable people
Scenes in Aretic Regions.

Of these works the Translation of Robinson Crusoe by the Rev. J. Robinson of Serempore, and of Lamb's Tales from Shakespeare by Dr, Roer, and of Macaulay's Life of Clive by Baboo Hur Chunder Dutt are in the Press. The Life of Columbus by Rungolall the Life of Peter the Great by Baboo Bhoodeb Mukherjee ; the Life Banerjee ; of Sivaji by Baboo Rajendralall Mittra ,and the Seleetions from the Native Press by the Rev. J. Long are nearly ready and will be printed as soon as possible,

The Bibidharta Sangraha, a Bengali Periodical, published under the patronage of the committee has attained by steady circulation of 1200 copies. Six monthly numbers have already been issued and favourably received. In the belief that it will prove one of their most efficient Agents for creating a thirst for knowledge the committee have published it at the low rate of two annas a number, and hope by the assistance of friends in the Moffusil to extend its circulation. Every number contains at least three illustrations and sixteen pages of letter-press.

Besides translating and adapting, the committee hope to illustrate all their works, and for that purpose have ordered from England plates to amount of Rs. 1000. The present stock of 87 plates was placed at their disposal by the late Hon'ble Mr. Bethune, with the request that especial mention should be made of the disinterested liberality of Mr. Charles Knight, the Publisher, London, who gave them to him from the pure desire of encouraging useful knowledge in Bengal.

In mentioning the gift, the committee must record their sense of the heavy loss which they have sustained in the death of this Hon 'able member of council, whose munificent support was one of their earliest encouragements. They beg to present their thanks to Baboo Joykissen Mookerjie, for his gift of a library containing all the works at present in Bengali ; and to Dr. Roer, and Baboo Hur Chunder Dutt, for their gratuitous labours in the translational department.

The Expenditure of the committee has already been very considerable in Advertisements, Remittances for Engravings, Translations, and the maintenance of their Periodical : while their liabililities for works which they expect speedily to publish will amount to several thousand Rupees, they therefore appeal to the friends of the Natives in Bengal for increased assistance in their interesting undertaking.

PRESENT COMMITTEE

J. R. Colvin, Esq. C. S.
A. Grote, Esq. C. S.
Pundit Eshwar Chandra Vidyasagar
Baboo Joykissen Mookerjee.
The Rev. W. Kay.
The Rev. J. Long.
J. C. Marshman, Esq.
Baboo Prosunnoo Coomar Tagoe.
Baboo Russomoy Dutt.
E. A. Samuells, Esq. C. S.
W. Seton Karr, Esq. C. S.
Dr. Sprenger.
M. Wylie, esq.
H. Pratt, Esq. C. S Baugulpore }
M. Townsend, Esq. Serampore. } Secretaries.
H. Woodrow, Esq. Calcutta. }

নির্দেশিকা